সরল

জ্বর-চিকিৎসা

তৃতীয় অংশ।

—o:○:o—

ইহাতে রক্ত-আমাশা, রক্ত-ভেদ, বমি, হিক্কা, কৃমি, পেট-ফাঁপা, প্রস্রাব বন্ধ, বাহ্যে বন্ধ, পক্ষাঘাত, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা, ঠোঁটে আর জিবে ঘা, উর্দ্ধকাণ, বাক-রোধ, কানে পুয হওয়া, কানে কম শুনা, কর্ণমূল-ফোলা,——স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) বাকী এই সব রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। কথায় কথায় দৃষ্টান্ত আর প্রেস্ক্রপশন [illegible] ওয়া হইয়াছে। নামে জ্বর-চিকি[illegible], কাযে প্রাকটিস্ অব্ মেডি-সিনের চেয়ে কম হবে না।

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা, ২৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বি, বানর্জী এণ্ড কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

১২৯১। আশ্বিন।

মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ৵১০।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

বই পড়িবার আগে নীচের ভুল গুলি শুধরে লইবে।

শুদ্ধিপত্র।

পাত	ছত্র	ভুল	শুদ্ধ
৬২৭	১৪	র পাতে	৪৯২র পাতে
৬২৮	৯	লিস্ফ	লিম্ফ্
,,	,,	লিস্ফ	লিম্ফ্
,,	১০	র পাতে	৪৯১র পাতে
৬৭১	৬	জ্যেয়স্ত	জীয়ন্ত
,,	৮	রোগের	বেগের
৭৬৩	,,	থানিলে	টানিলে
৭৭২	৯	দুর্দ্দশা	দুর্দ্দশা
৮২৩	হেডিং	চিমিৎসা	চিকিৎসা
৮২৪	হেডিং	নাল	তাল
৮২৮	১	পে-কাঁপা	পেট-কাঁপা
৮৩২	১৪	পারে	পার
৮৪২	শেষ ছত্র	বিকারেও	বিকারে ও
৮৪৯	১২	গুলির	গুলিতে
৮৭৪	১৩	হয	হয়
৮৯৬	১০	টন্‌সিনাইটিস্	টন্‌সিলাইটিস্
৯০১	৪	লাগিলা	লাগিয়া
৯১১	১	সিশ্বাস	নিশ্বাস
,,	৭	খাঁচ-কাথা	খাঁচ-কাটা
,,	৮	খাঁচ-কাথা	খাঁচ-কাটা
৯২৭	২৯	ব্যাথার	ব্যথার

৯৩৭র পাতের পর ৯৩৮ হইবে তার বদলে ৯৪৮ হইয়াছে।
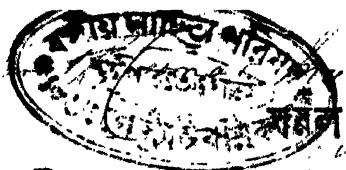
জ্বর-চিকিৎসা।
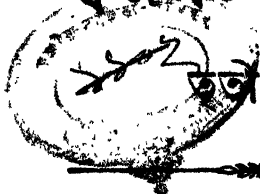
তৃতীয় ভাগ।

অম্বল-শূলের আর একটী ভাল অসুদ আছে। এ অসুদে আমি অনেক রোগী ভাল করিছি। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, এ অসুদে খুব উপকার হয়। আবার খুব কম খরচে এ অসুদটী তয়ের হয়। তাতেই বলি, কাঙাল গরিবদের অম্বল-শূলের এর চেয়ে ভাল অসুদ আর নাই। অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম—

ম্যাগ্‌নীশিয়া	...	১০ গ্রেন্
রুবার্ব্ব (রেওচিনি)		৫ গ্রেন্
শুঁটের গুঁড়ো (জিঞ্জর পাউডার)		৫ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোজ তিন বেলা তিনটা পুরিয়া খাইতে দিবে। যত দিন রোগটী

নির্দোষ হইয়া না সারিবে, তত দিন নিয়ম করিয়া এই পুরিয়া খাইবে। অম্বল-শূলই হোক্, আর অম্বলের ব্যামোই হোক্, পথ্যের ব্যবস্থা দুয়েতেই সমান। ৫৯৮—৬০২র পাতে পথ্যের কথা বলিছি।

৫৪র পাতে যে মর্ফিয়া-মিকৃশ্চর্ লেখা আছে, বলিতে গেলে, তাতে না সারে এমন যন্ত্রণাই নাই। ৫৯৭—৫৯৮র পাতে এর কথা বেশ করিয়া বলিছি। সব কথা বেশ করিয়া খুলিয়া না বলিলে, যদি বুঝিতে না পার, এই জন্যে, এখানে আর একটী যন্ত্রণার কথা লিখিয়া দিলাম। এ যন্ত্রণাও সেই মর্ফিয়া-মিক্-শ্চরে ভাল হয়। বাধকের ব্যথা বলিয়া মেয়েদের একটী রোগ আছে। ঋতুর সময়ে এই ব্যথা উপস্থিত হয়। যাদের এ ব্যথা আছে, ব্যথা থাকিতে তাদের সন্তান হয় না। এই জন্যেই, একে বাধকের ব্যথা বলে। বাধক—কিসের বাধক ? সন্তান হওয়ার বাধক। যাদের বাধকের ব্যথা আছে, ঋতুর সময় তারা বড়ই কষ্ট পায়। কোমর, তল-পেট, আর দুই কুচকির্ উপর—এই সব জায়গায় যেন জিওল মাছে হানিতে থাকে। যাতনায় রোগিণী যেন কাটা কৈতরের মত ছট্ ফট্ করিতে থাকে। এমন যে যাতনা, এও মর্ফিয়া-মিকৃশ্চরে সারে। যাতনা যত ক্ষণ থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া

ঔষুদ খাওয়াইবে। এই ঔষুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীকে যদি গরম জলের টপে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইতে পার, তবে দেখিতে দেখিতে ও সব যাতনা দূর হয়। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

সম্প্রতি এক জন কম্পাউণ্ডার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহাশয়, আপনার সরল জ্বরচিকিৎসায় ৫৪র পাতে যে মর্ফিয়ার-মিক্শ্চর লেখা আছে, সে কোন্ মর্ফিয়া? য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া, না মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়া? দু রকম মর্ফিয়ার কোন্ রকম, বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলে ভাল হইত। দুয়েতেই সমান ফল পাওয়া যায় বলিয়া আমি বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিই নাই। দু রকম মর্ফিয়ার গুণের তফাত থাকিলে, বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতাম। যাই হোক্, আমি মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকি। আমার এই উত্তরেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

৫। **রক্ত-আমাশা**———রক্ত-আমাশা বড় খল রোগ। একটু পুরাণ পড়িয়া গেলে আর সারিতে চায় না। এ ছাড়া, রক্ত-আমাশায় যে কত ক্লেশ, কত কষ্ট, কত যাতনা, রক্ত-আমাশা যার এক বার হইয়াছে, কেবল সেই তা জানে। রক্ত-আমা-

শাকে ডাক্তরেরা ডিসেণ্টরি বলেন। অনেকে ভুল করিয়া ডায়ারীয়াকে ডিসেণ্টরি বলেন। শুদ্ধু আমাশাকেও অনেকে ডিসেণ্টরি বলিয়া থাকেন। ফল কিন্তু তা নয়। আম আর রক্ত বাহ্যে যাওয়াকে ডিসেণ্টরি বলে। ডিসেণ্টরিতে আম আর রক্ত দুই-ই থাকা চাই। এর আগেই (৩১৫—৩১৬র পাতে) বলিছি যে, সবিরাম-জ্বরের (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবরের) আর স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) যেমন কারণ ম্যালেরিয়া, রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ ম্যালেরিয়া। অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই সেই এক সম্বন্ধ। ম্যালেরিয়া-জ্বর যেমন এক বারে হাজার হাজার লোকের হয়, রক্ত-আমাশাও তেমনি এক বারে হাজার হাজার লোকের হইতে পারে, আর হইয়াও থাকে।

রক্ত-আমাশা সামান্য রকম পেটের-ব্যামোর ভাবেও আরম্ভ হইতে পারে, কিম্বা গোড়া থেকেই এক বারে রক্ত-আমাশা দেখা দিতে পারে। প্রথমে রোগীর পেট কামড়ে পাত্লা বাহ্যে হয়। বাহ্যেতে পিত্তির ভাগ বেশী দেখা যায়। আর বাহ্যের পর মল-দুওর যেন ছেঁচাতে বা জ্বালা করিতে থাকে। তার পর, বারে বারে বাহ্যে যাইতে হয়। বাহ্যে বসিয়া রোগী পেটের কামড়ে অস্থির হয়। পেটের

কামড় যত বাড়ে, বেগও তত বেশী দিতে হয়। এই থল রোগ যে রকম করিয়াই কেন আরম্ভ হোক্ না, বাহ্যে শীঘ্রই খুব কম হইয়া যায়। বাহ্যেতে মল প্রায়ই থাকে না; কেবল আম আর রক্ত। রক্ত-আমাশার রোগীর বাহ্যের গন্ধ যার নাকে এক বার গিয়াছে, সে গন্ধ তার আর কখনও ভুল হয় না। পুরাণ রক্ত-আমাশায় বাহ্যের দুর্গন্ধ আরও বেশী। কার সাধ্য সে দুর্গন্ধে তিষ্ঠুতে পারে? রক্ত-আমাশা সব রোগীরই যে এক রকম হয়, তা নয়। সামান্য রকম পেট নাবায় যে কষ্ট হয়, কারো কারো তার চেয়ে বেশী হয় না। আবার কারো কারো ভয়ানক রকম রক্ত-আমাশা হয়, আর তাতেই তারা মারা পড়ে। সোজা-সুজি রক্ত-আমাশায় পেটের কামড় আর বাহ্যে বসিয়া বেগ দেওয়া ছাড়া আর কোনও বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। আহারের পর পেটের কামড় বাড়ে। যাই হোক্, ভাল রকম চিকিৎসা হইলে ব্যামো শীঘ্রই সারিয়া যায়।

রক্ত-আমাশা দু রকম। নূতন আর পুরাণ। এখন এই দু রকম রক্ত-আমাশার কথা এক এক করিয়া বলিব।

(১) নূতন রক্ত-আমাশা——লক্ষণ। নূতন রক্ত-আমাশা হইবার আগে কারো কারো বেশ শীত বোধ

হয়, তার পর জ্বর হয় আর নাড়ীর বেগ বাড়ে। রক্ত-আমাশা হইবার আগে, যাদের এই রকম শীত বোধ হইয়া জ্বর হয় আর নাড়ীর বেগ বাড়ে, তাদের বাহ্যেতে আম আর রক্ত শীঘ্রই দেখা দেয়; আর গোড়া থেকেই তাদের বাহ্যেতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। বারে বারে বাহ্যে যাইতে হয়। বাহ্যের বেগ উপস্থিত হইলে স্থির থাকিবার জো কি? তখনই বাহ্যে যাইতে হয়। শেষে বেগ আর শূলনি এত বাড়ে যে, রোগী বাহ্যে বসিয়া আর উঠিতে চায় না। এ দিকে আবার বেগ যত বেশী হয়, বাহ্যে করিবার ইচ্ছাও তত বেশী হয়। বাহ্যে পাতলা হয়, আর তাতে আম আর রক্ত ছাড়া কিছুই থাকে না। আম আর রক্তের সঙ্গে খুব শক্ত আর ছোট ছোট গুট্‌লে মলও মিশন থাকে। অল্প স্বল্প বাহ্যে যা হয়, তাতে রোগীর আরাম না হইয়া বরং যন্ত্রণাই বাড়ে। বাহ্যের রং যেমন কাল, তার দুর্গন্ধও তেমনি বেশী। বাহ্যের সঙ্গে রক্ত আর পূয মিশন থাকে। রক্ত আর পূয কোথা থেকে আসে? রক্ত-আমাশায় যে আঁতের (অন্ত্রের—ইণ্টেষ্টিনের) মধ্যে ঘা হয়। সেই ঘা থেকে রক্ত আর পূয আসে। অন্ত্রের মধ্যে ঘা হওয়ার কথা এখনই বলিব। বারে বারে বাহ্যে যাইবার ইচ্ছা যেমন হয়, বারে বারে প্রস্রাব করিবার ইচ্ছাও

তেমনি হয়। প্রস্রাব খুব লাল হয়, আর প্রস্রাব করিতে জ্বালা করে। কখন কখন অতি কষ্টে ফোটায় ফোটায় প্রস্রাব হয়।

রক্ত-আমাশার রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ কি দেখিয়া বুঝিবে?——যে রোগীর গতিক ভাল নয়, তার পেটে ব্যথা হয়; পেটে হাতের চাপ সয় না। তার পরই পেটের ফাঁপ হয়। নাড়ীর যেমন বেগ বাড়ে, তেমনি দুর্ব্বল হয়। জিব শুক্ন, রাঙা, আর চক্-চকে যেন বার্ণিশ-করা হয়। জিবের গোড়ায়, গালের ভিতর আর ঠোঁটে ঘা ফুটে। কখন কখন জিবের মাঝখানটা এক বারে কাল হইয়া যায়। আর সে ঠিক্ যেন কাঁচা মাংস বাহ্যে যায় তার পরই,বাহ্যে খুব বেশী বেশী হয় আর জলের মত পাতলা হয়। বাহ্যের রং কটাশে কটাশে হয়। দুর্গন্ধ এত হয় যে, তার ত্রিসীমানায় কেউ থাকিতে পারে না। দিন রাত্রি রোগী চকের পাতা বুজে না। তবে কখনও একটু আধটু তন্দ্রার মত হয়—আবার তখনই যেন কেউ ঘুম ভাঙাইয়া দেয়। ক্রমে পেটের ব্যথাটা যায়। (মরিবার ঠিক্ আগেই এইটী ঘটে)। পেটের উপর চাপ দিলে আর ব্যথা বলে না। তার পরই রোগী ভুল বকিতে আরম্ভ করে। রোগীর গা থেকে যেন মরার গায়ের গন্ধ বাহির

হয়। হিক্কি উঠিতে থাকে। তার পরই রোগী অবসন্ন হইয়া মারা যায়।

রোগীর গতিক যদি ভাল হয়, তবে এই মাত্র যে সব দুর্লক্ষণের কথা বলিলাম, তার একটীও দেখা দেয় না। তার বাহ্যের অবস্থা ভাল হয়। তার বাহ্যেতে সহজ বাহ্যের গন্ধ ফিরিয়া আসে। পেটের ব্যথা কমিয়া যায়—পেট তেমন ভার ভারও থাকে না। রোগীর অবসাদও ঘুচিয়া যায়। রোগী আগের চেয়ে চাঙ্গা হয়। নাড়ীর বেগ কমিয়া যায়। জ্বর যায়। পেটের-কামড়, শূলনি আর বেগ ক্রমে যায়।

রক্ত-আমাশা যে রকমেরই কেন হোক্ না, তার সঙ্গে জ্বর আর শরীরের গ্লানি থাকিতেই চায়। তবে খুব সামান্য রকম রক্ত-আমাশায় জ্বরও খুব সামান্য রকম হয়। অবসাদও হয় না, খিদেও যায় না, জিবও কোন রকম খারাপ হয় না। কিন্তু সচরাচর যে রক্ত-আমাশা হইয়া থাকে, তাতে রোগী অস্থির হয় আর ঘুমুতে পারে না। তার মুখ দেখিলে বোধ হয়, যেন সে বড় কষ্ট পাইতেছে। এ ছাড়া, তার দুই উরতে খাল ধরে। খাল ধরার জন্যে তাকে বড়ই যন্ত্রণা পাইতে হয়। জিব অপরিষ্কার হয় আর কাঁটা কাঁটা হয়। নাড়ীর বেগ বাড়ে। নাড়ী শক্ত আর সরু হয়। গা খস্‌খসে, শুক্‌, আর গরম হয়।

পিপাসা খুব হয়। আহারে মোটেই রুচি থাকে না। মাঝে মাঝে হাঁপ হয়, আর শরীর বড় অবসন্ন হয়। রক্ত-আমাশা যদি সারে, তবে ব্যামো ভাল হইবার লক্ষণ গুলি ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলের আগে, বারে বারে বাহ্যে যাওয়া আর পেটের ব্যথা কমে। এ ব্যামো এত আস্তে সারে যে, ব্যামোটা নির্দ্দোষ না সারিলে আর ভরসা বা বিশ্বাস হয় না—ব্যামো পাল্টাইবারও ভয় যায় না। রক্ত-আমাশার রোগী নির্দ্দোষ হইয়া সারিতে দেরি হইয়াই থাকে।

কারণ——এর আগেই বলিছি যে, এক এক রোগের দুই দুই কারণ। দূর কারণ আর নিকট কারণ। সব রোগেরই যে এই দুই কারণ সব জায়-গায় বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, তা নয়। তবে মন লাগিয়া খুঁজিলে, চারি ভাগের তিন ভাগেরও বেশী রোগের দূর কারণ আর নিকট কারণ স্পষ্ট জানিতে পার। ২৯৯—৩০১র পাত আর এক বার ভাল করিয়া পড়। এখন রক্ত-আমাশার দূর-কারণ আর নিকট-কারণের কথা বলি। দূর-কারণ—— খুব গরমের সময় রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, খুব গরম কাল—খুব গ্রীষ্মের সময় এ রোগের একটা দূর-কারণ। যারা খাবার জিনিষের ভাল

মন্দ বিচার করে না—যা পায়, যা জোটে, তাই খায়, তাদেরই রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, কদাহার এ রোগের একটী দূর-কারণ। কদাহার কাকে বলে? কু-আহারকে ভাল বাঙ্গালায় কদাহার বলে। যা খাইলে শরীর সুস্থ না হইয়া বরং অসুস্থ হয়, তাকেই কদাহার (কু-আহার) বলে। লোণা-মাছ (যেমন লোণা ইলীশ) লোণা মাংস, কাঁচা ফল-ফুলরি (যেমন কেষ্টো কুল, কাঁচা পেয়ারা) এ সবই কদাহার। যারা খুব বেশী শ্রম করে, তেমন বিশ্রাম করিতে পায় না; যাদের আহারাদি ভাল জোটে না; যারা রৌদ্রে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, শিশির ভোগ করে; তাদেরই রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, এ সব অনিয়মও রক্ত-আমাশার দূর কারণ জানিবে। 'যারা খাওয়া দাওয়ায় ও আর আর সকল কাজেই নিয়ত অত্যাচার করে, তাদেরও রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, অত্যাচার রক্ত-আমাশার একটী দূর কারণ। অত্যাচার বলিলে যে কেবল একটী কাযেরই অত্যাচার বুঝায়, তা নয়। অত্যাচার সকল কাযেই হয়। পাঁচ কোষ কাঁটাল খাইলে, তাকে অত্যাচার বলে না। 'তুমি বড় একটা কাঁটালের এক বারে আধ খানা খাইয়া ফেলিলে—তাকেই অত্যাচার বলে। স্নান

করিবার সময় রোজ একটু করিয়া সাঁতার দিলে, তাকে অত্যাচার বলে না। তুমি ভোরে জলে নামিলে, আর বেলা তুপর পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিলে আর ডুব কুঁড়িলে—তাকেই অত্যাচার বলে। যার মোটেই খিদে হয় না, যা খায় ভাল পরিপাক করিতে পারে না, ডাক্তরের ব্যবস্থা লইয়া সে যদি রোজ ভাত খাইবার আগে চা-চামচের এক চামচ (এক ড্রাম্) একের নম্বর ব্রাণ্ডি নিয়ম করিয়া খায়, তাকে অত্যাচার বলে না। তুমি দিনের মধ্যে আধ বোতল ব্রাণ্ডি পার করিলে—তাকেই অত্যাচার বলে।

তার পর, রক্ত-আমাশার নিকট কারণ বলি—ম্যালেরিয়া রক্ত-আমাশার একটী নিকট কারণ। সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর্) আর স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট-ফীবর্) যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার তেমনি একটী ফল। ৩১৫—৩১৬র পাতে এ কথা বলিছি। সবিরাম-জ্বর আর স্বল্পবিরাম-জ্বরের যেমন কারণ ম্যালেরিয়া, রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ ম্যালেরিয়া। অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই সেই এক সম্বন্ধ। এ কথাও ৬০৬র পাতে বলিছি। নোংরা, ঘোলা বা অপরিষ্কার জল খাওয়া রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। গায়ে কোন রকম বেশী

ঠাণ্ডা লাগান, এ রোগের আর একটী নিকট কারণ। বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে কাপড়ে থাকা, শিশিরে শোওয়া, শীতের সময় আদুল গায়ে থাকা, এই রকম অত্যাচারেই গায়ে বেশী ঠাণ্ডা লাগান হয়। বাইরে শুইয়া রাত্রের নরম হাওয়া গায়ে লাগান বড় দোষ। শীতকালের ত কথাই নাই—গ্রীষ্মকালেও গ্রীষ্মের জন্যে বাইরে শুইয়া রাত্রের নরম হাওয়া গায়ে লাগান বড় দোষ। দিনের বেলায় তেমন গরমের পর, রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা আরও দোষ। উপ্‌রো উপ্‌রি এ রকম অত্যাচার করিয়া রক্ত-আমাশার হাত কখনই এড়ান যায় না। আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশে রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা, আর শরীরের মধ্যে ম্যালেরিয়াকে জায়গা দেওয়া সমান—এ কথাটা যেন মনে থাকে। ম্যালেরিয়া যে রক্ত-আমাশার নিকট-কারণ, তা এই মাত্র বলিছি। মল-বদ্ধ রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। যে জোলাপে ভারি ভেদ হয়, সে জোলাপে রক্ত-আমাশা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। এই জন্যে, সে রকম জোলাপ লওয়াও রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। এই জন্যে, জোলাপ বেশ বুঝিয়া সুজিয়া লইতে হয়। কোন্ কোন্ জোলাপ লইলে খুব বেশী জলবৎ ভেদ হয়, এর পর তা

বলিব। যে সব জায়গায় ম্যালেরিয়া-জ্বরের খুব বাড়াবাড়ি, সে সব জায়গায় রোগা, কাহিল আর দুর্ব্বল লোকদেরই রক্ত-আমাশা বেশী হয়। সামান্য একটু অত্যাচারেই তাদের রক্ত-আমাশা হয়। এ ছাড়া, সে সব জায়গায় সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর) কিম্বা স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) সঙ্গে রক্ত-আমাশা প্রায়ই থাকে। কিম্বা সেই এক রোগীরই এক বার বা রক্ত-আমাশা, এক বার বা সবিরাম-জ্বর বা স্বল্পবিরাম-জ্বর হয়।

উপসর্গ——আসল রোগের সঙ্গে আর কোনও রোগ যোগ দিলে, সেই রোগকে আসল রোগের উপসর্গ বলে। রক্ত-আমাশা রোগে অনেক উপসর্গ ঘটে। রক্ত-আমাশার সঙ্গে, রক্ত-আমাশা হইবার আগে, কিম্বা রক্ত-আমাশা হইবার পরে কম্প-জ্বর বা স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) হইতে পারে। রক্ত-আমাশায় আর একটী উপসর্গ ঘটে। সে উপসর্গটীকে ডাক্তরেরা স্কর্ব্বি বলেন। স্কর্ব্বি এক রকম রোগ। অনেক দিন শাক শব্জি আর টাট্‌কা রসাল ফল মূল না খাইলে এই রোগ হয়। এ রোগে দাঁতের গোড়া ফোলে, দাঁতের গোড়া আল্লা হইয়া যায়, দাঁতের গোড়ার আঁইট থাকে না, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে, আর রোগী দুর্ব্বলের এক-

শেষ হয়। এ ছাড়া, রোগীর সকল গায়ে বেগুণে রঙের সব ফোটা ফোটা দাগ ফোটে। রক্ত-আমাশায় লিবর (যকৃত, মেটে) বাড়িতে পারে, লিবরের ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌ (প্রদাহ) হইতে পারে, কিম্বা লিবরে ফোড়া হইতে পারে। আমাদের এই গরম দেশে রক্ত-আমাশা রোগে যকৃ-তের (লিবরের) এই সব দোষ খুবই ঘটে। এই জন্যে, সব রক্ত-আমাশা রোগীরই যকৃত (লিবর) পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। রক্ত-আমাশা যত দিন প্রবল থাকিবে, রোজ খুব সাবধানে যকৃত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এমন কি, রক্ত-আমাশা সারিয়া গেলেও যকৃত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যকৃত বাড়িলে, যকৃতের প্রদাহ হইলে, আর যকৃতে ফোড়া হইলে, কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, আর কেমন করিয়াই বা তা ঠিক্‌ করিতে হয়, এর পর সে সব বেশ করিয়া বলিব। রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতে (লিবরে) ফোড়া হওয়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, আজ্‌ও তা ঠিক্‌ হয় নাই। বড় বড় ডাক্তরেরা বলেন, রক্ত-আমাশা আর যকৃতে ফোড়া, দুয়েরই কারণ এক; কিন্তু পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। যাই হোক্‌, আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশা আর যকৃতের ব্যামো যে খুব সাধারণ,

আর এই দুই ব্যামোই যে ঢের জায়গায় এক সঙ্গেই ঘটে, তা যেন সকলেরই মনে থাকে। একে রক্ত-আমাশা নিজেই খুব শক্ত ব্যামো, তার উপর যকৃতের ব্যামো যোগ দিলে রোগীর বিপদ্ যে খুবই বাড়ে, তা বুঝাই যাইতেছে। ভিজে সোঁতা মাটিতে বাস, হিম বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা—এই সব অত্যাচারে যাদের শরীর একবারে ভগ্ন আর দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, রক্ত-আমাশা হইলে তাদের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। সচরাচর রক্ত-আমাশা যে রকম হইয়া থাকে, এদের রক্ত-আমাশা সে রকম নয়। এদের রক্ত-আমাশা ভারি বাড়াবাড়ি রকমেরই দেখা যায়। এ রকম রক্ত-আমাশাকে ডাক্তরেরা ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ডিসেণ্টরি বলেন। ভাল বাঙ্গালায় মারাত্মক রক্ত-আমাশাও বলে, সাংঘাতিক রক্ত-আমাশাও বলে। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে কেবল অপরিষ্কার জল খাইয়া, আর রাত্রে হিম বাত ভোগ করিয়া লোকের রক্ত-আমাশা হয়। সে সব জায়গায় আর বেশী অত্যাচার করিবার দরকার হয় না। যদি বল, সে সব জায়গা আবার কি রকম? আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল জায়গায়ই সেই রকম। মোটা কথায়, সেই এক অত্যাচারেই কারও বা ম্যালেরিয়া-জ্বর হয়, কারও বা রক্ত-

আমাশা হয়। সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবর), স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) আর রক্ত-আমাশা —ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই এক সম্বন্ধ। এ কথা এর আগেই বলিছি।

রক্ত-আমাশা রোগের শেষে কি ঘটে ?——(১) রক্ত-আমাশা রোগে অন্ত্রে যে ঘা হয়, সেই ঘা বাড়িয়া অন্ত্র ফুটো বা ছাঁদা হইয়া যাইতে পারে। অন্ত্র ফুটো বা ছাঁদা হইয়া গেলে অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দার সাংঘাতিক প্রদাহ ঘটে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা এই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিটোনিয়াম্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্র-বেষ্ট বলে। ৪৯০র পাতে এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। অন্ত্র-ঢাকা পর্দ্দার প্রদাহকে ডাক্তরেরা পেরিটোনাইটিস্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ বলে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। (২) অন্ত্র কাটিয়া যাইতে পারে, আর তার ভিতর থেকে মল বাহির হইয়া পেটের মধ্যে কোন খানে জমা হইতে পারে। পেটের মধ্যে এই রকম করিয়া মল জমা হইয়া বাহিরে ফোড়ার মত ঠেল ধরিতে পারে। একেই ডাক্তরেরা ফীক্যাল্ য়্যাব্সেস্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় ফীক্যাল্ য়্যাব্সেস্কে মলস্ফোট বলা যাইতে পারে। মলস্ফোটের সোজা

বাঙ্গালা মলের ফোড়া। (৩) রক্ত-আমাশা থেকে পায়ীমিয়া হইতে পারে; আবার পায়ীমিয়া থেকে শরীরের জায়গায় জায়গায় বড় বড় ফোড়া বাহির হইতে পারে। খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে যে রোগ হয়, সেই রোগকে ডাক্তরেরা পায়ীমিয়া বলেন। পায়ীমিয়া বড় খারাপ রোগ। এ রোগের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। (৪) অন্ত্রের ঘা শুকাইয়া একবারে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইতে পারে; এ রকম কোষ্ঠবদ্ধ বড় সোজা নয়। রোগীকে এর জন্যে নাকালের এক-শেষ হইতে হয়। যদি বল, অন্ত্রের ঘা শুকাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয় কেন? কোষ্ঠবদ্ধ কেন হয়, আর কেমন করিয়া হয়, তা বলি। সকলেই জানেন, ঘা শুকাইবার সময়, তার কাছের চামড়া টানিয়া ধরে। চারি দিকের চামড়া এই রকম টানিয়া ধরা, পোড়া ঘায়ে যেমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন আর কোন ঘায়েই নয়। গালের কি চুয়ালের চামড়া পুড়িয়া গেলে, সেই ঘা শুকাইবার সময় সে দিকের মুখের কেমন বাঁকা তেড়া ভাব হয়, তা অনেকেই দেখিয়াছেন। অন্ত্রের ঘা শুকাইবার সময়ও তার কাছের সব জায়গায় সেই রকম টান ধরে। সেই টানে গুটাইয়া জড় সড় হইয়া অন্ত্রের

সেই জায়গার খোল কমিয়া যায়। অন্ত্রের এ রকম দুর্দ্দশা হইলে মল যে সহজে বাহির হইতে পারে না, তা বুঝাই যাইতেছে। কাযেই, এ অবস্থায় ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ ত হবেই। (৫) রক্ত-আমাশার খুব বাড়াবাড়ি হইলে রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। (৬) অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ) পচিয়া যাইতে পারে। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি পচিয়া গেলে, রোগী দেখিতে দেখিতে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে; আর তার পরই মারা যায়। (৭) রোগীর ভয়ানক রক্ত-ভেদ হইতে পারে, আর সেই ধাক্কাতেই সে মারা যাইতে পারে। (৮) রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর ভয়ানক বমি উপস্থিত হইতে পারে; সে বমির আর বিরাম নাই; সে বমি থামানও যায় না। (৯) রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর জিবে ও মুখের ভিতর আর আর জায়গায় শাদা শাদা এক রকম ঘা ফোটে। এই রকম ঘাকে ডাক্তরেরা য়্যাফ্থি বলেন। য়্যাফ্থির কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। (১০) রক্ত-আমাশা থেকে যকৃতে ফোড়া হইতে পারে। যকৃতের ফোড়াকে ডাক্তরেরা য়্যাব্সেস্ অব্ দি লিবর্ বলেন। (১১) রক্ত-আমাশা থেকে উদরী হইতে পারে। উদরীকে ডাক্তরেরা য়্যাসাইটিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে

ড্রপ্‌সি বলে। (১২) রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর সন্নিপাত ঘটিতে পারে। সন্নিপাতকে ডাক্তারেরা কল্যাপ্স বলেন। সন্নিপাত-অবস্থা কাকে বলে, তা অনেক বার বলিছি। যে রোগেই কেন ঘটুক না, রোগী একবারে নিতান্ত নেতিয়ে পড়িলে, চক মুখ বসিয়া গেলে, নাড়ী দমিয়া গেলে, নাকে কথা উঠিলে, রোগীর সে অবস্থাকে সন্নিপাত-অবস্থা বলে।

রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর এই (১২) বার রকম অবস্থা ঘটিতে পারে। শেষে যা ঘটে, ভাল কথায় তাকে পরিণাম বলে। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের এই বারটী পরিণাম বলিতে পার। সব জায়গায় একরকম পরিণাম দেখিতে পাইবে না। আবার এক জায়গায় বার রকম পরিণামও দেখিতে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করিয়া দেখিলে, জায়গায় জায়গায় রকম রকম পরিণাম দেখিতে পাইবে। রোগের গোড়া থেকেই ভাল চিকিৎসা হইলে, এ রকম পরিণাম ঘটিতেই পারে না—এখানে এ কথাটা বলিয়া রাখা ভাল।

নিদান——রক্ত-আমাশা রোগের নিদান কি—নিদান কাকে বলে? আসল কারণকে ভাল কথায় নিদান বলে। অমুক রোগের নিদান কি, বলিলে কি

বুঝায়? সেই রোগের আসল কারণ কি, তাই বুঝায়। নিদানই বল, আর আসল কারণই বল, অর্থ এক। রক্ত-আমাশা রোগের আসল কারণ কি? আসল কারণ কি, এখন তাই বলিব। রক্ত-আমাশা রোগে অন্ত্রে ঘা হয়। অন্ত্র দু রকম, ছোট আর বড়। রক্ত-আমাশা রোগে ছোট অন্ত্রে, না বড় অন্ত্রে ঘা হয়? সচরাচর কেবল বড় অন্ত্রেই ঘা হয়। কিন্তু মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশায় ছোট অন্ত্রেও ঘা হয়। মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশা কাকে বলে, এর আগেই তা বলিছি। ফল কথা, রক্ত-আমাশায় বড় অন্ত্রেই ঘা হওয়া নিয়ম—এ কথাটা যেন মনে থাকে। বড় অন্ত্রের কোন্ জায়গায় কি রকম করিয়া ঘা হয়, আর সে সব ঘাই বা কি রকম, এখন তাই বলিব। ৫৪৫র পাতে বলিছি, অন্ত্রের ভিতর-পিঠ যে একটা খুব সরু পর্দ্দা দিয়ে মোড়া, সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ বলেন। এই মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ পর্দ্দাটী বড় কাযের। হজম বল, পরিপাক বল, সবই এরই গুণে হয়। এই পর্দ্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই আর কি, পেটের-ব্যামো হয়। পেট-নাবা বল, আমাশা বল, রক্ত-আমাশা বল, সব এই পর্দ্দারই ব্যামো থেকে হয়। মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণকে ভাল বাঙ্গালায়

শ্লেষ্মা-ঝিল্লি বলে। মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণের চেয়ে শ্লেষ্মা-ঝিল্লি ঢের সোজা কথা। এই জন্যে, বারে বারে মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ না বলিয়া তার বদলে এখন থেকে শ্লেষ্মা-ঝিল্লি বলিব। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গায়ে বিঁধ বিঁধ এমন লক্ষ লক্ষ দাগ আছে। বিঁধ বিঁধ এ সব দাগ কি? অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ভিতর খুব সরু সরু যে সব চুঙি বা নলি বসান আছে, সেই সব চুঙি বা নলির মুখ। এই সব চুঙি বা নলি কোন আলাদা জিনিশ দিয়ে তয়ের হয় নাই; সেই শ্লেষ্মা-ঝিল্লি দিয়াই তয়ের হইয়াছে। যেখানে যেখানে বিঁধ, সেই খানে সেই খানে শ্লেষ্মা-ঝিল্লি খুব সরু চুঙি বা নলির মত হইয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। এই সব চুঙি বা নলির নীচের দিকে মুখ নাই; নীচের দিকে বন্ধ। এই সব চুঙি বা নলি এত ছোট যে, খালি চকে তা নজর হয় না। ছোট জিনিশ বড় দেখায়, এমন এক রকম যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে মাইক্রস্কোপ্ বলে; ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বলে। অণু-বীক্ষণ-যন্ত্র দিয়া দেখিলে সে সব চুঙি বা নলি আর তাদের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট অন্ত্রের চেয়ে বড় অন্ত্রের চুঙি বা নলি গুলি অনেক বড়। গুহ্যদ্বারের কাছের চুঙি বা নলি গুলি আরও বড়।

ফল কথা, উপর থেকে গুহ্যদ্বারের দিকে চুঙি বা নলি গুলি ক্রমেই বড় হইয়া আসিয়াছে। বড় অন্ত্রের সব নীচের ভাগকে ডাক্তরেরা রেক্টম্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় রেক্টম্‌কে মলাশয় বা মলভাণ্ড বলে; সোজা বাঙ্গালায় মলের নাড়ী বলে। মলের নাড়ীর ঐ সব চুঙি বা নলি এত বড় যে, তাদের মুখ অর্থাৎ বিঁধ বিঁধ দাগ গুলি খালি চকেই দেখা যায়। ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গায়ে বসান এই লক্ষ লক্ষ চুঙি বা নলির কথা যে বলিলাম, এদের এক একটী কত টুকু করিয়া লম্বা? সব গুলি সমান লম্বা নয়। যে গুলি সব চেয়ে খাটো, সে গুলি এক ইঞ্চের ৩৬০ ভাগের এক ভাগের বেশী লম্বা নয়। আবার যে গুলি সব চেয়ে লম্বা, সে গুলি এক ইঞ্চের ১২০ ভাগের এক ভাগের চেয়ে খাটো নয়। এক ইঞ্চ্ কত টুকু? আঠার ইঞ্চে এক হাত। আবার ২৪ আঙুলে এক হাত। এখন হিসাব করিয়া দেখ, ক আঙুলে এক ইঞ্চ? ১$\frac{১}{৩}$ আঙুলে এক ইঞ্চ। একের নীচে ৩ দিলে, তিন ভাগের এক ভাগ বুঝায়। এই সব চুঙি বা নলির কায কি? তাদের ভিতর থেকে এক রকম রস বাহির হয়। সে রস নিয়তই বাহির হইতেছে। সেই রসে অন্ত্রের সমস্ত শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গা সর্ব্বদা

বেশ ভিজে আর নরম থাকে। তবেই দেখ, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গা সর্ব্বদা বেশ ভিজে আর নরম রাখাই তাদের কায। এ ছাড়া, অন্ত্রের মধ্যে আহার পরিপাক হইবার সময়ও তারা ঢের কাযে লাগে।

• তার পর বলি। রক্ত-আমাশা রোগে প্রথমে বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি একটু ফোলে আর বিবর্ণ হয়। শ্লেষ্মা-ঝিল্লির রং কি রকম হয়? রাঙা হয়, বেগুণে রং হয়, কটাসে হয়, কিম্বা ছেয়ে রং হয়। শ্লেষ্মা-ঝিল্লির জায়গায় জায়গায় খুবই রাঙা হয়। আবার কথন কথন শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সব জায়-গায়ই ঐ রকম রাঙা হয়। কথন কথন শ্লেষ্মা-ঝিল্লির রং একবারে কাল হইয়া যায়—বোধ হয় যেন পচিয়া গিয়াছে। কথন কখন শ্লেষ্মা-ঝিল্লি সহজ বেলার চেয়ে এত নরম হইয়া যায় যে, একটু চাপ বা জোর লাগিলেই ছিঁড়িয়া যায়। আর অন্ত্রটী নিজেই জড় সড় হইয়া যায়। রোগ বাড়িয়া গেলে, গোল গোল ছোট ঘা গুলি একত্র মিশে এক এক খানা খুব বড় বড় ঘা হয়। মেসেণ্টরির গ্ল্যাণ্ড গুলি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে, আর নরম হইয়া যায়। মেসেণ্টরিই বা কাকে বলে? গ্ল্যাণ্ড্ই বা কাকে বলে? ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্র, পেটের ভিতর পিঠের দাঁড়ার দিকে মাংসের গায়ে যে একটী পর্দা

দিয়া লাগান আছে, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মেসেণ্টরি বলেন। পেটের ভিতর পিঠের দাঁড়ার দিকে মাংসের গা আর অন্ত্রের গা, এই দুয়ের মাঝ-খানে থাকে বলিয়া ভাল কথায় ঐ পর্দ্দাকে মধ্যান্ত্র বলা যাইতে পারে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দা আর এই পর্দ্দা এক জিনিষ। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দা এক পুরু, আর এ পর্দ্দা দু-পুরু। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিটোনীয়ম্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট বলে। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। অনেকে জানেন, পাঁটা ঝুড়ে নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলিবার সময় শুদু পেট চিরিয়া দিলেই কাজ সিদ্ধি হয় না। নাড়ি গুলি ধরিয়া জোরে টানিলে তবে পেটের ভিতরকার মাংসের গা থেকে ছিঁড়ে আসে। ছেঁড়ে কি? যে মেসেণ্টরির কথা বলিতেছি, মাংসের গা থেকে সেই মেসেণ্টরি ছিঁড়ে আসে। নাড়ি ভুঁড়ি সব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, এমন করিয়া যদি পাঁটার পেট চিরিয়া ফেল, আর নাড়ি গুলি বেশ জুত বরাত করিয়া টানিয়া তুলিয়া ধর, তবে নাড়ি ভুঁড়ির গা থেকে পেটের ভিতরকার মাংসের গায়ে লাগান ঐ পর্দ্দাটী বেশ দেখিতে পাইবে। ঐ পর্দ্দাটী নাড়ি ভুঁড়ি গুলিকে পেটের ভিতরকার মাংসের সঙ্গে

আট্‌কাইয়া রাখে। পর্দ্দাটী আবার দু-পুরু বা দু-ভাঁজ। এ কথা এই মাত্র বলিছি। এই পর্দ্দার দুটী ভাঁজের মধ্যে শ খানেক, কি শ দেড়েক বিচি বিচি কি এক রকম জিনিষ আছে। এই বিচি গুলির আকার আবার সব সমান নয়। যে গুলি খুব ছোট, সে গুলি কলাইয়ের চেয়ে বড় নয়। যে গুলি খুব বড়, সে গুলি ছোট বাদামের চেয়ে ছোট নয়। বিচি বিচি এ গুলি কি? সোজা বাঙ্গালায় এ বিচি গুলিকে আমরা গুল্লি বলিয়া থাকি। শরীরের সব জায়গাতেই গুল্লি আছে। গাল, গলা, কানের গোড়া, বগল, কুচ্‌কি ও আর সব জোড়ের জায়গায় গুল্লি বেশী থাকে, আর বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। এই সব গুল্লিকে ডাক্তরেরা গ্ল্যাণ্ড্‌স্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় গ্রন্থি বলে। র পাতে রসের যে সব শিরের কথা বলিছি, সেই সব শির এই সব গুল্লির ভিতর দিয়া যাতায়াত করে। এই জন্যেই, এই সব গুল্লিকে রসের গুল্লি বলা যাইতে পারে। রসের গুল্লিকে ডাক্তরেরা লিম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ড্‌স্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় লসীকা-গ্রন্থি বলে।

গাল, গলা, বগল, কুচ্‌কি কি আর কোন জায়গার গুল্লি ফুলিলে, তাতে ব্যথা হইলে, আমরা বলিয়া থাকি গুল্লি আউরেছে; ডাক্তরেরা বলেন

গ্ল্যাণ্ডের ইন্‌ফ্ল্যামেশন্ হইয়াছে; ভাল বাঙ্গালায় বলি গ্রন্থির প্রদাহ হইয়াছে। এই জন্যে রক্ত-আমাশা রোগে মেসেণ্টরির গ্ল্যাণ্ড গুলি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে আর নরম হইয়া যায়, না বলিয়া, তার বদলে মধ্যান্ত্রের (ঐ পর্দ্দার) গুল্লি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে আর নরম হইয়া যায়, বলিতে পার।

রোগের গোড়ায় অন্ত্রের মধ্যে আম, রক্ত, আর এক রকম পাতলা রস থাকে। এই পাতলা রস আর কিছুই নয়; একে লিম্ফ্ বলে। লিম্ফের কথা র পাতে বলিছি। রোগ বাড়িয়া গেলে অন্ত্রের মধ্যে পূয আর রক্ত মিশন থাকে। যে রোগী অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়াছে, তার অন্ত্রের ঘা গুলি এক বারে জড় সড়, আর সেই সব ঘায়ের চারিদিক প্রায় হাড়ের মত শক্ত দেখা যায়। যে সব ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, তাদের জায়গায় শক্ত জাম্‌ড়ো দেখিতে পাওয়া যায়। বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঐ সব চুণ্ডি বা নলি বড় হয়। আর ঐ সব চুণ্ডি বা নলি বেড়িয়া, বা তাদের ভিতর ঘা হয়। ঘা গুলি আগে গোল থাকে, আর তাদের কিনারা গোল বা চেপ্টা। তার পর ঘা গুলির মাঝখান খোল হইয়া যায়। শেষে ঘা গুলি আর গোল থাকে না, শীঘ্রই তেড়া বাঁকা হইয়া যায়। ঘা গুলি অন্ত্রের লম্বা-

লম্বি ভাবে হয় না, অন্ত্র বেড়িয়া হয়। সব ঘাই যে অন্ত্র বেড়িয়া হয়, তা নয়; তবে প্রায় বটে। আবার অন্ত্রের সব খানি বেড়িয়াই যে ঘা হইয়া থাকে, বা হইতে চায়, তা নয়। ঘা গুলির আকার প্রকার এক রকম নয়। কতক গুলি বড়, কতক গুলি মাঝারি রকম, কতক গুলি ছোট। কতক গুলি গোল, কতক গুলি লম্বা, কতক গুলি বাঁকা তেড়া। কতক গুলি বেশী গভীর, কতক গুলি কম গভীর। অনেক জায়গায় শ্লেষ্মা-ঝিল্লি পচিয়া খসিয়াও গিয়া ঐ রকম সব ঘা হয়। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি এই রকম করিয়া পচিয়া খসিয়া গেলে, তার নীচেকার পর্দ্দা গুলি এত পুরু হয় যে, অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া যাদের শরীর এক বারে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া গিয়াছে, তাদের পেটে হাত দিয়া সে অন্ত্র সহজেই মালুম করিতে পারা যায়। রক্ত-আমাশা যাদের ভাল হয়, তাদের অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির এই সব ঘায়ের কিনারা বা ধার আগে বেশ গোল হয়, আর দেখিতে সহজ ঘায়ের মত হয়। তার পর সেই কিনারা থেকে নূতন মাস গজাইয়া ক্রমে ঘা পুরিয়া উঠে। রক্ত-আমাশা রোগ পুরাণ পড়িয়া গেলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা গুলি এমন কি শুকাইয়া গেলেও, রোগী আম রক্ত-

বাহ্যে যাইতে থাকে। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা গুলির সব রকম অবস্থাই দেখা যায়। কতক গুলি ঘা বা শুকাইয়া গিয়াছে, কতক গুলি ঘা বা দগ্‌দগে। অন্ত্রের পর্দ্দা গুলি পাতলা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সচরাচর তাদের পুরুই দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় আবার একটী পর্দ্দা তয়ের হইয়া অন্ত্রের ভিতর খানিকটে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এ পর্দ্দাতেও ঘা হইতে পারে। আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো প্রায়ই হইয়া থাকে। এ কথা এর আগেই বলিছি। ঠাণ্ডা দেশে রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো সচরাচর ঘটে না।

রক্ত-আমাশা-রোগে রোগী কত দিন ভোগে?—দু পাঁচ দিনও ভুগিতে পারে, দু পাঁচ মাসও ভুগিতে পারে, আবার দু পাঁচ বছরও ভুগিতে পারে। আবার চাই কি, তারও বেশী ভুগিতে পারে।

রক্ত-আমাশায় কত রোগী মরে?——নূতন রক্ত-আমাশায় যদি খুব বেশী মরে, তবে ৮ জনের মধ্যে এক জন মরে; আর যদি খুব কম মরে, তবে ৫০ জনের মধ্যে ১ জন মরে। আবার এর মাঝামাঝিও হইতে পারে। পুরাণ রক্ত-আমাশায় যদি

খুব বেশী মরে, তবে ৪ জনের মধ্যে এক জন মরে; আর যদি খুব কম মরে, তবে ৬ জনের মধ্যে এক জন মরে। তবেই দেখ, নূতন রক্ত-আমাশার চেয়ে পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগী কত বেশী মরে! নূতন রক্ত-আমাশার চেয়ে পুরাণ রক্ত-আমাশাকে সেই জন্যে কত বেশী ভয় করা উচিত! আর নূতন রক্ত-আমাশাকে পুরাণ পড়িতে না দেওয়া সেই জন্যে কত দরকার!

রক্ত-আমাশা রোগ কেমন করিয়া ঠিক্ করিতে হয়?——রক্ত-আমাশা ঠিক্ করা শক্ত নয়। দস্তুর মত রক্ত-আমাশা হইলে, মেয়েরাও তা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে। রক্ত-আমাশা রোগীর আম-রক্ত বাহ্যে, বাহ্যে বসিয়া তার কোঁতানি, আর তার পেটের কামড়,—এসব দেখিলে রক্ত-আমাশা রোগ ঠিক্ করিতে কারুই বাকি থাকে না। রক্ত-আমাশা রোগীর বাহ্যের গন্ধ যার নাকে একবার গিয়াছে, তার আর কখনও ভুল হয় না। এ কথা এর আগেই বলিছি।

ছোট অন্ত্রের প্রদাহ আর ছোট অন্ত্রে ঘা হইলেও আম-রক্ত ভেদ হয়। রক্ত-আমাশায় সচরাচর কেবল বড় অন্ত্রেই ঘা হইয়া থাকে। রক্ত-আমাশার আসল কারণ বলিবার সময় এ কথা

বলিছি। ছোট অন্ত্রের প্রদাহকে ডাক্তরেরা এণ্ট-রাইটিস্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় ছোট অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির প্রদাহ বলে। এখন কেমন করিয়া জানিবে যে, আম-রক্ত ভেদ ছোট অন্ত্রের ঘা থেকে হইতেছে, কি বড় অন্ত্রের ঘা থেকে হইতেছে। লক্ষণ দেখিয়া তা জানা যায়। রোগীর খিদে যদি এক বারে যায়—খাইবার ইচ্ছা মোটেই না থাকে, বমি হয়, আর রোগী এক বারে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া পড়ে, তবে ঠিক্ করিবে যে, তার ছোট অন্ত্রে ঘা হইয়াছে, আর ছোট অন্ত্রের প্রদাহ হইয়াছে। এ সব লক্ষণ যদি না দেখ, তবে বড় অন্ত্রেই ঘা হইয়াছে, ঠিক্ করিবে।

রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ—আম-রক্ত ভেদ যদি বেশী না হয়, আর তার কাহিল শরীরে স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্) আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে তার রোগ সারিবে বলিয়া আশা ভরসা দিতে পার। সচরাচর যে স্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়া থাকে, আর ১৭০ থেকে ২৪৬র পাতে যে স্বল্পবিরাম-জ্বরের কথা বলিছি, আর যে স্বল্পবিরাম-জ্বরের উপসর্গের কথা ২৪৬র পাত থেকে বলিতে আরম্ভ করিছি, এ সে স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্) নয়। এ আর এক রকম স্বল্পবিরাম-জ্বর।

এ স্বল্পবিরাম-জ্বরকে ডাক্তরেরা হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলেন। যদি বল, এ দু রকম স্বল্পবিরাম-জ্বর তবে কেমন করিয়া চিনিবে? তা চেনা শক্ত নয়। চিনিবার বেশ উপায়ই আছে। সচরাচর যে স্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়া থাকে, সে স্বল্পবিরাম-জ্বর গোড়া থেকেই হয়। আর কোনও রোগ থেকে হয় না। কিন্তু যে স্বল্পবিরাম-জ্বরকে ডাক্তরেরা হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলেন, গোড়ায় আর কোন রোগ না থাকিলে, সে স্বল্পবিরাম-জ্বর হয় না। ফল কথা, সেই রোগ থেকেই সে স্বল্পবিরাম-জ্বর (হেক্‌টিক্ ফীবর্) হয়। মোটামুটি মনে করিয়া রাখ, দুর্ব্বল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপনা থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর হইলে, সেই স্বল্পবিরাম-জ্বরকে ডাক্তরেরা হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলেন। উদ্দীপনা কি, আর কাকেই বা উদ্দীপনা বলে, ৫৪৬র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। দুর্ব্বল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপনা থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর (হেক্‌টিক্ ফীবর্) হওয়ার কথা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, বারে বারে আম-রক্ত বাহ্যে গিয়া, আর পেটের কামড়, শূলনি, আর কোঁতানিতে রোগী খুব কাবু আর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। আর বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা বাড়িয়া তা থেকে ভারি রকম

উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়াছে, আর সেই উদ্দীপনা থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়াছে। এই যে স্বল্পবিরাম-জ্বর, একেই তুমি হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলিতে পার। স্বল্প-বিরাম-জ্বরে দিন রাতের মধ্যে জ্বরের কেবল এক বার প্রকোপ হয়। কিন্তু হেক্‌টিক্ ফীবরে দিন রাতের মধ্যে সচরাচর জ্বরের দু বার প্রকোপ হয়। এ ছাড়া, হেক্‌টিক্ ফীবরে গায়ের তাতের চেয়ে হাতের তেলো আর পায়ের তেলোর তাত খুব বেশী হয়। রোগীর হাতের তেলো আর পায়ের তেলো এত গরম হয় যে, তাতে হাত দিলে বোধ হয় যেন হাত পুড়িয়া গেল। জ্বরের প্রকোপের সময় রোগীর গাল দুটী লাল হয়। রোগীর শরীর দেখিতে দেখিতে ক্ষয় পাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর আর হেক্‌টিক্ ফীবরের তফাত এই, মোটামুটি জানিয়া রাখ। হেক্‌টিক্ ফীবরের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। হেক্‌টিক্ ফীবরের বাঙ্গালা কি? ভাল বাঙ্গালায় হেক্‌টিক্ ফীবরকে ক্ষয়-জ্বর বলিতে পার। যে জ্বরে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই জ্বরকে ক্ষয়-জ্বর বলে। এই জন্যে, হেক্‌টিক্ ফীবরের যে অর্থ, ক্ষয়-জ্বর বলিলে তা বেশ বুঝায়।

'রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ—খুব ভারি রকম বেগ আর পেটের কামড়, বমি,

হিক্কি, হাত পা ঠাণ্ডা, গায়ের জায়গায় জায়গায় ঠাণ্ডা ঘাম, খুব রাঙা আর শুক্ন জিব্। রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে; বাহ্যেতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়; রোগীর গায়ে মশার কামড়ের দাগের মত বেগুনে রঙের বিন্দু বিন্দু দাগ ফোটে; রোগী অসাড়ে বাহ্যে যায়; হাত ধরিয়া দেখিলে পাঁচ সাত বার অন্তর এক বার নাড়ী পড়া টের পাওয়া যায় না। রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো আর সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবর্) কিম্বা স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্)।

চিকিৎসা——রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় ডাক্তর-দের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায় না। সেই এক রক্ত-আমাশা রোগীর চিকিৎসায় যদি দশ জন ডাক্তর ডাক, তবে সেই এক রোগের দশ রকম ব্যবস্থা পাবে। এই জন্যে, অনেক জায়গায় রক্ত-আমাশা রোগের ভাল রকম চিকিৎসাই হয় না। আর এই জন্যেই, নূতন রক্ত-আমাশা অনেক জায়গায় নির্দ্দোষ হইয়া সারে না—পুরাণ পড়িয়া যায়। নূতন রক্ত-আমাশার চেয়ে পুরাণ রক্ত-আমাশায় ভয় কত বেশী, এর আগেই তা বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের স্বভাবটী যিনি তলিয়ে বেশ বুঝিয়াছেন, তাঁকে দিয়া এ রোগের চিকিৎসা যেমন

হয়, তেমন আর কারও দিয়া হয় না। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা বড়ই খল রোগ। দেখিতে দেখিতে প্রমাদ ঘটে। যখন বলিছি যে, রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়, তখন এ রোগের স্বভাবের কি আর বেশী পরিচয় দিতে হবে? মোটামুটি জানিয়া রাখ, এই দুরন্ত খল রোগে একটু-তেই তিলে তাল হইতে পারে। এই জন্যেই বলিতেছি, গোড়ায় রক্ত-আমাশা রোগীর চিকিৎসা হওয়াই কায, আর গোড়ায় চিকিৎসা হইলেই রোগীর কল্যাণ। যে রক্ত-আমাশা রোগের বাড়া-বাড়ি হইলে চিকিৎসক মাথা মুড় খুঁড়িয়াও রোগ শান্তি করিতে পারেন না, গোড়ায় ভাল চিকিৎসা হইলে সেই রক্ত-আমাশা রোগ থেকে রোগী সদ্য ভাল হইয়া উঠিতে পারে রক্ত-আমাশার চিকিৎসা যিনি গোড়া থেকে করিতে পান, তাঁরই জিত। যদি বল, সব রোগেরই বেলায় তএ কথা বলিতে পারা যায়। তা পারা যায় বটে; কিন্তু পুরাণ পড়িয়া গেলে রক্ত-আমাশা ভাল করা যত শক্ত, আর তাতে যত ভয়, এমন আর কোন রোগের বেলায় নয়। মনে কর, রক্ত-আমাশা হইতেই তোমাকে ডাকিল। এখন তুমি রোগীর কি রকম চিকিৎসা করিবে? বড় অন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত মল বা গুট্‌লে থাকিয়া

রোগ বাড়াইয়া দিতে পারে,—এ রকম করিয়া রোগ বাড়াইয়া দিয়াও থাকে। এই জন্যে, ৪০।৫০ ফোটা লডেনমের সঙ্গে পূর এক মাত্রা ক্যাষ্টর অইল্ খাওয়াইয়া দিবে। লডেনম্‌কে ডাক্তরেরা টিংচর্ ওপিয়াই বলেন। ক্যাষ্টর অইলের পূর মাত্রা কত খানি? আধ ছটাকের কম নয়। একটু আধটু বেশী হইলেও হানি নাই। লডেনমের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইল্ দিলে ভারি উপকার হয়। জোলাপ খোলার পর অন্ত্রের যে একটু উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়া থাকে, লডেনমে তা হইতে দেয় না। কাযেই, এ রকম যুক্তি না করিয়া রক্ত-আমাশা রোগীকে জোলাপ দিলে তার ব্যামো বাড়ে বই, কমে না। ক্যাষ্টর অইলের গন্ধেও অনেকের ন্যাকার আসে। এই জন্যে, অনেকেই ক্যাষ্টর অইল্ খাইতে চায় না। আবার অনেকে খাইয়াও বমি করিয়া ফেলে। স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে ক্যাষ্টর অইলের তেমন যে বিট্‌কেল তার (আস্বাদন), তাও জানিতে পারা যায় না। যাঁরা ক্যাষ্টর অইল্ খাইতে বড়ই নারাজ, এ মুষ্টিযোগটী তাঁদের মনে করিয়া রাখিলে ভাল হয়। এই রকম যুক্তি করিয়া লডে-নমের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ উপ্‌রো উপ্‌রি দু তিন দিন দিলে, চাই কি, তাতেই রক্ত-

আমাশা বেশ সারিয়া যাইতে পারে। রোগীকে আর কোন অষুদ বিষুদ দিবার দরকার হয় না। জোলাপ দিবার সময়ই সকাল বেলা। শুধু জোলাপ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। জোলাপ দেওয়া যেমন দরকার, রোগীর পথ্যের ধরাধর করাও তেমনি দরকার। পথ্যের ধরাধর করাই পেটের-ব্যামোর আসল চিকিৎসা। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। এ কথাটা চিকিৎসকও যেন কখনও না ভুলেন, রোগীও যেন কখনও না ভুলে। ভুলিলে চিকিৎসকও যশ পাইবেন না, রোগীও রোগের হাত এড়াইতে পারিবে না। চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোনও জিনিষ রোগীকে খাইতে দিবে না। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, যে আহার দিবে, তাতে যেন রোগীর গায়ে বল হয়। এমন আহার কি? মাংসের কাথ, চুণের জল-মিশন এক-বল্কা দুধ, আর য়্যারারুট্। তিন ভাগ দুধের সঙ্গে এক ভাগ চুণের জল মিশাইয়া লইবে। রোগী যদি খুব দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তবে তাকে একটু একটু পোর্ট খাইতে দিবে। নূতন পোর্টের চেয়ে পুরাণ পোর্ট ভাল। পুরাণ পোর্টে বেশী উপকার হয়। বাজারে অনেক রকম পোর্ট বিক্রি হয়। যে সাহেব যে পোর্ট তয়ের করিয়াছেন, সে পোর্ট সেই সাহেবেরই নামে

চলিত। রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট, পেজ্ সাহেবের পোর্ট, আর হোয়াইট্ সাহেবের পোর্ট—এই তিন রকম পোর্টেরই আদর বেশী। ডাক্তারদের মধ্যে কেউ রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন; কেউ পেজ্ সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন; কেউ বা হোয়াইট্ সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন। রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট আদি বলিয়া আমি প্রায়ই আর কোনও পোর্ট ব্যবহার করি না। রবর্টসন্ সাহে-বের আসল পুরাণ পোর্ট যদি লও, তবে দু টাকা আড়াই টাকার কমে এক বোতল পাবে না। শস্তা খুঁজিতে গেলেই খারাপ জিনিষ পাবে। জোয়ান রোগীকে এক এক বারে ৪ ড্রাম করিয়া পোর্ট দিতে পার। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া পোর্ট তিন বারও দিতে পার, চারি বারও দিতে পার, ছয় বারও দিতে পার। বেশী দুর্ব্বল রোগীকে বেশী বার পোর্ট দেওয়া চাই। পোর্ট জলেরও সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার, খুব পাতলা ব্রথেরও সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার। কিন্তু দুধের সঙ্গে মিশা-ইয়া দিতে পার না। পোর্টের সঙ্গে মিশাইলে দুধ ছিঁড়িয়া যায়—দুধ নষ্ট হইয়া যায়। সে দুধ খাইলে রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ বাড়ে বৈ কমে না। এমনি শুদ্ধ দুধই রক্ত-আমাশা রোগীর পেটে

সয় না। তাতেই চূণের জলের সঙ্গে মিশাইয়া এক-বল্কা দুধ দিতে বলিছি। চূণের জলের সঙ্গে মিশাইলে দুধ ছানা হইতে পারে না—কাজেই পেটে গিয়া অগুণও করিতে পারে না। রক্ত-আমাশা রোগীর শূলনি, বেগ দেওয়া, আর প্রস্রাবের কষ্ট নিবারণের জন্যে মাঝে মাঝে লডেনমের পিচ্‌কিরি দিবে। কত খানি লডেনম্ কি রকম করিয়া গুহ্য-দ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে হয়, ১১৬র পাতে তা বিশেষ করিয়া বলিছি। রক্ত-আমাশা রোগীর পেটের কামড় নিবারণের যেমন অস্তুদ তার্পিণের সেক, তেমন অস্তুদ আর নাই। ৫১০—৫১১র পাতে প্লুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে বলিছি, এখানেও ঠিক্ সেই রকম করিয়া সেক দিবে। তার্পিণের এ রকম সেকে বড়ই উপকার হয়। দেখিতে দেখিতে পেটের কামড় নরম পড়ে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় রোগীর পেটে তার্পিণের এ রকম সেক দিতে কখনও ভুলিবে না।

আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশা রোগের চিকিৎসা যদি গোড়াতে হইল, তবেই মঙ্গল। নৈলে প্রমাদ। ফল কথা, রক্ত-আমাশা রোগের গোড়ায় চিকিৎসাই চিকিৎসা। রোগ

বাড়িয়া গেলে অসুদ দিয়া তা থামান মস্কিল। এই খল রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসককে বিস্তর বুদ্ধি কৌশল খাটাইতে হয়। চিকিৎসার জুত বরাত যিনি বেশ জানেন, দরকার হইলে যিনি বুদ্ধি কৌশল বেশ খাটাইতে পারেন, তাঁর হাতের রোগী প্রায়ই বেজায় হয় না। রোগ শক্ত রকম হইলে ত তার কথাই নাই। সোজা রোগেও রোগীকে যত দূর পার, স্থির রাখিবে। রোগী যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরে যেন বেশ বাতাস খেলিতে পায়। রক্ত-আমাশা রোগীর ঘাম হওয়া বড় দরকার। কি করিলে তার বেশ ঘাম হয়? গরম জলের টপে খানিক ক্ষণ বসাইয়া তার পর শুক্‌ন খস্‌খসে তোয়ালে কি কাপড় দিয়া তার সব গা খুব জোরে মুছাইয়া দিবে। তার পর যে সে একটা গরম কাপড় দিয়া তার সব গা ঢাকিয়া রাখিবে। তার পর নীচের লিখিত পুরিয়া অসুদ তাকে খাইতে দিবে। এতে সমস্ত দিন রাতিই তার একটু একটু করিয়া ঘাম হইতে থাকিবে। এ রকম ঘামে রক্ত-আমাশার বড়ই উপকার করে।

ইপেকা পাউডর	...	...	৫ গ্রেন্
বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা	...	...	১০ গ্রেন্
য়্যাকেশিয়া পাউডর	...	...	১০ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোজ তিন বেলা ৩টা পুরিয়া খাইতে দিবে। নূতন রক্ত-আমাশায় এই অস্থদটী আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। ইপেকাকুয়ানার মত নূতন রক্ত-আমাশার ভাল অস্থদ আর নাই। ইপেকাকুয়ানা খাইয়া বমি করিলে অস্থদের তেমন ফল পাওয়া যায় না। এই জন্যে, ইপেকাকুয়ানা খাইয়া যাতে বমি না হয়, তার ফিকির করিবে। এমন ফিকির কি? ইপেকাকুয়ানা খাইবার ঘন্টা খানেক আগেও কোন রকম জলীয় দ্রব্য খাবে না, অস্থদ খাওয়ার পরও ঘন্টাখানেক কোন রকম জলীয় দ্রব্যখাবে না। অস্থদের সঙ্গে যে জল টুকু খাওয়া দরকার, কেবল সেই জল টুকুই খাবে—তার বেশী খাবে না। গালে জল লইয়া পুরিয়া গিলিয়া খাবে। অস্থদ খাওয়ার আগে আর পরে যদি কোন রকম জলীয় দ্রব্য না খাও, আর অস্থদ খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাক, তবে বমি হওয়ার ভয় থাকিবে না। ইপেকাকুয়ানা খাইয়া যদি বমি না হয়, গা ন্যাকার ন্যাকার করে, আর বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, তবে বড়ই উপকার হয়। ইপেকাকুয়ানা খাইয়া অল্প গা-ন্যাকার ন্যাকার করিবে, কিন্তু বমি হবে না—এই হইলেই তোমার

রক্ত-আমাশা রোগীকে ইপেকাকুয়ানা খাওয়ানর যে ফল, তা হইল। বারে বারে ইপেকাকুয়ানা না বলিয়া, এখন থেকে সোজা-সুজি ইপেকা বলিব। ইপেকা খাইয়া যদি বড়ই গা-ন্যাকার ন্যাকার করে, তবে বরফের টুকরো খাইতে দিবে। পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়া যায় না। সেখানে রোগীর এ অবস্থা ঘটিলে কি করিবে? ৫গ্রেন্ ইপেকা খাইয়া রোগী যদি চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, আর কোন রকম জলীয় দ্রব্য না খায়, তবে তার গা-ন্যাকার ন্যাকার থামাইবার জন্যে বরফ খুজিবার দরকারই হয় না। একটু আধটু গা ন্যাকার ন্যাকার যা হয়, তা আপনিই সারিয়া যায়। তাতেই বলিতেছি, বরফের অভাবে পাড়াগাঁয়ে রক্ত-আমাশা-রোগীর চিকিৎসার কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। তবে এমন অনেক রোগী আছে, যাদের ইপেকা মোটেই সয় না। এক গ্রেন্ ইপেকা খাইলেও তাদের বমি হয়। তাদের উপায় কি করিবে? ইপেকা বৈ ত তোমার আর অসুদ নাই! ইপেকা ছাড়া নূতন রক্ত-আমাশার যদি আর কোনও অসুদ না থাকিত, তবে ডাক্তরেরা সত্য সত্যই সে সব রোগীর কোনও উপায় করিতে পারিতেন না। নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় যেখানে দেখিবে যে,

ইপেকা খাইয়া রোগী কোন ক্রমেই তা পেটে রাখিতে পারে না, কেবল সেই খানেই ধারক অসুদ দিবে। নৈলে, নূতন রক্ত-আমাশায় ধারক দিবার কোনও দরকার নাই—দেওয়া উচিতও নয়।

সম্প্রতি আমি একটী সাহেবের নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিছিলাম। ইপেকা যার পেটে না সয়, তার নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা কি রকম করিয়া করিতে হয়, এই সাহেবটীর চিকিৎসার বৃত্তান্ত পড়িলে বেশ বুঝিতে পারিবে। সাহেবটীর বয়স ৩২ | ৩৩ বছরের বেশী নয়। শরীর খুব সবল আর হৃষ্ট পুষ্ট। বছর চারি পাঁচ আগে তাঁর এক-বার রক্ত-আমাশা হইছিল। যাঁরা আসল বিলিতি সাহেব, পয়সা খরচ করিতে পারেন, ব্যামো স্যামো হইলে তাঁরা সাহেব ডাক্তরদেরই দিয়া চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। পয়সা ওয়ালা আসল বিলিতি সাহেবদের নিয়মই এই। কিন্তু কলিকাতার পয়সা ওয়ালা বাঙালি বাবুদের ব্যবহার এর ঠিক্ উল্টো ! সাহেব ডাক্তর আনিতে পারিলে আর দেশি ডাক্তর চান না ! এ সব দুঃখের কথায় আর এখন কাজ নাই। তার পর বলি। সাহেবের ব্যামো হইয়াছে, মেম সাহেব এক্ জন সাহেব ডাক্তরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তর সাহেব আসিয়া নূতন রক্ত-

আমাশা হইয়াছে শুনিয়াই একবারে এক ড্রাম ইপেকাকুয়ানা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ডাক্তর সাহেব চলিয়া গেলেন। স্কট্ টম্সনের ডিস্পেন্সরি থেকে অসুদ আসিল। রোগীকে এক পুঁরিয়া অসুদ খাওয়ান হইল। পাঁচ মিনিট্ না যাইতেই বমি হইয়া অসুদ উঠিয়া পড়িল। এই যে বমি আরম্ভ হইল, এ বমি ডাক্তর সাহেব তিন চারি দিনেও বন্ধ করিতে পারিলেন না। শেষে আর এক জন সাহেব ডাক্তরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে; বমি বন্ধ করিলেন। নিয়ত বমি করিয়া রোগী এত দুর্ব্বল আর কাবু হইয়া পড়িলেন যে, তাঁকে চাঙ্গা করিতে ডাক্তর সাহেবের ১৫ | ১৬ দিন লাগিল। এই বমির কথা রোগীর বরাবরি মনে ছিল। এ বারে ফিরে রক্ত-আমাশা হইতেই মেম সাহেবকে তাঁর ভয়ের কথা বলিলেন, আর সাহেব ডাক্তর আনিতে একবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। বাঙালি ডাক্তরদের মধ্যে আমিই নিকটে ছিলাম। এই জন্যে, তাঁরা আমাকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইতেই সাহেব মেম দুজনেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন " ইপেকাকুয়ানা না দিয়া আপনি নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিতে পারেন কি না ?" পারি না, এমন নয় ?

তবে নূতন রক্ত-আমাশার অস্যুদই ইপেকাকুয়ানা। কিন্তু যেখানে রোগী ইপেকা খাইয়া কোন ক্রমেই তা পেটে রাখিতে পারে না, সেখানে অন্য অসুদ ব্যবস্থা না করিলে যে তার জীবন রক্ষা হওয়াই ভার। আমার এই কথায় তাঁরা বড়ই তুষ্ট হইলেন; আর আমাকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। তার পর আমি তাঁর নাড়ী, জিব, গায়ের তাত আর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। কাশ রোগের চিকিৎ-সায় রোগীর বুক পরীক্ষা না করিলে রোগের যেমন কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষা না করিলে রক্ত-আমাশা রোগের তেমনি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রক্ত-আমাশা রোগীর অন্ত্রের কি দশা ঘটিয়াছে, খুব সাবধানে আর তন্ন তন্ন করিয়া মল পরীক্ষা না করিলে তা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রক্ত-আমাশা রোগীর মল কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, এর পরই তা বলিব। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগীর মলের গন্ধ যাঁর নাকে একবার গিয়াছে, তাঁর আর কখনও ভুল হয় না। তার পর, সব পরীক্ষা করা হইলে যে সব অসুদ ব্যবস্থা করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়াদিলাম।

(১) বিস্‌মথ্‌ ... ... ১৫ গ্রেন্‌

পল্‌ব, ক্রীটি কো কম্‌ ওপিও .. ১৫ গ্রেন
একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। প্রতিবার বাহ্যের পর এই পুরিয়া এক একটী করিয়া খাইতে বলিলাম।

(২) স্যালিসীন্ ... ... ১ ড্রাম
এতে ছয়টী পুরিয়া তয়ের কর।

রোজ সকালে একটী করিয়া পুরিয়া খাইতে বলিলাম।

অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন, তেমন উপায় আর নাই। স্যালিসীন শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে। এ কথা এর আগেই (৫৫৪র পাতে) বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগীকে স্যালিসীন দিতে কখনও ভুলিও না।

(৩) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) ... ৪ ড্রাম
মিউসিলেজ (গঁদ ভিজের জল) ... ৪ ঔন্স পুরাইয়া
একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের আটটা দাগ কাটিয়া দাও। পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে এই আরক এক এক দাগ গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিলাম। রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়;

কাযেই, বারে বারে বাহ্যে যাইতে হয় বলিয়া নিদ্রার খুবই ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যে, রাত্রি আট্টার সময় একবার, আর দিনের বেলায় যখন দরকার হবে, তখন একবার ঐ আরক পিচকিরি করিয়া দিতে বলিলাম। যদি বল, ও আরক পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার আবার দরকার কি? আর সে দরকার বুঝিবই বা কেমন করিয়া? পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে যখন ঐ আরক পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিছি, তখন ওর দরকার বুঝাইয়া বলিবার জন্যে কি আর বেশী বলিতে হইবে?

এই সব অসুদ ব্যবস্থা করিয়া তার পর পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম। রক্ত-আমাশা রোগীর পথ্যের কথা এর আগেই বলিছি। চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোনও আহার রক্ত-আমাশা রোগীকে দিবে না—পথ্যের এ নিয়মটী পালন না করিলে, রক্ত-আমাশা রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসক কখনও যশ পাইবেন না।

এই সব অসুদ খাইয়া, আর পথ্যের ধরাধর করিয়া সাহেব দু দিনেই চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, বারে বার বাহ্যে যাওয়া—রক্ত-আমাশার এ সব লক্ষণই সারিয়া

গেল। দু তিন দিন অস্দ খাইয়া রক্ত-আমাশা সারে, সাহেবের এ বিশ্বাসই ছিল না। এই জন্যে, সাহেব যেমন খুসী হইলেন, তেমনি আশ্চর্য্যও হই-লেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, চিবাইয়া খাই-বার মত আহার কবে পাইব? যত দিন সহজ বাহ্যে না হবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত আহার পাইবেন না। স্যালিসীনের পুরিয়া আপনাকে আরও আট দশ দিন খাইতে হবে। এই বলিয়া বিদায় হইলাম।

তবেই, যদি ধর ত নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা খুবই সহজ। এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার কথা বলি।

(২) পুরাণ রক্ত-আমাশা———পুরাণ রক্ত-আমাশার চেয়ে দুঃসাধ্য খল রোগ আর নাই— এর আগেই বলেছি, রক্ত-আমাশা পুরাণ পড়িয়া গেলে আর সারিতে চায় না। রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে দুর্দ্দশা ঘটে, তা যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তবে পুরাণ রক্ত-আমাশা কেন সারিতে চায় না, বেশ বুঝিতে পারিবে। প্রথম ধর, ঘা হইয়া বড় অন্ত্রের খোল কমিয়া যায়। তার পর ধর, রোগী যা আহার করে, তা যদি একবারে বেশ পরিপাক হইয়া না যায়, তবে সেই অজীর্ণ জিনিশ ঘায়ের

উপর দিয়া নিয়ত গিয়া ঘা গুলিকে শুকাইতে দেয় না। কাজেই, ঘা না শুকাইতে পাইলে, রক্ত-আমাশা রোগই বা কেমন করিয়া সারিবে? তাতেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগ নির্দ্দোষ সারিয়া না গেলে, চিবাইয়া খাইবার মত আহার রোগীকে কখনও দিবে না। মল সহজ হওয়াই রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ নির্দ্দোষ হইয়া সারার চিহ্ন। রক্ত-আমাশা রোগীর পথ্যের ব্যবস্থার বেলায় চিকিৎসকের বিবেচনার খুব দরকার। য়্যারারুট, চুনের জল-মিশন এক-বল্কা দুধ, আর মাংসের ক্বাথ রক্ত-আমাশা রোগীর পথ্য জানিবে। অসুদ বিসুদ খাইয়া, পথ্যের ধরাধর করিয়া, রক্ত-আমাশা অনেক ভাল হইল। চিবাইয়া খাইবার মত আহার অনেক দিন পাই নাই, আজ্ আমাকে দুটি ভাত দিন্ বলিয়া রোগী চিকিৎসকের নিকট আব্দার করিতে লাগিল। চিকিৎসক তার আব্দারে ভুলিয়া মাছের ঝোল ভাত খাইতে হুকুম দিলেন। রোগী আনন্দে মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইল। ভাত খাইল, মাছের ঝোল খাইল, মাছ খাইল, মাছের ঝোলের দু পাঁচ খান তরকারিও খাইল। বেলা ১০টার সময় এই রকম করিয়া আহারাদি করিল। দিনমানে সুপথ্য কুপথ্যের

ফলাফল বড় একটা জানিতে পারিল না। সন্ধ্যার পর পেটের কামড়ে রোগী অস্থির হইল। পেটের কামড়, বারে বারে আম রক্ত বাহ্যে, আর বাহ্যে বসে কোঁতানি—এই সব দেখিয়া বাড়ীর দুই এক জন সেই রাত্রেই চিকিৎসকের কাছে ছুটিলেন। আমি এ রাত্রে যাইতে পারিব না, যাইবার দরকারও নাই। আপনারা রোগীর মল ফেলিয়া দিবেন না। আমি কাল্ সকালে গিয়া তার আজ্ রাত্রের সব মল পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এই বলিয়া চিকিৎসক তাদের বিদায় করিয়া দিলেন। তার পর দিন বেলা ৬টা না বাজিতেই, রোগীর বাড়ীতে চিকিৎসক গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, বাড়ীর চাকর-দের পর্য্যন্ত মুখ ভার। অন্য দিন চিকিৎসকের আদর অপেক্ষার সীমা থাকে না; আজ্ আদরও নাই, সম্ভা-ষণও নাই! অন্য দিন তাঁকে আসিতে দেখিয়া বাড়ীর কর্ত্তা পর্য্যন্ত উঠিয়া দাঁড়াইতেন, আজ্ চাকরটাও তাঁর অভ্যর্থনা করিল না! চিকিৎসক অপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগী আজ্ কেমন আছ? "দেখুন, দেখিলে সব জানিতে পাবিবেন"—চারি দিক্ থেকে সকলেই এই কথা বলিয়া উঠিলেন। আগে মল পরীক্ষা করিয়া দেখি, তার পর রোগীকে দেখিব। এই বলিয়া তিনি মল পরীক্ষা করিতে

গেলেন। মল পরীক্ষার পর খানিক ক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে কাছে ডাকিলেন। চিবাইয়া খাইবার জিনিষ রক্ত-আমাশা রোগীকে খাইতে দিলে কেমন তা পরিপাক হয়, কর্ত্তাকে তা হাতে হাতে দেখাইয়া দিলেন। আলু, পটোল, বেগুণ, ভাত, রোগী যা যা খাইয়াছিল, প্রায় সবই বজ্‌নিশ নামিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া কর্ত্তা একবারে অবাক্ হইয়া থাকিলেন। চিকিৎসক তখন সময় পাইয়া বলিলেন, এই জন্যেই রোগীর পথ্য লইয়া আমি আপনাদের সঙ্গে রোজ ঝগড়া ও মারামারি করিয়া থাকি। বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, বা প্রতিজ্ঞার একটু ত্রুটি হইলে চিকিৎসকের আর রক্ষা নাই। সেই একটু ত্রুটিতেই তাঁর মান সম্ভ্রম সবই যায়! রোগীর মল যত দিন না সহজ হবে, তত দিন তাকে চিবাইয়া খাইবার মত জিনিশ কোন মতেই দিবে না—আপনাদের উপরোধ অনুরোধে কাল্ যদি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিতাম, তবে আমাকে আজ্ আপনাদের নিকট এ রকম অপদস্থ আর অপ্রতিভ হইতে হইত না। এখন জানিলাম, চিকিৎসকের যশ, মান খাটো হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না৷ রোগীর আবদার শুনিয়া, কি রোগীর বাড়ীর লোকের অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া, রোগীকে কুপথ্য

দিলে, সে কুপথ্যের ফলাফলের জন্যে চিকিৎসককে তারা অপ্রতিভ করিতে ছাড়ে না—এ কথাটা সব চিকিৎসকেরই যেন মনে থাকে।

তার পর বলি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি ক্ষয় পাইয়া যায়—পাতলা হইয়া যায়। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির এ রকম দুর্দ্দশা সচরাচরই ঘটে। আবার অনেক জায়গায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা গুলি আধ-সারা ভাবেই থাকিয়া যায়। এ রকম আধ-সারা ঘা অনেক জায়গায় শেষে বেশ সারিয়া যায়। সারিয়া গেলে রোগীর ব্যামোও নির্দ্দোষ সারিয়া যায়। কিন্তু এ রকম ঘটা বড় ভাগ্যের কথা। যাদের ভাগ্যে এ রকম না ঘটে, তাদের শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়। তাদের গা শুষ্ক খস্‌খসে, আর আঁইস্‌-ওঠা-ওঠার মত হয়। তারা এক দিন বা ভাল থাকে,এক দিন বা ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়। জিব খুব রাঙা, আর চকচকে যেন বার্ণিশ-করার মত হয়। তাদের মল পাতলা পূয আর রক্ত মিশন, আর তাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ। মলের দুর্গন্ধে তার ত্রিসীমানায় কেউ তিষ্ঠিতে পারে না। আবার এ দিকে, পেটের কামড় আর গুহ্যদ্বারের শূলনিতে রোগী এত কাতর আর অবসন্ন হইয়া পড়ে যে,

সে নিজের যন্ত্রণা শান্তির জন্যে নিয়ত মৃত্যু কামনা করে।

তার পর এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——পুরাণ রক্ত-আমাশায় অনেকে অনেক রকম ধারক অস্থদ দিয়া থাকেন। ধারক অস্থদের মধ্যে ধাতু-ঘটিত ধারকই পুরাণ রক্ত-আমাশার পক্ষে ভাল। আবার ধাতু-ঘটিত অস্থদের মধ্যে তুতে পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন অস্থদ, তেমন আর কোনটীই নয়। যে সব অস্থদে ধাতু আছে, সে সব অস্থদকে ধাতু-ঘটিত অস্থদ বলে। তুতেতে তামা আছে বলিয়া তুতেকে ধাতু-ঘটিত অস্থদ বলিতেছি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় আমি যে যে অস্থদ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১)। তুতে (সল্‌ফেট্ অব্ কপর্)	... ...	$\frac{1}{2}$ গ্রেন
ডোবর্স পাউডর (পল্‌ব ইপেকা কো)	...	৫ গ্রেন
পল্‌ব ম্যাকেশিয়া (বাব্‌লার আটার গুঁড়ো)		৫ গ্রেন

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোগীকে রোজ তিন বেলা তিনটী পুরিয়া খাইতে দিবে। রোগটী

যত দিন নির্দ্দোষ হইয়া না সারিবে, তত দিন এই অস্থদ নিয়ম করিয়া খাইতে বলিবে। এই পুরিয়া অস্থদে আমি অনেক পুরাণ রক্ত-আমাশা ভাল করিছি। ফল কথা, পুরাণ রক্ত-আমাশার এর চেয়ে ভাল অস্থদ আমি আর জানি না।

(২)। স্যালিসীন্ ... ... ১ ড্রাম

এতে ১২টী পুরিয়া তয়ের কর।

রোগীকে রোজ সকালে একটী, আর সন্ধ্যার আগে একটী এই পুরিয়া খাইতে দিবে। এর আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক না—পেট-নাবাই হোক, শুদু আমাশাই হোক, আর রক্ত-আমাশাই হোক, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিউকস্ মেম্ব্রেণের) সহজ অবস্থার তফাৎ না হইলে, এ সব রোগের স্থষ্টিই হইতে পারে না। আবার, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন্, তেমন উপায় আর নাই। এই জন্যে, পেটের-ব্যামোতে রোগীকে স্যালিসীন দিতে কখনও ভুলিও না। ৫৫২র থেকে ৫৫৪র পাত আর একবার ভাল করিয়া পড়।

(৩) পেটের কামড়, শূলনী, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে

রোজ রাত্রি ৮টার সময় রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে লডেনমের (আফিঙের আরকের) পিচ্‌কিরি দিবে। লডেনমের পিচ্‌কিরি কেমন করিয়া দিতে হয়, ১১৬ আর ৬৪৭র পাতে তা বেশ করিয়া লিখিয়া দিইছি। রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়; এই জন্যে, কেবল রাত্রেই লডেনমের পিচ্‌কিরি দিতে বলিলাম। কিন্তু দিনের বেলায়ও যদি ব্যামোর বাড়াবাড়ি দেখ, তবে লডেনমের পিচ্‌কিরি দিতে ভুলিও না।

(৪) রোজ সকালে ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি করিয়া রোগীর অন্ত্র ধুইয়া দিবে। ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি করিয়া রোগীর অন্ত্র ধুইয়া দিলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বাড়ে। এ ছাড়া, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির অপরিষ্কার পচা ঘা গুলি পিচ্‌কিরির জলে বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। কাজেই, ঘা গুলি শীঘ্র শুকাইয়াও যায়। ঘা শুকাইয়া গেলে, রক্ত-আমাশাও নির্দ্দোষ সারিয়া যায়। তবেই দেখ, শুদু এক ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরিতেই কত উপকার! তাতেই বলিতেছি, পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি দিতে কখনও ভুলিও না। কত খানি ঠাণ্ডা জল কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি দিতে হয়, ৫৮০ থেকে ৫৮২র পাতে তা বলিছি।

৫৭৯র পাতে বলিছি, পেটের-ব্যামো পুরাণ-হইলে, তা পেট-নাবাই হোক, শুদ্ধু আমাশাই হোক, আর রক্ত-আমাশাই হোক, তাকে বৈদ্যরা গ্রহণী বলেন। সচরাচর লোকে তাকে গিরিণি বলে। ৫৭৯ থেকে ৫৮৮র পাতে গিরিণি রোগের কথা বলিছি। এই জন্যে, পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা পড়িবার সময় সেই পাত গুলি আর একবার ভাল করিয়া পড়িবে।

অনেক জায়গায় পুরাণ রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যথার্থই ভয় পাইতে হয়। মলের সঙ্গে আম, রক্ত, আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘায়ের পচানী এত বাহির হয় যে, তা ঠাউরে দেখিলে রোগী বাঁচিবে বলিয়া আর আশা থাকে না। ঘায়ের এই পচানীকে ডাক্তারেরা স্লফ্ বলেন। যে রক্ত-আমাশায় মলের সঙ্গে এই রকম পচানী (স্লফ্) বাহির হয়, সে রক্ত-আমাশাকে ডাক্তা-রেরা স্লফিং ডিসেণ্টরি বলেন। স্লফিং ডিসেণ্টরিকে সোজা বাঙ্গালায় পচা রক্ত-আমাশা বলিতে পার।

পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যে ভয় হয় বলিলাম, ভাবিয়া দেখ ত, সে রকম ভয় হইবারই কথা বটে। কেন না, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘায়ের ও রকম পচানী রোজ রোজ

অত বাহির হইতে থাকিলে, ঘায়ের জায়গায় অন্ত্র ফুটো হইয়া যাইতে কত দিন লাগে। অন্ত্র কত টুকুই বা পুরু। ঘা গভীর হইয়া তা ফুটে যাইতেই বা কতক্ষণ লাগে? অন্ত্র ফুটো বা ছাঁদা হইয়া গেলে, রোগীর যে বিপদ্ ঘটে, ৬১৮র পাতে তা বলিছি। তাতেই পচা রক্ত-আমাশাকে চিকিৎসকেরা এত ভয় করিয়া থাকেন। আর তাতেই বলিতেছি, পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। পচা রক্ত-আমাশায় শুদু ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি না করিয়া, তার বদলে বাবলার ছালের পাচনের সঙ্গে ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া, সেই পাচনের পিচ্‌কিরি দিবে। সচরাচর রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে। এই জন্যে, রোজ রাত্রি ৮টার সময় ফট্‌কিরির গুঁড়ো-মিশন বাবলার ছালের এই পাচন রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। কত টুকু পাচনে কত টুকু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিতে হয়, ৫৮৫র পাতে তা বলিছি। বাবলার ছালের তিন পোওয়া পাচনে (ডিকক্‌শনে) ৪ ড্রাম (এক কাঁচ্চা) ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিবে। ১৫২র পাতে নিমের ছালের পাচন যেমন করিয়া তয়ের করিতে হয় বলিছি, বাবলার ছালের পাচনও ঠিক্ তেমনি করিয়া তয়ের করিবে।

৬৪০র পাতে বলিছি রক্ত-আমাশা রোগীর পেটের কামড় নিবারণের যেমন অস্তুদ তার্পিণের সেক, তেমন অস্তুদ আর নাই। পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসারও বেলায় যেন এ কথাটা মনে থাকে। প্লুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে বলিছি, এখানেও সেই রকম করিয়া সেক দিবে। ৫১০—৫১১র পাত দেখ।

নূতন রক্ত-আমাশায় পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশায়ও পথ্যের ঠিক্ সেই রকম ধরাধর করা চাই। নৈলে চিকিৎসক কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

তার পর এখন রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষার কথা বলি।

মল পরীক্ষা—এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগে রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখা যেমন দরকার, তেমন আর কোন রোগেই নয়। রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিতেছ, কিন্তু রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখ না। এতে তোমাকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে বৈ আর কি? অন্ত্রের ভিতর ঘায়ের অবস্থা কি রকম হইতেছে, রোগীকে যে অস্তুদ দিতেছ, তাতে তার উপকার হইতেছে কি না—এ সব যদি ঠিক্ করিয়া জানিতে চাও,

তবে রোজ তার মল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোজ সকালে তার আগের দিন রাতের সব মল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোগী যদি ফি বারে আলাদা আলাদা জায়গায়,বা আলাদা আলাদা পাত্রে বাহ্যে করে, তবে তার মল পরীক্ষা করার বড়ই অসুবিধা ঘটে—এমন কি, ভাল রকম পরীক্ষা হয় না বলিলেই হয়। এই জন্যে, জায়গায় জায়গায় বাহ্যে না গিয়া, ছোট একটা গামলায় বাহ্যে যাবে। গামলার দু পাশে ইট দিয়া বসিবার বেশ যুত বরাত করিয়া লইবে। গামলায় কেবল বাহ্যেই যাবে। তাতে প্রস্রাবও করিবে না, জল-শৌচের জলও ফেলিবে না। রোজ সকালে গিয়া সেই গামলাটী বাইরের আলোতে আনিতে বলিবে। তার পর ঐ গামলায় জল ঢালিতে বলিবে। খানিক পরে আর একটা গামলায় ঐ জল এমন জুত বরাত করিয়া ঢালিতে বলিবে যে,গামলার তলানী যেন ঘুলাইয়া না উঠে। উপ্‌রো উপ্‌রি তিন চারি বার এই রকম করিয়া জল ঢালা উপ্‌রো করিলে, জলের সঙ্গে গামলার মল সব আলাদা পাত্রে গিয়া পড়িবে। শেষে গাম্‌লার তলায় আম,রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির টুক্‌রো, আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘায়ের পচানি (স্লফ্‌) বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। এই গুলি

যদি আরও ভাল করিয়া দেখিতে চাও, তবে একটা সমান জায়গায় কলার পাত উল্‌টো করিয়া পাতিয়া, তাতে ঐ গুলি ঢালিয়া দিবে। তার পর, একটা কাটি দিয়া ঐ গুলি এক এক করিয়া বিছাইয়া দেখিবে। চীনের শাদা বাসনেই এ রকম পরীক্ষা সব চেয়ে ভাল হয়। চীনের বাসন যাঁরা মিলাইতে না পারিবেন, তাঁরা কলার পাতের উল্‌টো পিঠে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই রকম পরীক্ষায় গাম্‌লার তলায় আম, রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির টুক্‌রো, আর ঘায়ের পচানি (স্লফ্‌) যত বেশী দেখিতে পাবে, অন্ত্রের ভিতরকার অবস্থা তত খারাপ ঠিক্‌ করিবে। আবার, অসুদ বিসুদ খাইয়া আর পথ্যের ধরাধর করিয়া, রোগীর রোগ যেমন কমিতে থাকিবে, পরীক্ষায় গামলার তলায় ও সব জিনিষও তেমনি কম দেখিতে পাবে। তবেই দেখ, এই রকম করিয়া শুদু মল পরীক্ষা করিয়াই রক্ত-আমাশা রোগীর রোগের অবস্থা বেশ ঠিক্‌ করিতে পার। কেমন আছ, বা রোগী কেমন আছে বলিয়া, তোমার রোগীকেও জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না, তার আত্মীয় স্বজনকেও জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না। রোগীর মল যত দিন না সহজ হবে, রোজ সকালে গিয়া তার মল এই রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

মল পরীক্ষা করিলে রক্ত-আমাশা রোগীর যে কেবল রোগেরই অবস্থা ঠিক্ জানিতে পারা যায়, তা নয়; রোগী কুপথ্য করিলেও মল পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। এখানে আমার একটী রোগীর কথা বলি। ১২।১৩ বছর হইল, আমি একটী সাহেবের পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিছিলাম। অসুদ বিসুদ খাইয়া, আর পথ্যের ধরাধর করিয়া তার ব্যামো অনেক সারিয়া যায়। তার পর হঠাৎ এক দিন তার ব্যামো বাড়ে। ব্যামো এমন সারিয়া হঠাৎ কেন আবার বাড়িল? সাহেব অবশ্যই তুমি কোন কুপথ্য করিয়াছ। আমার এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, আমি কোনও কুপথ্য করি নাই। বারে বারেই তিনি এই কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে মল পরীক্ষায় সব প্রকাশ হইয়া পড়িল। মল পরীক্ষায় দেখা গেল, গামলার তলায় আমের সঙ্গে কতক গুলি আস্ত চাইল রহিয়াছে। ঘরের ভিতর গিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল্ তুমি কাঁচা চাইল খাইয়াছিলে? সাহেব বলিলেন, না, আমি চাইল খাই নাই। তবে তোমার মলের সঙ্গে চাইল কোথা থেকে আসিল? এই কথায় সাহেব নিরুত্তর হইয়া খানিক পরে বলিলেন, হাঁ, কাল্ গোটা কতক

চাল খাইয়াছিলাম বটে। মল পরীক্ষায় যে কুপথ্য পর্য্যন্ত ধরা পড়ে, সাহেব তা জানিতেন না। এই জন্যেই, প্রথমে মিছে কথা বলিয়াছিলেন। সাহেবের ব্যামো হঠাৎ বাড়ার কারণ এই রকম ঠিক্ ঠাক ধরিয়া দিলাম বলিয়া, তিনি আমাকে আর অপ্রতিভ করিতে পারিলেন না। কোন রোগের চিকিৎসা করিতেছ, রোগী তোমার সব নিয়মই পালন করিতেছে, অসুদ বিসুদও বেশ নিয়ম করিয়া খাইতেছে। ব্যামো অনেক ভাল হইয়া হঠাৎ এক দিন বাড়িল। রোগীর আত্মীয় স্বজন তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিল। ব্যামো এ রকম হঠাৎ বাড়ার কারণ যদি তুমি তাদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে না পার, তবে তুমি দাঁড়াইয়া অপ্রতিভ হবে। সে রোগী তোমার হাতে ভাল হইবে না বলিয়া তাদের বিশ্বাস জন্মিবে। এ রকম বিশ্বাসের ফল কি ? ফল সোজা নয়। এ রকম বিশ্বাসে পশার যাইবার কথা ! তাতেই বলিতেছি, রোগের কেবল অসুদটী শিখিয়া রাখিলেই চলিবে না। কি অত্যাচার করিলে কোন্ রোগ বাড়ে, চিকিৎসকের সেটীও বেশ করিয়া জানিয়া রাখা চাই।

এর আগেই বলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন অসুদ তুঁতে, তেমন অসুদ আর নাই। কিন্তু কোন

কোন জায়গায় ভুতে-ঘটিত অসুদ খাইয়া রোগী তা কিছুতেই পেটে রাখিতে পারে না। এ রকম রোগী পাইলে কি করিবে? কি অসুদ দিয়া তার পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিবে? ভুতে ছাড়া পুরাণ রক্ত-আমাশার আর কোন অসুদ যদি সত্য-সত্যই না থাকিত, তবে ও রকম রোগী লইয়া যথার্থই মস্কিলে পড়িতে হইত। পুরাণ রক্ত-আমাশার আর একটী ভাল অসুদ আছে। যে রোগী ভুতে-ঘটিত অসুদ খাইয়া পেটে রাখিতে না পারিবে, তাকে সেই অসুদটী দিবে। সে অসুদটী আর কি? মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়া। এখানে আমার আর একটী রোগীর কথা বলি।

প্রায় দশ বছর হইল, একটী পোয়াতির পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। পুরাণ রক্ত-আমাশার রোগীকে আমি এক এক বারে আধ ($\frac{1}{2}$) গ্রেন করিয়া তুতে দিয়া থাকি—জায়গা বিশেষে সিকি ($\frac{1}{4}$) গ্রেন করিয়াও দিই। কিন্তু এ পোয়াতিটী এক গ্রেনের বার ভাগের এক ভাগও ($\frac{1}{12}$) তুতে খাইয়া পেটে রাখিতে পারিত না। পুরিয়াতে তুতে আছে, অসুদের তারেই পোয়াতি তা বুঝিতে পারিত। পুঁরিয়া খাইলে অসুদের তার (আস্বাদন) বেশী টের পাওয়া যায় বলিয়া, তুতে-ঘটিত অসুদের বড়ি

করিয়া খাইতে দিতাম; সে বড়িও পেটে রাখিতে পারিত না। এ বারে যে বড়ি দিতেছি, এতে তুতে নাই; এ বড়ি খাইলে কথনও অ্যাকার হবে না। এ রকম করিয়া ফাঁকি দিয়াও দেখিছি, তবু সে বড়ি পেটে রাখিতে পারে নাই। বড়ি খাইয়া দশ মিনিট্‌ও পেটে রাখিতে পারিত না; তুলিয়া ফেলিত। শেষে তাকে মর্ফিয়া দেওয়াই স্থির করিলাম। মর্ফিয়ার সঙ্গে আর যে যে অস্থদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলামঃ—

মিয়ুরিয়েট্‌ অব্‌ মর্ফিয়া	...	...	১ গ্রেন্‌
স্যালিসীন্‌	...	...	১৮ গ্রেন্‌
পেপ্‌সীন্‌	...	...	১৮ গ্রেন্‌
বাইকার্ব্বনেট্‌ অব্‌ সোডা	...	...	১৮ গ্রেন্‌
একষ্ট্রাক্‌ট জেন্‌শন্‌	...	...	যত টুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া এতে ছয়টী বড়ি তয়ের কর।

এক একটী বড়িতে কোন্‌ অস্থদ কত করিয়া থাকিবে, হিসাব করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। এই বড়ি রোজ সকালে একটী, আর সন্ধ্যার সময় একটী খাইতে দিতাম। এই বড়ি খাইয়া পোয়াতির অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল। মাস খানেকের মধ্যেই তার ব্যামো নির্দ্দোষ সারিয়া গেল।

পোয়াতি যখন মর্ফিয়ার বড়ি খাইতে আরম্ভ করে, তখন তার আট মাস গর্ভ। এই বড়ির উপর তার এতই ভক্তি জন্মিছিল যে, প্রসবের পরও এক মাস পর্য্যন্ত সে নিয়ম করিয়া বড়ি খাইয়াছিল। যে পুরাণ রক্ত-আমাশা সারিবে না বলিয়া আমাদের দেশের ভাল ভাল বৈদ্যরাও জবাব দিইছিলেন, মর্ফিয়ার এই বড়িতে আমি সে পুরাণ রক্ত-আমাশাও ভাল করিছি।

বছর তিন চারি হইল, কলিকাতার বটতলায় একটী রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। রোগীর বয়স ৩০ | ৩২ বছরের বেশী নয়। ২২ | ২৩ বছর বয়স থেকে অপাক অজীর্ণ রোগে বিস্তর কষ্ট পায়। শেষে তার রক্ত-আমাশা হয়। প্রথমে ডাক্তারি চিকিৎসা করায়। ডাক্তারি চিকিৎসায় বিশেষ ফল না পাইয়া বৈদ্যকে দিয়া দেখায়। বৈদ্যের চিকিৎসায়ও তেমন ফল পাইল না। আবার ডাক্তারকে ডাকিল। বারে বারে এই রকম করিয়া চিকিৎসকের হাত বদলাইতে বদলাইতে তার ব্যামোটী বেশ পুরাণ পড়িয়া গেল। রক্ত-আমাশা পুরাণ পড়িয়া গেলে সারিতে চায় না, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। আমাদের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোয়ানের বিশ্বাস, পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তারি

চিকিৎসা কিছু নয়। এই জন্যে, বৈদ্যকেই দিয়া দেখান সকলের মত হইল। এক এক করিয়া কলিকাতার বড় বড় বৈদ্য, সকলেই তাকে এক এক বার দেখিলেন। এ রক্ত-আমাশা শিবের অসাধ্য বলিয়া তাঁরা সকলেই জবাব দিয়া গেলেন। রোগীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমার বেশ জানা শুনা ছিল। রোগী যখন অপাক অজীর্ণ রোগে বড় কষ্ট পায়, তখন আমাকে এক বার দেখাইয়াছিল। এখন ভাল রকম চিকিৎসা না করাইলে,আর পথ্যের খুব ধরাধর না করিলে, শেষে তোমার এই রোগ থেকেই প্রমাদ ঘটিবে—আমার এই কথাগুলি তার আত্মীয় স্বজনের বরাবরই মনে ছিল। এই জন্যেই বোধ করি তারা সব শেষে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

আমি গিয়া দেখিলাম, রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি নাই। শির-দাঁড়ার হাড়, ঘাড় থেকে গুহ্য-দ্বার পর্য্যন্ত, এক এক খানি করিয়া গণিয়া লওয়া যায়। শরীরে মেধ মাংসের লেশ নাই বলিলেও বাড়াইয়া বলা হয় না। হাড় ক-খানি কেবল চামড়া দিয়া ঢাকা। পেটটী যেন একবারে সারি-ন্দের খোল। ঠোঁট, জিব, আর মাড়ি রাঙা আর চক্‌চকে, যেন বার্ণিশ-করা। ঠোঁট, জিব, আর

মাড়ির এ রকম অবস্থা অস্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ভারি রকম উদ্দীপনার চিহ্ন। উদ্দীপনাকে ডাক্তরেরা ইরিটেশন্ বলেন। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, ৫৪৬র পাতে তা বলিছি। বেগ দিয়া আর বারে বারে বাহ্যে গিয়া গুহ্যদ্বার ফাঁক আর অসাড়। যখন যা খায়, তখনই তা রজ্‌নিশ্ নামিয়া পড়ে। মলের রং এক সময় এক রকম নয়—কখন শাদা, কখন রাঙা, কখন কাল, কখন শব্‌জে, কখন ছেয়ে, কখন মেটে, কখন পাট্‌কিলে। পেটের কামড়, শূলনি, আর আমাশার বেগের জন্যে দিনেও ঘুম নাই, রাত্রেও ঘুম নাই। রোগীর এই বিষম দশা দেখিয়া, আর বিষম দশার কথা শুনিয়া, অষুদ বিষুদে কিছু করিতে পারিব বলিয়া আমার আর বড় একটা ভরসা থাকিল না। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাকে যে সব অষুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) মর্ফিয়ার ঐ বড়ি।

সকালে আর সন্ধ্যায় দু বেলায় দুটো।

(২) বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করি ...	...	১ গ্রেন্
পরিষ্কার জল ...	...	... ১২½ ঔন্স

এ একত্র মিশাইয়া বড় একটা শিশিতে কি শাদা বোতলে রাখ।

এই অসুদ ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক ড্রাম করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

(৩) টিংচার ওপিয়াই (লডেনম্)	...	৪ ড্রাম
মিউসিলেজ (গঁদ ভিজের জল)	...	৪ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ৩ ঘণ্টা অন্তর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্কিরি করিয়া দিতে বলিলাম। গুহ্যদ্বার ফাঁক আর অসাড় বলিয়া, পিচ্কিরি দেওয়ার পর ন্যাকড়ার পুঁটুলি দিয়া গুহ্যদ্বার আধ ঘণ্টা খানেক চাপিয়া রাখিতে বলিলাম।

পথ্য—শুদ্ধু একটু মাংসের-কাথ ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিতে বলিলাম।

সকালে অসুদ আর পথ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিয়া আমি বিদায় হইলাম। তার পর দিন সকালে গিয়া রোগীর হাল জিজ্ঞাসা করিলাম। পেটের কামড়, শূলনি, আর বেগের জন্যে যে রোগী দু-মাস চকের পাতা বোজে নাই, আপনার সেই বড়ি খাইয়া আর পিচ্কিরি লইয়া রোগী কাল্ দিনেও যেমন ঘুমিয়েছে, রাত্রেও তেমনি ঘুমিয়েছে—যাতনার ভাগ কাল্ তার খুবই কম গিয়াছে—এই সব কথা বলিয়া তার আত্মীয় স্বজনেরা আমার আশা ভরসা যে কতই বাড়াইয়া দিল, তা বলিতে পারি

না। এই রকম নিয়ম করিয়া অসুদ বিসুদ খাইয়া আর পথ্যের ধরাধর করিয়া রোগীর অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। যে রোগীকে ধরিয়া বাঁধিয়া দিনান্তে এক ছটাক দুধ খাওয়ান যাইত না—খিদে কাকে বলে, যে রোগী জানিত না—যে রোগী যখন যা খাইত, বজ্‌নিশ্‌ তা নামিয়া পড়িত—শুদু একটু মাংসের-কাথে আমার আর খিদে ভাঙে না বলিয়া, আর কিছু আহার পাইবার জন্যে সেই রোগী জেদ্‌ করিতে লাগিল। মাংসের কাথ ছাড়া চুনের জলের সঙ্গে মিশাইয়া তাকে একটু একটু দুধও দিতে বলিলাম। মাংসের কাথ আর দুধ সে বেশ পরিপাক করিতে লাগিল। যে রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, ১৫ দিন না যাইতেই, ধরিয়া বসাইয়া দিলে বালিশ ঠেশ দিয়া সে রোগী বসিতে পারিল। দিন দিন তার খিদে এতই বাড়িতে লাগিল যে, মাংসের কাথ আর দুধ দিয়া তাকে আর কিছুতেই রাখিতে পারা গেল না। মল সহজ হইলে ভাত দিবার কথা ছিল। ২১ দিন না যাইতেই মল সহজ হইল। এই জন্যে, ২২ দিনের দিন জেদ্‌ করিয়া এক ছটাক চাইলের ভাত খাইল। এক ছটাক চাইলের ভাত খাইয়া বেশ হজম করিতে পারিল দেখিয়া, রোজ দু তোলা করিয়া চাইল বাড়াইয়া দিতে

বলিলাম। ২০ তোলার (এক পোওয়ার) বেশী চাইলের ভাত দেওয়া হবে না। শেষে সে এই বিশ তোলা চাইলের ভাত এমনি করিয়া খাইত যে, পাতে একটীও থাকিত না। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ, অস্থদ আর সুপথ্যের কি শক্তি! যে রোগীকে হঠাৎ দেখিলে জ্যেয়স্ত বলিয়া বোধ হইত না—যে রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না—পেটের কামড়, শূলনি আর রোগের জন্যে যে রোগী দু মাস চকের পাতা বোজে নাই—যে রোগীর পরিপাক করিবার শক্তি এক বারে গিইছল, যখন যা খাইত, তা বজ্‌নিশ্ নামিয়া পড়িত—বেশী নয়, দু মাসের মধ্যেই সেই রোগী ২০ তোলা চাইলের ভাত হজম করিতে পারিল! অস্থদ আর সুপথ্যের শক্তির পরিচয় এর বাড়া আর কি হইতে পারে!

এই রোগিটীর চিকিৎসার কথা বলিতে (২)র দাগে যে অস্থদটী লিখিয়া দিইছি, সে অস্থদটী একটু আন্‌কা রকম বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই জন্যে, সে অস্থদটীর কথা একটু বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলাম। যে পুরাণ পেটের-ব্যামোতে রোগী নানা রঙের বাহ্যে যায়, সে পুরাণ পেটের-ব্যামোর যেমন অস্থদ বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করি, তেমন অস্থদ আর নাই। অস্থদের বইতে বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করির

যে মাত্রা লেখা আছে, তার চেয়ে ঢের কম মাত্রায় না দিলে এ রকম পেটের-ব্যামো সারে না। এক গ্রেনের ১০০ ভাগের এক ভাগ ($\frac{1}{100}$) বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিলে তবে এ রকম পেটের-ব্যামোর বিশেষ উপকার হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে, (২)য় দাগের ব্যবস্থায় (প্রেস্ক্রিপ্শনে) ঘণ্টায় ঘণ্টায় $\frac{1}{100}$ গ্রেন্ বাই-ক্লোরাইড অব্ মর্করি খাওয়াইতে বলিছি।

তার পর এখন ছোট ছেলেদের রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা বলি। ছেলে, বুড়ো, জোয়ান তিনেরই রক্ত-আমাশার চিকিৎসা এক বলিলেই হয়। তবে কেবল ছোট ছেলেদেরই বেলায় এক আধটু তফাৎ আছে। এই জন্যে, ছোট একটী ছেলের রক্ত-আমাশার কথা নীচে লিখিয়া দিলাম।

৯ | ১০ বছর হইল, একটী সাহেবের ছেলের রক্ত-আমাশার* চিকিৎসা করিছিলাম। ছেলেটীর বয়স তিন বছরের বেশী নয়। দিন রাতে সে ২৫ | ৩০ বার বাহ্যে যাইত। প্রতি বারেই বাহ্যের সঙ্গে আম, রক্ত, আর রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-খিল্লির টুক্রো বাহির হইত। বারে বারে এই রকম বাহ্যে গিয়া, শিশু একবারে মরার মত হইয়া পড়িল। রক্ত না থাকায় তার শরীর ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

খিদে একবারে গেল। এমন কি, কথা কহিবার ক্ষমতাও প্রায় গেল। তাকে যা খাইতে দেওয়া যাইত, সে তাই বমি করিয়া ফেলিত। পেটের কামড়, শূলনি, আর বেগ দেওয়ার জন্যে সে দিন রাতের মধ্যে চকের পাতা বুজিতে পারিত না। ফল কথা, শিশুর বাঁচিবার আশা খুব কম রহিল। দিন রাত তার জ্বর ভোগ করিত। এক জন সিবিল সার্জ্জন (সাহেব ডাক্তার) প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত তার চিকিৎসা করেন। তিনি অনেক অসুদ বিসুদ দিইছিলেন, কিন্তু শিশুর ব্যামোর কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁর অসুদে ব্যামো দিন দিন না কমিয়া, উত্তর উত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এতে ছেলের বাপ মা বড়ই ভয় পাইয়া আর এক জন চিকিৎসককে ডাকিবার মনস্থ করিলেন। আমিই নিকটে ছিলাম বলিয়া তাঁরা আমাকেই ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম, শিশু যেন মরার মত হইয়া বিছানায় শুইয়া আছে; ঠোঁট দুটী একবারে ফ্যাকাশে; হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয় রক্তের লেশ নাই। গা গরম, সব জিবে শাদা শাদা এক রকম ঘা। এই ঘাকে ডাক্তারেরা থ্রশ্ বলেন। পেট ফাঁপা, চোক দুটী দেখিয়া বোধ হইল যেন শিশুর জীবন আর বেশী দিন থাকিবে না। এই

সব দেখিয়া তার মল পরীক্ষা করিতে গেলাম। সাহেবেরা চীনের এক রকম গামলায় বাহ্যে যায়। মল পরীক্ষায় সেই গামলার তলায় আম, রক্ত, রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির টুক্‌রো, আর ঘায়ের পচানি (স্লক্), এই গুলি দেখিলাম। শিশুকে যে সব অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) হাইড্রার্জ কম্ ক্রীটা	...	...	৪ গ্রেন্
পল্ব ক্রীটি কো	...	...	৩৬ গ্রেন্
বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা		...	১২ গ্রেন্
পল্ব্ ইপেকা	...	...	৩ গ্রেন্
পেপ্‌সিন্ ...	...	...	১২ গ্রেন্

একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া এতে ২৪টী পুরিয়া তয়ের কর।

দু ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া পুরিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

(২) স্যালিসীন ...	...	...	২৪ গ্রেন্

এতে ১২টী পুরিয়া তয়ের কর।

রোজ সকালে একটা, আর সন্ধ্যার আগে একটা এই পুরিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

(৩) শিশুর পেটে রোজ তিন চারি বার করিয়া তার্পিণের সেক দিতে বলিলাম। এক এক বারে আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেক দিবার কথা বলিয়া দিলাম।

(৪) অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করিবার

জন্যে, আর পচা ঘা গুলি ধোওয়াইয়া দিবার জন্যে, রোজ সকালে একবার, আর সন্ধ্যার আগে একবার ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি দিতে বলিলাম। এক এক বারে আধ পোওয়া ঠাণ্ডা জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার কথা বলিয়া দিলাম। জল যত পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা হবে, ততই ভাল——এ কথাও বলিয়া দিলাম।

পথ্য——মাংসের কাথ, পুরাণ পোর্ট, আর চূণের জল-মিশন এক-বল্কা দুধ। শিশুর মল যত দিন না সহজ হবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত আহার তাকে দিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

সোহাগা আর মধু একত্র মিশাইয়া জিবের ঘায়ে লাগাইতে বলিলাম।

এই রকম নিয়ম করিয়া শিশুকে অসুদ বিসুদ খাওয়াইলে, আর তার পথ্যের এই রকম ধরাধর করিলে, আট দশ দিনের মধ্যেই তার ব্যামো সারিয়া গেল। যে দিন শিশুকে দেখিয়া আসিলাম, তার পর দিন থেকেই অসুদ আর সুপথ্যের ফল জানিতে পারা গেল। দু দিনের দিন বাহ্যে বারে কমিল; আর মলে রক্তের ভাগ কম দেখা গেল। তিন দিনের দিন শিশুকে আগের চেয়ে যেন একটু চাঙ্গা আর সবল দেখিলাম।

চারি দিনের দিন মলে রক্তের ভাগ খুবই কম দেখা গেল; আর ঘায়ের পচানি (স্লফ্) মোটেই দেখিতে পাওয়া গেল না। পাঁচ দিনের দিন মলে রক্তের লেশও দেখিতে পাইলাম না। ছয় দিনের দিন শিশুর মোটেই বাহ্যে হইল না। সব রকম পেটের-ব্যামো সারিয়া গেলে প্রথম প্রথম কোষ্ঠবদ্ধ হয়। রক্ত-আমাশা সারিয়া গেলে কোষ্ঠবদ্ধ খুবই হয়। ৬১৯র পাতে এ কথা বলিছি।

খুব কম মাত্রায় হাইড্রার্জ কম্ ক্রীটা, ইপেকা আর পেপ্সিন্ ছোট ছেলেদের পেট-নাবার আর রক্ত-আমাশার যেমন অস্বুদ, তেমন অস্বুদ আর নাই। ভুতে ছাড়া পুরাণ রক্ত-আমাশার আর দুটী ভাল দেশি অস্বুদ আছে। সে দুটী অস্বুদ ধাতু-ঘটিত অস্বুদ নয়; গাছড়া অস্বুদ। সে দুটী গাছড়া অস্বুদ, বেল আর কুর্চ্চি বই আর কিছুই নয়। আগে বেলের কথা বলি, তার পর কুর্চ্চির কথা বলিব। বেল সব রকম পেটের-ব্যামোরই একটী ভাল অস্বুদ বলিয়া, আমাদের দেশে সকলেই বেলের খুব আদর করিয়া থাকেন। বেল ধারক কি সারক, হঠাৎ তা ঠিক্ করিয়া বলিবার যো নাই। যাদের কোষ্ঠবদ্ধ, বেল খাইলে তাঁদেরও যেমন উপকার হয়, পেটের-ব্যামোতে যারা ভুগিতেছে, তাদেরও তেমনি উপকার

হয়। এমন আশ্চর্য্য গুণ আর কোনও অস্থুদের আছে কি না, বলিতে পারি না। বেল যে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তা না হইলে, বেল পেটের-ব্যামোতে ধারক, আর কোষ্ঠবদ্ধে সারক কখনই হইতে পারিত না। এর আগেই বলিছি, অপাক না হইলে কোন রকম পেটের-ব্যামোই হয় না। যাদের ভাল পরিপাক হয় না, তারা যা খায়, তাতেই তাদের পেটের-ব্যামো বাড়াইয়া দেয়। তারা যদি বেল খায়, তবে সেই বেল তাদের আহারের সঙ্গে মিশিয়া অপাক হইতে দেয় না——সব বেশ পরিপাক করাইয়া দেয়। বর্ষাকালে আমাদের দেশে অনেকের কোষ্ঠবদ্ধ আর পেটের-ব্যামো উল্টে পাল্টে বারে বারে হয়। দু পাঁচ দিন বা কোষ্ঠবদ্ধ হয়, দু পাঁচ দিন বা পেটের-ব্যামো হয়। বেল খাইলে এমন সব রোগীরও বিশেষ উপকার হয়। এমন অনেক দুর্ব্বল আর রোগা লোক আছে, যাদের মাঝে মাঝে শুদু আমাশা হয়। বেল খাইলে তাদের খুব উপকার হয়। এর আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না, পুরাণ হইলে তাকে 'গ্রহণী (গিরিণি) বলে। বেল গিরিণি রোগের বড় অস্থুদ। কাঁচা

বেলের চেয়ে পাকা বেল ধারক। এই জন্যে, কোষ্ঠ-বদ্ধে কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাওয়া ভাল। আর পেটের-ব্যামোতে পাকা বেল খাওয়া ভাল। পাকা বেল শুদ্ধ খাইলেও হয়, শর্ব্বত করিয়া খাই-লেও হয়। কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাইলেও হয়, আবার শুঁটো করিয়া তার পাচন করিয়া খাইলেও হয়।

পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগী যদি বারে বারে বাহ্যে যায়, তার মলে আম আর রক্ত দুই-ই থাকে, আর তার জ্বর না থাকে, তবে বেলে তার ভারি উপকার হয়। জ্বর থাকিতে পুরাণ রক্ত-আমাশার রোগী যদি বেল খায়, তবে তার পেট ফাঁপে আর অপাক হয়। সব রকম পেটের-ব্যামোরই বেল এত ভাল অসুদ যে, বিলিতি অসুদেরও বইতে ডাক্তরেরা বেলের কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। বেল থেকে ডাক্তরেরা তিন রকম অসুদ তয়ের করিয়াছেন।

(১) একৃষ্ট্রাক্ট অব্ বেল।

(২) লিকুইড্ একৃষ্ট্রাক্ট অব্ বেল।

বেল পাউডর।

একৃষ্ট্রাক্ট অব্ বেল, আর লিকুইড্ একৃষ্ট্রাক্ট অব্ বেল সব ডিস্‌পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া

যায়। এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব বেলর মাত্রা আধ ($\frac{1}{2}$) ড্রাম থেকে এক ড্রাম। লিকুইড্‌ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব বেলের মাত্রা এক ড্রাম থেকে দু ড্রাম। কলিকাতার লাল দীঘির ধারে স্মিথ্‌ ষ্ট্যান্‌ষ্ট্রীটের ডিস্‌পেন্সরিতে বেল পাউডর (গুঁড়ো) বিক্রী হয়। এই বেল পাউডরের সঙ্গে আর কিছু মিশন আছে বলিয়া, তাঁরা এই বেল-পাউডরের কম্পাউণ্ড বেল-পাউডর নাম দিয়াছেন। এই কম্পাউণ্ড বেল-পাউডর বড় শিশিতে বিক্রী হয়। কতটুকু বেল পাউডর কেমন করিয়া খাইতে হয়, শিশির গায়ে কাগজের (লেবেলের) উপর তা লেখা আছে। লিকুইড্‌ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব বেল শুক্ন বেল থেকে তয়ের হয়। এই জন্যে, ওর চেয়ে এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব বেলে উপকার বেশী।

কুর্চ্চি——কুর্চ্চি পুরাণ রক্ত-আমাশার আর একটী ভাল দেশি অস্থুদ। বেলের চেয়ে কুর্চ্চির আদর বেশী বই কম নয়। কুর্চ্চি করুপী(করবী)ফুলের জাতি। কুর্চ্চির ছাল যেমন কষো, তেমনি তিক্ত। পুরাণ রক্ত-আমাশার রোগীকে কুর্চ্চির ছালের ক্বাথ খাওয়াইতে হয়। ক্বাথকে ডাক্তরেরা ইন্‌ফিয়ুশন্‌ বলেন। কুর্চ্চির ছালের ক্বাথ যে রকম করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কুর্চ্চির ছাল হামাম-দিস্তেতে গুঁড়ো কর। এই

গুঁড়ো এক কাঁচ্চা (৪ ড্রাম), এক পোওয়া (৮ ঔন্স) ফুটন্ত গরম জলে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। তার পর ছাঁকিয়া লও। যে পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, সে পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখা চাই। এই ক্বাথ আধ ছটাক করিয়া রোজ তিন বার খাইতে দিবে। কুর্চ্চির ছালের ক্বাথ শুদ্ধু পুরাণ রক্ত-আমাশার অসুদ নয়, জ্বরেরও অসুদ। এই জন্যে, পুরাণ রক্ত-আমাশার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, কুর্চ্চির ছালের ক্বাথে দুয়েরই উপকার হয়। এখানে বেলের চেয়ে কুর্চ্চির ছালের ক্বাথে বেশী ফল পাওয়া যায়। বেল ত জ্বরে দিতেই নাই। এ কথা এর আগেই বলিছি।

কুর্চ্চির বিচিকে ইন্দ্রযব বলে। ইন্দ্রযবের মত তিত জিনিশ আর আছে কি না বলিতে পারি না। ইন্দ্রযব কৃমির বড় অসুদ।

আমাদের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোওয়ানের বিশ্বাস যে, পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়, আর নূতন ব্যামোর পক্ষে কবিরাজি চিকিৎসা কিছু নয়। কিন্তু আমি তা বলি না। আমার বিশ্বাস তা নয়। আমার বিশ্বাস, পুরাণ ব্যামোর পক্ষে অনেক ডাক্তর ভাল নয়, আর নূতন ব্যামোর পক্ষে অনেক কবিরাজ ভাল নয়। ডাক্তর মহাশয়

পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিতেছেন। অনেক অস্থুদ বিস্থুদ দিলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন, ডাক্তরি চিকিৎসাটা পুরাণ ব্যামোর পক্ষে কিছু নয়—আপনারা কবিরাজ দেখান। ডাক্তর মহাশয়ের অহঙ্কার আর মূর্খতার পরিচয় এর বাড়া আর কি হইতে পারে? তাঁর নিজের বুদ্ধি বিদ্যার যে রকম দৌড়, সেই রকম চিকিৎসা করিয়া তিনি একটা পুরাণ রোগ ভাল করিতে পারিলেন না! তাঁর কাছে এতেই ডাক্তরি চিকিৎসাটাই পুরাণ ব্যামোর পক্ষে কিছু নয় বলিয়া স্থির হইল! এক ডোবা জল দেখিয়া সমুদ্রে আর কতই বা বেশী জল আছে ভাবা যেমন পাগ্‌লামী, এ রকম ভাবাও তাঁর তেমনি পাগ্‌লামী। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয় না বলিয়া, এ পুরাণ ব্যামোটী আমি ভাল করিতে পারিলাম না, আর এক জন ভাল ডাক্তর দেখান—এ বলিলে ডাক্তর মহাশয়ের সত্য কথাও বলা হইত, ডাক্তরি চিকিৎসারও গৌরব বজায় রাখা হইত। আমি এক জন সামান্য ডাক্তর—আমি একটা রোগ ভাল করিতে পারিলাম না বলিয়া ডাক্তরি চিকিৎসায় সে রোগ সারে না, বলিব! কি সর্ব্বনেশে কথা!

ডাক্তরি শাস্ত্রটা সব যদি কেউ নখ-দর্পণের মত করিতে পারেন, তবু তাঁর এ কথা বলা উচিত নয়। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়, আর নূতন ব্যামোর পক্ষে কবিরাজি চিকিৎসা কিছু নয়—গোটা কতক জেঁকো ডাক্তর আর জেঁকো কবিরাজে লোকের মনে এ বিশ্বাসটা জন্মাইয়া দিয়াছে।

রক্ত-আমাশার কথা সারা হইল। এখন রক্ত-ভেদের কথা বলি।

৬। **রক্ত-ভেদ**———এর আগেই বলিছি, অনেক জায়গায় রোগের চেয়ে রোগের উপসর্গ লইয়া চিকিৎসককে বেশী ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। রক্ত-ভেদের বেলায় এ কথাটী যেমন খাটে, আর কোন উপসর্গেরই বেলায় তেমন নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) আর আর যত উপসর্গের কথা বলিছি, ও বলিব, সব চেয়ে রক্ত-ভেদেই ভয় বেশী। রক্ত-ভেদকে চিকিৎসকেরা বড়ই ডরান। ভাবিয়া দেখ ত ডরাইবার কারণ খুবই আছে। রক্ত-ভেদে রোগী যত শীঘ্র মারা যাইতে পারে, এত আর কোন রোগেই নয়। রক্ত-ভেদ খুব বেশী হইলে; চাই কি, রোগী বাহ্যের জায়গাতে বসিয়াই মারা যাইতে পারে। আর আর উপসর্গ নিবারণ

করিতে এক আধটু দেরি হইলেও বরং চলে। কিন্তু রক্ত-ভেদের বেলায় দেরি মোটেই সয় না। রক্ত-ভেদের খবর লইয়া বাড়ীর লোক চিকিৎসকের কাছে দৌড়িলেন। চিকিৎসক তাড়াতাড়ি করিয়া গিয়া দেখিলেন, রোগীর শ্বাস হইয়াছে—রোগী খাবি খাইতেছে। তখন চিকিৎসক আর কি করিবেন? এ রোগে অনেক জায়গায় এমনিই ঘটে বটে। চিকিৎসক আসিতে তর সয় না। এই জন্যে, এ রোগে চিকিৎসকের আশা ভরসা এত কম। এই বলিতে বলিতে নিতান্ত বিমর্ষ ভাবে তিনি রোগীর বাড়ী থেকে বিদায় হইলেন। তাতেই বলি, এ রোগের মোটামুটি চিকিৎসা গৃহস্থদেরও জানিয়া রাখা উচিত। রক্ত-ভেদ সব জায়গাতেই যে খুব বেশী হইতে হয়, বা হইয়া থাকে, তা নয়। অনেক জায়গায় রক্ত-ভেদ এত কম হয় যে, তাকে নামে মাত্র রক্ত-ভেদ বলা যায়। যাই হোক্, রক্ত-ভেদের নাম শুনিলে সব জায়গাতেই চিকিৎসকের খুব সাবধান হওয়া উচিত।

কারণ——রক্ত-ভেদের কারণ অনেক। সে সব কারণ জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। কেন না, কি কারণে রক্ত-ভেদ হইতেছে, যদি বেশ বুঝিতে না পার, তবে তুমি তার চিকিৎসাও ভাল করিতে

পারিবে না। এই জন্যে, এখানে কারণ গুলি এক দুই করিয়া সাজাইয়া বলিলাম।

(১) পেটে কোনও রকম বেশী চোট বা ঘা ঘো লাগিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে।

অমুকের পেটে অমুক লাথি মারিয়াছে। লাথি খাওয়ার পর থেকেই তার রক্ত-ভেদ হয়। ধরা পড়িলে চোরেরা গৃহস্থদের কাছে যে রকম মারি খাইয়া থাকে, তাতে তাদের প্রায়ই রক্ত-ভেদ হয়। পেটে বেশী রকম ঘা ঘো লাগিলে অন্ত্রের ভিতরকার শির ছিঁড়িয়া যায়। শির ছিঁড়িয়া গেলে রক্ত-ভেদ হয়।

(২) রক্ত খারাপ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে।

রক্ত খারাপ হইলে যে রক্ত-ভেদ হইতে পারে, আর হইয়া থাকে, স্বল্পবিরাম-জ্বরের রক্ত-ভেদ একটী উপসর্গ—এ কথাটা মনে থাকিলেই তা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সবিরাম-জ্বরের (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরের) চেয়ে স্বল্প-বিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) রক্ত বেশী খারাপ হয়। যদি বল, স্বল্পবিরাম-জ্বরে তবে সব জায়গায় কেন রক্ত-ভেদ হয় না। স্বল্পবিরাম-জ্বরে রক্ত খুব বেশী খারাপ না হইলে রক্ত-ভেদ হয় না। আবার অনেক জায়গায় রোগীর ভাগ্যক্রমে স্বল্প-

বিরাম-জ্বরে রক্ত তত বেশী খারাপ হয় না। এই জন্যেই, স্বল্পবিরাম-জ্বরে সব জায়গায় রক্ত-ভেদ হয় না।

(৩) যে জায়গা থেকে বরাবরি রক্ত পড়িয়া থাকে, যে কারণেই হোক্, সে জায়গা থেকে রক্ত-পড়া বন্ধ হইয়া গেলে, রক্ত-ভেদ হইতে পারে। ঋতু বন্ধ হইলে মেয়েদের রক্ত-ভেদ হইতে পারে। নাক দিয়া রক্ত-পড়া যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, কোন কারণে সে রক্ত-পড়া বন্ধ হইলে, তাদের রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অর্শ থেকে যাদের বরাবরি রক্ত পড়ে, কোন কারণে হঠাৎ সে রক্ত-পড়া বন্ধ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে।

(৪) অন্ত্রের খুব বেশী রকম উদ্দীপনা হইলে রক্ত ভেদ হইতে পারে। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, ৫৪৬র পাতে বলিছি। অন্ত্রের উদ্দীপনার কথা নীচে লিখিয়া দিলাম।

খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জোলাপ লইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল এক চাসা-বৈদ্য এক নাপিতকে পটোলের শিকড় ছেঁচিয়া খাওয়াইয়াছিল। পটোলের শিকড় ভয়ানক জোলাপ। পটোলের শিকড় খাইয়া তার যে ভেদ হইতে আরম্ভ হইল, সে ভেদ

আর থামিল না। শেষে তা থেকে রক্ত-ভেদ আরম্ভ হইল। সেই রক্ত-ভেদেই নাপিতের প্রাণ গেল। খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জোলাপ আরও ঢের আছে। সে সব জোলাপের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় লিখিব। ধাতু-ঘটিত বিষ এমন অনেক আছে, যা খাইলে রক্ত-ভেদ হয়। ধাতু-ঘটিত বিষ, যেমন শেঁখো। শেঁখোকে ডাক্তরেরা আর্সেনিক্ বলেন। ধাতু-ঘটিত বিষ আরও ঢের আছে। সে সব বিষের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় বলিব। খুব শক্ত গুট্‌লে মল অন্ত্রের ভিতর আট্‌কে থাকিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। খস্‌খসে ধারাল পাত্তরি অন্ত্রের ভিতর থাকিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অন্ত্রের ভিতর পতরি থাকার কথা এর পর বলিব।

(৫) ছোট অন্ত্রের প্রদাহ থেকে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। ছোট অন্ত্রের প্রদাহকে ডাক্তরেরা এণ্টরাইটিস্ বলেন। অন্ত্রের ঘা থেকে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। কি কি রোগে অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়? রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়, আর টাইফয়িড্ ফীবরে অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়। রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হওয়ার কথা এর আগেই বলিছি। রক্ত-আমাশা থেকে রক্ত-ভেদ হওয়ার কথা ৬২০র পাতে বলিছি। টাইফয়িড্

ফীবরের কথা এর পর বলিব। অন্ত্রের ভিতর ক্যান্সর্ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। ক্যান্সর্ এক রকম ঘা। সে ঘা সারে না। এ ঘায়ের কথা এর পর বলিব।

(৬) যকৃতের ভিতর দিয়া রক্ত চলা ফেরার কোন রকম ব্যাঘাত হইলে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত জমা হয়। রক্ত-জমাকে ডাক্তরেরা কঞ্জেস্চন্ বলেন। অন্ত্রের ভিতরকার শিরে এই রকম করিয়া রক্ত জমা হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের কি ফুস্কোর পুরাণ ব্যামো থেকে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত জমা হয়; তা থেকেও রক্ত-ভেদ হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডকে ডাক্তরেরা হার্ট বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

যে কারণেই হোক্, অন্ত্রের ভিতরকার কাল রক্তের শিরে বেশী রক্ত জমিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি থেকে ঢের রক্ত বাহির হয়। এই রক্ত গুহ্যদ্বার দিয়া নামিলেই তাকে রক্ত-ভেদ বলে। যে রোগেই কেন হোক্ না, যকৃতের ভিতর দিয়া রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটিলে অন্ত্রের ভিতরকার কাল রক্তের শিরে রক্ত জমা হয়। শুদ্ধু অন্ত্রেরই কাল রক্তের শিরে যে রক্ত জমা হয়, তা নয়। পেটের

(পাকস্থলীর) ভিতরকার কাল রক্তের শিরেও সেই রকম রক্ত জমা হয়। এই জন্যে, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটিলে রক্ত-ভেদও হইতে পারে, রক্ত-বমিও হইতে পারে, আবার চাই কি, দুই-ই হইতে পারে। রক্ত-বমিকে ডাক্তরেরা হিমেটিমেসিস্ বলেন। রক্ত-বমির কথা এর পর বলিব। অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, রক্ত-বমি না হইয়া, পেট থেকে সেই রক্ত অন্ত্রের ভিতর গিয়া নামে, আর সেই রক্ত গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কাযেই, এখানে রক্ত-বমি না হইয়া রক্ত-ভেদ হয়। অনেক রোগে যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটে। অনেক দিন ধরিয়া খুব বেশী মদ খাইলে, যকৃতের এক রকম রোগ হয়। সেই রোগে যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমন আর কোন রোগেই নয়। সে রোগকে ডাক্তরেরা কিরোসিস্ অব্ দি লিবর্ বলেন। কিরোসিস্ রোগে যকৃত জড়শড়, ফাটা ফাটা, আর দানা দানা হয়। যকৃতের কিরোসিস্ রোগের কথা এর পর বলিব।

(৭) অন্ত্রের ভিতর অন্ত্র ঢুকিয়া গেলেও রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অন্ত্রের ভিতর অন্ত্র এ রকম করিয়া ঢুকিয়া গেলে ডাক্তরেরা তাকে ইণ্টস্সসেপ্-

শন্ বলেন। ইন্টস্‌সসেপ্‌শনের কথা এর পর বলিব।

(৮) য়্যানিয়ুরিজ্‌ম্ ফাটিয়া অন্ত্রের ভিতর রক্ত গেলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। রাঙা রক্তের শিরের (ধমনীর) আবকে ডাক্তরেরা য়্যানিয়ুরিজ্‌ম্ বলেন। য়্যানিয়ুরিজমের কথা ৫৩৩র পাতে বলিছি।

রক্ত-ভেদে কি রকম রক্ত বাহির হয়?—সে রক্ত রাঙা কি কাল? রক্ত-ভেদের রক্ত প্রায়ই কাল দেখা যায়। এই জন্যে, ডাক্তরেরা রক্ত-ভেদকে মিলীনা বলেন। মিলীনার অর্থ কাল। রক্ত-ভেদ যদি বেশী না হয়, আর সেই রক্ত ছোট অন্ত্র থেকে আসে, আর রক্ত যদি বেগে বাহির না হয়, তবে রক্তের রং প্রায়ই খুব কাল, যেন আল্কাত্‌রার মত হয়। আর রক্ত-ভেদ যদি বেশী হয়, আর সেই রক্ত ছোট অন্ত্র থেকে আসে, আর রক্ত যদি বেগে বাহির হয়, তবে সে রক্তের রং তত কাল হয় না।

বড় অন্ত্র থেকে যে রক্ত আসে, সে রক্ত লাল। আবার গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গা থেকে যে রক্ত আসে, সে রক্ত আরও লাল। রক্ত-ভেদ খুব কম হইতে পারে, আবার চাই কি, এত বেশী হইতে পারে যে, রোগী তখনই তাতে মারা যাইতে পারে। এ কথা এর আগেই বলিছি। ছোট অন্ত্র থেকে

রক্ত আসিতেছে, কি গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গা থেকে রক্ত আসিতেছে, রক্তের আকার প্রকার দেখিয়া তা অনেক জায়গায় ঠিক্ করিতে পার। রক্ত-ভেদের চিকিৎসায় তোমাকে ডাকিলে, রোগীর গুহ্যদ্বার আর তার কাছাকাছি জায়গা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমার অপ্রতিভ হইবার কথা। কেন না, অর্শ থেকে যে রক্ত পড়ে, রক্ত-ভেদ বলিয়া তোমার তা ভুল হইতে পারে। মলের নাড়ীর ভিতর এক রকম আব হয়। ডাক্তরেরা সে আবকে পলিপস্ বলেন। মলের নাড়ীর পলিপস্ থেকে রক্ত পড়ে। যদি সাবধান হইয়া না দেখ, তবে এ রক্ত-পড়াও রক্ত-ভেদ বলিয়া তোমার ভুল হইতে পারে। মলের নাড়ীকে ডাক্তরেরা রেক্টম্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মলাশয় বা মল-ভাণ্ড বলে। ৪৮৯র পাতে এ কথা বলিছি। ডাক্তরেরা যে আবকে পলিপস্ বলেন, সে আবকে তুমি শিকড়-বাকড়-ওয়ালা আব বলিতে পার। শিকড় একটাও হইতে পারে, দুটোও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে। এই আব শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতেই বেশী হয়। নাকের ভিতর হয়, জরায়ুর ভিতর হয়, মলের নাড়ীর ভিতর হয়। জরায়ুর কথা ৪৮৯র পাতে বলিছি। পিত্তির দরুণ

মলের রং কাল হয়। লৌহ ঘটিত অষুদ খাইলে মলের রং কাল হয়। তাতেই বলিতেছি, মলের রং কাল দেখিলেই রোগীর রক্ত-ভেদ হইতেছে—এ কথা বলিও না। বেশ ঠাউরে, বেশ বিবেচনা করিয়া, বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে রোগের কথা বলিবে। চিকিৎসকের অপযশ কথায় কথায়। এ কথা এর আগেই বলিছি। রক্ত-ভেদের রোগীর বুকের কড়া থেকে তল-পেটের নীচে পর্য্যন্ত, আর ডাইন কোঁক থেকে বাঁ কোঁক পর্য্যন্ত সব পেট বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এর আগেই বলিছি, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাতই রক্ত-ভেদের আসল কারণ। যকৃতের ভিতর রক্ত জমিলে তাতে ব্যথা হয়। শুদু যকৃত বলিয়া কেন, যে যন্ত্রে রক্ত জমে, তাতেই ব্যথা হয়। ডাইন কোঁকে, পাঁজরের উপর, আর তার নীচে কেমন করিয়া আঙুলের ঘা দিয়া যকৃতের ব্যথা ঠিক্ করিতে হয়, ১১৩ থেকে ১১৫র পাতে, আর ১৩০র পাতে তা বলিছি। যকৃতের ভিতর রক্ত জমিলে যকৃতে ব্যথা হয়, যকৃত বড়ও হয়। এই জন্যে, সহজ শরীরে পাঁজরের ভিতর যকৃত যতটুকু জায়গা লইয়া থাকে, তা ছাড়াইয়া আশে পাশে আসে। আঙুলের ঘা দিয়া তাও বেশ জানিতে পারা যায়।

কেন না, আঙুলের ঘা দিলে সহজ বেলায় যেখানে ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়, যকৃত বাড়িলে সেখানে নিরেট শব্দ পাবে। ঘা পাইয়া রোগী সেখানে ব্যথাও বলিবে।

অর্শ থেকে যে রক্ত পড়ে, সে রক্ত রক্ত-ভেদের রক্ত কি না, তা কেমন করিয়া জানিবে? তা জানা শক্ত নয়। অর্শের রক্তের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্ত ঢের কাল। আর অর্শের রক্তের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্তের পরিমাণও বেশী। এ ছাড়া, রক্ত-ভেদে অর্শের যে কষ্ট, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্শের যাতনা কি? অর্শের জায়গায় ব্যথা, টাটানি আর শূলনি। অর্শের কথা বলিবার সময় এ সব ভাল করিয়া বলিব।

তার পর এখন রক্ত-ভেদের চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——রক্ত-ভেদের চিকিৎসায় চিকিৎসকের খুব বেশী বিবেচনার দরকার। শরীরের যে জায়গা থেকেই কেন রক্ত পড়ুক না, রক্ত যদি খুব বেশী পড়ে আর অনেক ক্ষণ ধরিয়া পড়ে, তবে শেষে তাতেই রোগী মারা যায়। এই জন্যে, রক্ত বেশী পড়িতেছে কি না, সকলের আগে এইটাই বেশ করিয়া ঠিক করিবে। গিয়া যদি দেখ যে,

অনেক ক্ষণ অন্তর, কি বারে বারে একটু একটু করিয়া রক্ত-ভেদ হইতেছে, তবে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা যত শীঘ্র পার, ঘুচাইয়া দিবে। এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে খুব বেশী রক্ত না জমিলে রক্ত-ভেদ হয় না। আবার যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত না ঘটিলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত জমিতে পারে না। এই জন্যে, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচানই, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা ঘুচাই-বার এক মাত্র উপায়। সে উপায় আর কি? জোলাপ দিয়া অন্ত্র একবারে সাফ করিয়া দেওয়াই সেই উপায়। জোলাপ দিয়া অন্ত্র বেশ সাফ করিয়া দিলে, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত আপনিই ঘুচিয়া যায়। যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচিয়া গেলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমাও আপনি ঘুচিয়া যায়। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা ঘুচিয়া গেলে রক্ত-ভেদ আর হয় না। রক্ত-ভেদের ভয়ও আর থাকে না। যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচাইবার জন্যে ডাক্তরেরা যত রকম জোলাপ দিয়া থাকেন, সব চেয়ে সল্‌ফেট্ অব ম্যাগ্নীশিয়াই ভাল। সল্‌ফেট্ অব ম্যাগ্নীশিয়াতে

বেশী কাজ হয়। সল্‌ফেট্‌ অব ম্যাগ্নীশিয়াকে সল্ট্‌ জোলাপ বলে। সল্‌ফেট্‌ অব ম্যাগ্নীশিয়াকে সোজা ইংরিজিতে এপ্‌সম্‌ সল্ট বলে। সচরাচর লোকে শুদ্ধু সল্টই বলে। সল্ট্‌ জোলাপ বলিলে সল্‌ফেট্‌ অব ম্যাগ্নীশিয়াই বুঝায়। সোণামুখীর ক্বাথে গুলিয়া তাতে ডাইলিউট্‌ সল্‌ফিয়ুরিক য়্যাসিড্‌ দিয়া খাওয়াইলে, সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়ার তেজ বাড়ে। সোণামুখীর ক্বাথকে ডাক্তরেরা ইন্‌ফিয়ুশন্‌ সেনা বলেন। কতটুকু সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া, কত খানি ক্বাথের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

সল্‌ফেট্‌ অব ম্যাগ্নীশিয়া	...	...	৪ ড্রাম্‌
ডিল্‌ ওয়াটর্‌	... ...	...	২ ঔন্স
ডাইলিয়ুট্‌ সল্‌ফিয়ুরিক্‌ য়্যাসিড্‌	...	...	১০ ফোটা
সোণামুখীর ক্বাথ (ইন্‌ফিয়ুসন্‌ সেনা)		...	২ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

এই যে অস্থুদ তয়ের করিলে, এ এক মাত্রা; অর্থাৎ এক বার খাইবার অস্থুদ। ৪ ড্রাম্‌ সল্‌ফেট্‌ অব ম্যাগ্নীশিয়া ওজন করিয়া দু ঔন্স ডিল্‌ ওয়াটরে ঢালিয়া দেও। তার পর একটী কাটি দিয়া খানিক ক্ষণ নাড়। খানিক ক্ষণ নাড়িতেই সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া সব বেশ গুলিয়া যাবে। গুলিয়া গেলে

তাতে দশ ফোটা ডাইলিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক য়্যাসিড্ দেও। শেষে সোণামুখীর ক্বাথের সঙ্গে সব মিশা-ইয়া লও। এই যে অস্থদ তয়ের করিলে, এ এক বার খাইবার অস্থদ। এক বার খাইবার মত অস্থদকে ভাল কথায় এক মাত্রা বলে। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নীশিয়ার জোলাপে পেটের একটু ফাঁপ রাখে। ডিল্ ওয়াটর্ কি পেপারমিণ্ট ওয়াটরের সঙ্গে খাইলে সে দোষ কাটিয়া যায়। সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নীশিয়া বড় বিস্বাদ। খাইলে গা-ন্যাকার ন্যাকার করে, অনেক জায়গায় ন্যাকারও হয়। ডাইলিয়ুট্ সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ওর বিস্বাদ অনেক ঘুচিয়া যায়। সল্‌ফেট্ অব ম্যাগ্নী-শিয়ার জোলাপে পেটের একটু কামড়ও হয়। সোণামুখীর ক্বাথের সঙ্গে দিলে সে দোষ কাটিয়া যায়। এ ছাড়া, সোণামুখীর ক্বাথের সঙ্গে মিশাইলে সল্‌ফেট্ অব ম্যাগ্নীসিয়ার তেজ বাড়ে। কেন না, সোণামুখী নিজেই জোলাপ। সণ্টের জোলাপে জলবৎ ভেদ খুব বেশী হয়। এই জন্যে, ওলাউঠার সময় এ জোলাপ দেওয়া নিষেধ। ওলাউঠার সময় সণ্টের জোলাপ দিয়া অনেক জায়গায় অনেক চিকিৎসক অপ্রতিভ হইয়াছেন। জলবৎ ভেদ

হইতে হইতে শেষে জোলাপের বাহ্যে ওলাউঠায় দাঁড়াইয়া যায়।

খুব বাহ্যে হইয়া অন্ত্র পরিষ্কার হইয়া গেলে, রোগীকে নীচেকার অসুদটা রোজ তিন বার করিয়া খাইতে দিবে।

ডাইলিয়ুট নাইট্রোমিয়ুরিয়্যাটিক য়্যাসিড			৩ ড্রাম্
লাইকর ষ্ট্রীকৃনীয়ি	...	...	১ ড্রাম্
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	৬ ড্রাম
টিংচর জিঞ্জর	...	...	৬ ড্রাম
পরিষ্কার জল	...	...	১২ ঔন্স পুরাইয়া।

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ। শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও।

এ অসুদটী খাইতে একটু ঝাঁঝ লাগে। এই জন্যে, এক এক দাগ অসুদ কাঁচ্চা খানেক জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইবে। অসুদ ফুরাইয়া গেলে, আবার তয়ের করিয়া লইবে। রোগীর শরীর যত দিন না বেশ সবল আর সুস্থ হয়, তত দিন বেশ নিয়ম করিয়া এই অসুদটী খাইতে বলিবে।

গিয়া যদি দেখ যে, বারে বারে খুব বেশী বেশী রক্ত-ভেদ হইতেছে, তবে দেরি না করিয়া তখনই রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবে। যত শীঘ্র পার রক্ত বন্ধ করিয়া রোগীর জীবন রক্ষা করিবে। তার পর আসল রোগের

চিকিৎসা করিবে। রক্ত-ভেদ শীঘ্র বন্ধ করিবার কোন উপায় আছে কি না? আছে, ভাল উপায়ই আছে। বরফের জল পিচ্‌কিরি করিয়া অন্ত্রের ভিতর দিলে, আর ন্যাক্‌ড়ার পোঁটলা করিয়া বরফের টুক্‌রো পেটের উপর বসাইয়া দিলে রক্ত-ভেদ শীঘ্রই বন্ধ হয়। এ ছাড়া, রক্ত-ভেদ হইবার সময় এক খান বরফ একটু মোটা আর লম্বা করিয়া কাটিয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিবে। সে বরফ খান গলিয়া গেলে, আবার সেই রকম আর এক খান বরফ চালাইয়া দিবে। যত ক্ষণ না রক্ত-ভেদ বন্ধ হয়, তত ক্ষণ এই রকম করিবে। ন্যাক্‌ড়ার পোঁটলায় বরফ থাকে না, গলিয়া বাহির হইয়া যায়। কাযে কাযেই, তাতে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঠাণ্ডাও লাগাইতে পারা যায় না। লাভের মধ্যে, রোগীর গা, বিছানা, সব ভিজিয়া যায়। এই জন্যে, চামড়ার থলিতে বরফের টুক্‌রো পুরিয়া সেই থলি রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দিবে। কলিকাতায় কি কলিকাতার মত বড় শহরে সাহেবদের ডিস্পেন্সেরিতে চামড়ার থলি কিনিতে পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, বরফ পাওয়া যায়, কিন্তু চামড়ার থলি মিলাইতে পারা যায় না। সে সব জায়গায় একটু

কৌশল খাটান চাই। কল কৌশল এমন বেশী আর কি? কচি কলা-পাত আগুণে তাতাইয়া খুব নরম করিয়া লও। তার পর, সেই কলা-পাতে বরফের টুক্‌রো বাঁধিয়া রোগীর পেটের উপর সেই কলা-পাতেরই পোঁটলা বসাইয়া দিতে পার। কিম্বা সেই কলা-পাতের পোঁটলা ন্যাকৃড়ার থলির ভিতর পুরিয়া লইতে পার। উপস্থিত মতে যে রকমে পার, সেই রকমই করিয়া লইবে। বরফের টুক্‌রো গিলিয়া গিলিয়া খাইতেও বলিবে। কষ-জলের পিচ্‌কিরি করিলেও রক্ত বন্ধ হয়। বাবলার ছাল, বকুলের ছাল আর পেয়ারার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া তাতে ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কিরি দিবে। কষ-জল জুড়াইয়া খুব ঠাণ্ডা না হইলে পিচ্‌কিরি দিও না। কেন না, গরম জলের পিচ্‌কিরি করিলে রক্ত-ভেদ বাড়িবে বই কমিবে না। এ কথাটা যেন মনে থাকে। কষ-জল তয়ের করার দেরি যদি না সয়, তবে তিন পোওয়া ঠাণ্ডা জলে ৪ ড্রাম্ (এক কাঁচ্চা) ট্যানিক্ য়্যাসিড্ আর ৪ ড্রাম্ ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া সেই জলের পিচ্‌কিরি করিবে। কষ-জলের পিচ্‌কিরির কথা ৫৮৪ থেকে ৫৮৫র পাতে বলিছি।

তার্পিন তেল রক্ত-ভেদের বড় অসুদ। অর্গট্

অব্ রাই আর গ্যালিক্ য়্যাসিড্—এ দুটিও এ রোগের খুব ভাল অসুদ। ডাইলিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্ আর লডেনমের (আফিঙের আরোকের) সঙ্গে মিশাইলে গ্যালিক্ য়্যাসিডের ধারক গুণ বাড়ে। রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবার জন্যে, এই সব অসুদ কোন্‌টী কার পর কতটুকু করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

গ্যালিক্ য়্যাসিড্ …	…	১½ ড্রাম
ডাইলিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক য়্যাসিড্		১½ ড্রাম্
লডেনম (টিংচর্ ওপিয়াই)	…	১½ ড্রাম
লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ অর্গট্	…	২ ড্রাম্
তার্পিন তেল …	…	২ ড্রাম্
মিয়ুসিলেজ্ (গঁদ-ভিজের জল)	…	৬ ঔন্স পুরাইয়া।

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ। শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও।

যত ক্ষণ রক্ত-ভেদ বন্ধ না হবে, ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ খাওয়াইবে। ফি বারেই অসুদের শিশি বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে।

রক্ত-ভেদের যে কয়টী ভাল অসুদ আমি জানি, এখানে সে কয়টীই একত্র মিশাইয়া দিইছি। ৩৯৬র পাতে বলিছি, কোন রোগের যদি দু তিনটী ভাল অসুদ জানা থাকে, আর সে কয়টী অসুদ একত্র দিবার কোন বাধা না থাকে, তবে তা একত্র দিলে

যেমন উপকার হয়, শুদ্ধু একটী অসুদে তেমন উপকার হয় না। এই জন্যে, এখানে রক্ত-ভেদের ভাল ভাল অসুদ গুলি সব একত্র দিইছি। এ অসুদে তেমন উপকার হইল না, আর একটী অসুদ দিই—এ রকম করিয়া কাল কাটান বা দেরি করা, রক্ত-ভেদে চলে না। রক্ত-ভেদ কি ভয়ানক রোগ——রক্ত-ভেদে রোগী কত শীঘ্র মারা যাইতে পারে, এর আগেই তা বলিছি।

পথ্য——চূণের জল-মিশন ১ বল্কা দুধ। দুধ খুব ঠাণ্ডা করিয়া তবে খাবে। গরম দুধ খাইলে রক্ত-ভেদ বাড়ে বই কমে না। এই জন্যে, বরফ দিয়া দুধ ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পার ত আরও ভাল হয়। খুব দুর্ব্বল রোগীকে মাংসের কাথ আর ব্রাণ্ডি খাইতে দিবে। ব্রাণ্ডি বলিলেই ১র নম্বর ব্রাণ্ডি বুঝিয়া লইবে। মাংসের কাথের সঙ্গে এক এক বারে দু ড্রাম্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিবে।

গিয়া যদি দেখ, বারে বারে বেশী রক্ত-ভেদ হইয়া রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, আর নাড়ী এক বারে সুতোর মত হইয়াছে, তবে রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবার যে সব ফিকির বলিছি, তা ত করিবেই। তা ছাড়া, তার হৃৎপিণ্ডের বল বাড়াইয়া দিবার জন্যে ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ ঘণ্টায়

ঘণ্টায় খাইতে দিবে। ষ্টিমুলেণ্ট অসুদ নীচে লিখিয়া দিলাম।

র‍্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব র‍্যামোনিয়া			২ ড্রাম্
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক ঈথর্)			২ ড্রাম্
১ম নম্বর ব্রাণ্ডি	...	...	১½ ঔন্স
টিংচর ডিজিটেলিস্	...	...	½ ড্রাম্
সিরপ্ জিঞ্জর্	...	...	৬ ড্রাম্
র‍্যাকুই এনিথাই (ডিল্ ওয়াটর্)	...		৬ ঔন্স পুরাইয়া।

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ। শিশির গায়ে ৬টা দাগ কাটিয়া দেও।

যত ক্ষণ নাড়ী বেশ সবল আর রোগী বেশ চাঙ্গা না হবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক দাগ এই অসুদ খাওয়াইবে। রোগীর গা আর হাত পা যদি ঠাণ্ডা দেখ, তবে সব গায়ে শুঁঠের গুঁড়ো মালিশ করিতে বলিবে, আর আগুনে ন্যাক্‌ড়া তাতাইয়া হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয় সেক দিতে বলিবে। এ ছাড়া, দুই বগলে, হাতের তেলোয় আর পায়ের তেলোয় গরম জল-পোরা বোতল বা শিশি দিয়া রাখিলে রোগীর সন্নিপাত অবস্থা শীঘ্রই ঘুচিয়া যায়। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

রক্ত-ভেদের রোগীর ঘর যত দূর পার ঠাণ্ডা রাখিবে। ঘরের ভিতর, বাইরে বা তার কাছে

আগুন কি ধোঁওয়ার যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, আর বাইরের পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের ভিতর বেশ খেলিতে পায়, তবে সে ঘর সব সময়েই বেশ ঠাণ্ডাথাকে। নিয়ুমোনিয়া আর প্লুরিসির রোগীকে যে রকম স্থির রাখিতে বলিছি, রক্ত-ভেদের রোগী-কেও সেই রকম স্থির রাখিবে। ঠাণ্ডা ঘরে খুব স্থির রাখাই রক্ত-ভেদের রোগীর চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—এ কথাটা যেন মনে থাকে।

রক্ত-ভেদ নিবারণ করিবার জন্যে অন্ত্রের ভিতর বরফের জলের পিচ্‌কিরি দিতে বলিছি; গুহ্যদ্বারের মধ্যে বরফের টুক্‌রো চালাইয়া দিতে বলিছি; ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলিতে করিয়া বরফের টুক্‌রো রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দিতে বলিছি; আর বরফের টুক্‌রো গিলিয়া খাইতে বলিছি। সহরে এ সব ব্যবস্থা চলে। পাড়াগাঁয়ে এ রকম ব্যবস্থা করার চেয়ে কোন ব্যবস্থা না করাই ভাল। পাড়াগাঁয়ে রক্ত-ভেদের রোগীর চিকিৎসায় বরফের ব্যবস্থা করা, আর সহরে নইলে তার চিকিৎসা হইবে না বলা, ঠাউরে দেখত দুই-ই এক কথা। এখন একবার ভাবিয়া দেখ—পাড়াগাঁয়ে বরফ নৈলে সত্য সত্যই কি রক্ত-ভেদের চিকিৎসা হয় না? হয় না এমন নয়; একটু যুক্তি করিলেই হয়। অন্ত্রের ভিতর

বরফের জলের পিচ্‌কিরি করিতে বলিছি। বরফের জলের মত ঠাণ্ডা জল কি পাড়াগাঁয়ে মিলাইতে পারা যায় না? যায়। কেমন করিয়া মিলাইতে পারা যায়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

• পাঁচ ছটাক নিশেদল আর পাঁচ ছটাক শোরা, আলাদা আলাদা পাত্রে বেশ করিয়া গুঁড়ো করিয়া একটা মাল্‌শায় রাখ। তার পর এক সের জল মাল্‌শায় ঢালিয়া দাও। তিন পোওয়া কি এক সের জল ধরে, কাঁসার কি পিতলের এমন একটী ফেরোয় জল পুরিয়া সেই ফেরোটী সেই মাল্‌শার জলে বসাইয়া রাখ। খানিক পরেই ফেরোর জল বরফের জলের মত ঠাণ্ডা হবে। রোগীর অন্ত্রের ভিতর সেই ঠাণ্ডা জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, বরফের জল পিচ্‌কিরি করিয়া দেওয়ার যে ফল, তা প্রায় হয়। মাল্‌শার বদলে ছোট একটা বগুনোয় কি জামবাটীতে নিশেদল, শোরা আর জল রাখিয়া, সেই বগুনো কি জামবাটী যদি রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দাও, তবে ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলিতে করিয়া বরফ বসাইবার ফল পাবে। বগুনো কি জামবাটী ঈষাঙ্গার তুলিয়া ধরিবে, তা হইলে পেটের উপর ওর সব চাপটা লাগিবে না। পেটের উপর ঠাণ্ডা লাগানই না দরকার।

স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গ বলিয়া এখানে রক্ত-ভেদের কথা বলিলাম। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্ না, আর যে উপসর্গই কেন থাক না, কুইনাইন্ দিতে কখনও ভুলিও না, কি ইতস্ততঃ করিও না। ফল কথা, ম্যালেরিয়া-জ্বরে কোনও উপসর্গ মানিবে না। জ্বর ছাড়িলে, কি জ্বর কমিলে, উপসর্গের অসুদ আর কুইনাইন্ একত্র দিবে। রক্ত-ভেদেরও চিকিৎসার বেলায় যেন এ সব কথা মনে থাকে।

৭। বমি———আসল রোগের চেয়ে উপসর্গ লইয়া, চিকিৎসককে অনেক জায়গায় বেশী নাকানী চোকানী খাইতে হয়। বমির বেলায় এ কথাটী যেমন খাটে, আর কোন উপসর্গের বেলায় তেমন খাটে কি না বলিতে পারি না। বমি অনেক রোগের লক্ষণ। এই জন্যে, এখানে বমির কথা এত বিশেষ করিয়া বলিলাম। কোন্ রোগে কি রকম বমি হয়, আর বমির ভাব গতিকই বা কি রকম, বেশ জানা না থাকিলে অনেক সময় বমি থামান যায় না। বমি থামাইবার জন্যে কেবল হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়। কোন একটা উপসর্গ হঠাৎ উপস্থিত হইলে তা থামাইতে না পারা, আর তার জন্যে হাতড়াইয়া বেড়ান চিকিৎসকের পক্ষে কত কষ্ট

আর অপ্রতিভের বিষয়, যিনি ঠেকিয়াছেন কেবল তিনিই তা জানেন।

বমি দু রকম। আসল বমি আর শঙ্কার বমি। পেটের (পাকস্থলীর) নিজের উদ্দীপনার জন্যে যে বমি হয়, সে বমিকে আসল বমি বলে। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে ৫৪৬র পাতে তা বলিছি। শরীরের আর আর যন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে যে বমি হয়, সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। শঙ্কার বমিকে ডাক্তরেরা সিম্প্যাথেটিক্ বমিটিং বলেন। গর্ভ হইলে স্ত্রীলোকদের যে বমি হয়, সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। এখানে জরায়ুর উদ্দীপনা থেকেই বমি হয়। পেটের (পাকস্থলীর) সঙ্গে আর জরায়ুর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এ রকম ঘটে। জরায়ুর কথা ৪৮৯র পাতে বলিছি। কেবল জরায়ুরই সঙ্গে পেটের (পাকস্থলীর) যে এ রকম নিকট সম্বন্ধ আছে, তা নয়। আরও অনেক যন্ত্রের সঙ্গে পেটের এ রকম নিকট সম্বন্ধ আছে। আর আর সব যন্ত্রের চেয়ে মগজ (ব্রেইন্), হৃৎপিণ্ড (হার্ট), আর ফুস্কোরই সঙ্গে পেটের সম্বন্ধ বেশী নিকট। দড়ির টানা দিয়া দু পাঁচটা জিনিষ যেমন একত্র বাঁধিয়া রাখা যায়, একটী শিরের ডাল পালা দিয়া এই কয়টী যন্ত্র (মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুস্কো আর পেট)

তেমনি একত্র বাঁধা আছে। রাঙা রক্তের শির, কাল রক্তের শির, আর রসের শির, আগে কেবল এই তিন রকম শিরের কথা বলিছি। এখন যে শিরের কথা বলিলাম, এ আর এক রকম শির। এ শিরকে ডাক্তরেরা নর্ব্ব্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় স্নায়ু বলে। আর আর সব শিরের মত স্নায়ুও আমাদের শরীরের সব জায়গায় আছে। আগে যে তিন রকম শিরের কথা বলিছি, সে তিন রকম শিরই ফাঁপা। তাদের ভিতর দিয়া রক্ত আর রস চলা ফেরা করে। স্নায়ু ফাঁপা নয়; নিরেট। কাযেই, তার ভিতর দিয়া কোনও রকম রসই চলা ফেরা করিতে পারে না। আমরা এই স্নায়ুরই বলে চলা ফেরা করি। আমাদের শরীরের কোন জায়গা ছুঁইলে আমরা যে জানিতে পারি, তাও এই স্নায়ুর বলে জানিতে পারি। মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুস্কো আর পেট যে স্নায়ুর ডাল পালা দিয়া একত্র বাঁধা, সেই স্নায়ুকে ডাক্তরেরা নিয়ুমোগ্যাষ্ট্রিক্ নর্ব্ব্ বলেন। সুবিধা পাই ত এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। যাদের হাঁপ-কাশের ব্যামো আছে, আহারের একটু অত্যাচারেই তাদের হাঁপ চাগায়। এতে পেটের সঙ্গে আর ফুস্কোর সঙ্গে খুব নিকট সম্বন্ধের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়।

মগজ, ফুস্কো, যকৃত, (লিবর্) অন্ত্র (ইণ্টেস্টিন্স) মূত্রগ্রন্থি, মূত্রনলী, জরায়ু, আর ডিম্বকোষ, এই সব যন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে। এখানে যে কয়টী যন্ত্রের নাম করিলাম, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রনলী আর ডিম্বকোষ ছাড়া আর সব যন্ত্রের কথা এর আগেই এক রকম মোটামুটি বলিছি। মূত্র-গ্রন্থিকে ডাক্তরেরা কিড্নি বলেন। মূত্রগ্রন্থি দুটো। ডাইন কোঁকের ভিতর পিছন দিকে একটা থাকে, আর বাঁ কোঁকের ভিতর পিছন দিকে একটা থাকে। ওলাউঠার রোগীর ভেদ বমি বন্ধ হইয়া প্রস্রাব না হইলে, ডাক্তরেরা তার কোমরে রাইয়ের পলস্তরা (মাস্টার্ড প্লাস্টার) দিয়া থাকেন। রাইয়ের এই পলস্তরা তাঁরা ঠিক্ মূত্রগ্রন্থিরই উপর বসাইয়া থাকেন। রক্ত থেকে মূত তয়ের করাই মূত্রগ্রন্থির কায। এক একটী মূত্রগ্রন্থি থেকে এই মূত সরু একটী নলী দিয়া মূতের থলিতে গিয়া জমে। মূতের থলির কথা ৪৮৯র পাতে বলিছি। এই নলীকে ডাক্তরেরা ইয়ুরীটর্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় মূত্র-নলী বলে। জরায়ু (ইউটরস্) যেমন কেবল স্ত্রীলোকদেরই থাকে, ডিম্বকোষও তেমনি কেবল স্ত্রীলোকদেরই আছে। ডিম্বকোষ দুটো। জরায়ুর মাথার দু পাশে সরু সরু দুটী নলী দিয়া ডিম্বকোষ আট্কান থাকে।

ডিম্বকোষকে ডাক্তরেরা ওবারি বলেন। স্ত্রীলোক-দের মাসে মাসে যে ঋতু হইয়া থাকে, ডিম্বকোষের বলেই সে ঋতু হয়। পুরুষদের অণ্ড, সন্তান উৎ-পত্তির যেমন প্রধান যন্ত্র, স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষ, সন্তান উৎপত্তির তেমনি প্রধান যন্ত্র। তার পর বলি। এই মাত্র বলিছি, মগজ, ফুস্কো, যকৃত, অন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি, মূত্র-নলী, জরায়ু আর ডিম্বকোষ, এই সব যন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে। কিন্তু মগজ আর জরায়ু, এই দুটী যন্ত্রেরই উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি বেশীর ভাগ হয়। আর আর যন্ত্রের উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি তত হয় না। মগজ আর জরায়ুর বেশী রকম উদ্দীপনা হইলে শঙ্কার বমি হইতেই চায়। আর আর সব যন্ত্রের উদ্দীপ-নার বেলায় সে রকম নয়। শঙ্কার বমি হইতেও পারে, না হইতেও পারে। মগজ আর জরায়ু, এই দুটী যন্ত্রেরই উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি যে বেশীর ভাগ হইয়া থাকে, এখানে তার একটী পরিচয় দিই। সে পরিচয় আর কি? গর্ভ হইলে বমি হওয়া, আর মাথায় কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে বমি হওয়া—এই দুটী ঘটনাই তার পরিচয়। মাথায় কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে মগজ (মাথার ঘিলু, ব্রেইন) কাঁপিয়া উঠে। এই রকম

করিয়া মগজ কাঁপিয়া উঠাকে ডাক্তরেরা কংকশন্ অব্ দি ব্রেইন্ বলেন। মাথায় লাঠি মারিলে মগজ এই রকম করিয়া কাঁপিয়া উঠে। উচু থেকে নীচে জোরে মাথা পড়িলেও মগজ এই রকম করিয়া কাঁপিয়া উঠে। মগজ কাঁপিয়া উঠাই বল, আর নড়িয়া উঠাই বল, দুই-ই এক।

শঙ্কার বমির কথা এখানে বলিলাম। শঙ্কার ভেদের কথা ৫৬০ র পাতে বলিছি। কিন্তু শঙ্কা কথাটার মানে এখনও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই নাই। ধরিতে গেলে শঙ্কার মানে মোটামুটি এক রকম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পায়ের আঙুলে ফোড়া, পাচড়া, বা ঘা হইলে, কি কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে কুচ্‌কিতে ব্যথা হয়—কুচ্‌কির গুল্লি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা বলি, পায়ের আঙুলের শঙ্কায় কুচ্‌কিতে ব্যথা হইয়াছে—কুচ্‌কির গুল্লি আউরেছে। হাতের আঙুলে ফোড়া, পাচড়া, বা ঘা হইলে, কি কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে বগলে ব্যথা হয়—বগলের গুল্লি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা বলি, হাতের আঙুলের শঙ্কায় বগলে ব্যথা হইয়াছে—বগলের গুল্লি আউরেছে। পাচড়া হইয়া জ্বর হইলে বলি, পাচড়ার শঙ্কায় জ্বর হইয়াছে। ফোড়া হইয়া জ্বর

হইলে বলি, ফোড়ার শঙ্কায় জ্বর হইয়াছে। মোটা-মুটি জানিয়া রাখ, এক জায়গার অসুখ থেকে আর এক জায়গার যে অসুখ হয়, তাকে শঙ্কার অসুখ বলে।

এখানে শঙ্কার বমির একটী খুব সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ডাক্তর, বৈদ্য, হাকিম, সকলেই সেটী বেশ জানেন। কৃমি থাকার দরুণ অন্ত্রের উদ্দীপনা হইলে বমি হয়। কৃমির জন্যে বমি হয়, মেয়েরাও তা জনে। বেশী রকম কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও অন্ত্রের উদ্দীপনা হয়। সেই উদ্দীপনা থেকে বমি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। অন্ত্রের এমন সব উদ্দীপনা থেকে যখন বমি হয়, তখন অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির প্রদাহ হইলে, কি অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে ঘা হইলে বমি হইবে, আশ্চর্য্য কি? অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে ঘা হইয়া যে বমি হয়, রক্ত-আমাশার কথা বলিবার সময় সে বমির কথা বলিছি। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অন্ত্র কষিয়া ধরিলে বমি হয়। অন্ত্রবৃদ্ধিকে ডাক্তরেরা হর্ণিয়া বলেন। সুবিধা পাই ত অন্ত্রবৃদ্ধির কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

মূত্র-নলির ভিতর দিয়া পাতরি নামিবার সময় বমি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। পিত্ত-নলির ভিতর দিয়া পাতরি নামিবারও সময় বমি হইতে

পারে—হইয়াও থাকে। রক্ত থেকে মূত তয়ের করা যেমন মূত্রগ্রন্থির (কিড্‌নির) কায, রক্ত থেকে পিত্ত তয়ের করা তেমনি যকৃতের (লিবরের) কায। মূত্রগ্রন্থি থেকে মূত্র-নলি (ইয়ুরীটর) দিয়া মূত্র যেমন মূতের থলিতে গিয়া জমে, যকৃত থেকে পিত্ত-নলি দিয়া পিত্ত তেমনি পিত্তের থলিতে গিয়া জমে। পিত্ত-নলিকে ডাক্তরেরা গল-ডক্ট বলেন; পিত্তের থলিকে গল-ব্ল্যাডর্ বলেন। মূত থেকেও পাতরি তয়ের হয়; পিত্ত থেকেও পাতরি তয়ের হয়। মূত থেকে যে পাতরি তয়ের হয়, ডাক্তরেরা তাকে ইয়ুরিনারি ক্যাল্‌কুলস্ বলেন। পিত্ত থেকে যে পাতরি তয়ের হয়, তাঁরা তাকে বিলিয়ারি ক্যাল্‌কুলস্ বলেন। মূত্র-নলি দিয়া পাতরি নামিবারও সময় শূল-ব্যথার মত ব্যথা ধরে; পিত্ত-নলি দিয়া পাতরি নামিবারও সময় শূল-ব্যথার মত ব্যথা ধরে। শূল-ব্যথা খুব বেশী রকম ধরিলে যেমন বমি হয়, পাতরি নামিবারও সময় ব্যথার তাড়শে তেমনি বমি হয়।

অনেক রকম নূতন জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সেই রক্ত-দোষে বমি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেন্ট ফীবরের) বমি একটা উপসর্গ। যে জ্বর মোটেই ছাড়ে না, বা কমে না,

যে জ্বরে গায়ের তাত দিন রাতি সমান থাকে, সেই জ্বরেরই গোড়ায় বমি বেশী হয়। যে জ্বরে গায়ের তাত দিন রাতি সমান থাকে, সে জ্বরকে ডাক্তরেরা কণ্টিনিয়ুড ফীবর বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অবি-রাম-জ্বর বলে; আর সোজা বাঙ্গালায় এক-তাড়া জ্বর বলিতে পার। হাম-জ্বরের জ্বর এক-তাড়া জ্বর। এলো বসন্তের জ্বর এক-তাড়া জ্বর। হাম কি বসন্ত যে ক দিন না বাহির হয়, সে ক দিন জ্বর এক-তাড়াই থাকে। বসন্ত বাহির হইবার আগে যে জ্বর হয়, সে জ্বরের গোড়ায় বমি হইতেই চায়। হাম-জ্বরে বমি না হইতেও পারে। হাম-জ্বর আর এলো বসন্তের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

এর আগেই বলিছি, নিজ্ পেটের (পাকস্থলীর) উদ্দীপনা থেকে যে বমি হয়, তাকে আসল বমি বলে। যে কারণেই হোক্, পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির কোন রকম উদ্দীপনা হইলেই বমি হয়। আর আর উদ্দীপনার কথা ছাড়িয়া দেও, খুব বেশী খাইলেও বমি হয়। তাতেই বলি, কত কড়া অসুদই আছে—কত বিষই আছে, যা পেটে পড়িলে পেটের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণের) উদ্দীপনা হয়—কোন কোন জায়গায় প্রদাহও হয়। সেই উদ্দীপনা থেকে, আর সেই প্রদাহ

থেকে বমি হয়। উদ্দীপনার কথা ৫৪৬র পাতে বলিছি। প্রদাহের কথা ২৪৮র পাতে বলিছি। উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলেই প্রদাহ হয়। উদ্দীপনার বাড়াবাড়িকেই প্রদাহ বলে। কোন কোন বিষ খাইলে যে বমি হয়, তার একটী সহজ দৃষ্টান্ত দিই। শেঁকো বিষ (আর্সেনিক্) খাইলে বমি হয়। শেঁকো বিষ খাইলে বমিও হয়, ভেদ্ও হয়। শেঁকো বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে বমি হয়; আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে ভেদ হয়। শেঁকো বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ত উদ্দীপনা হয়ই; অন্ত্রেরও শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা হয়।

গিয়া দেখিলে রোগীর বমি হইতেছে। এখন কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে, আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে। এটী আগে ঠিক্ করা চাই। এ ঠিক্ করিতে না পারিলে, রোগীর বমি থামাইতে পারিবে না; তার আত্মীয় স্বজনের কাছে নিশ্চয়ই অপ্রতিভ হইবে। আসল বমিতে আর শঙ্কার বমিতে ঢের তফাত্। কিসে কিসে তফাত, এখানে এক দুই করিয়া তা লিখিয়া

দিলাম। ডাইনে বাঁয় দুটী সারি করিয়া লিখিয়া দিলাম। বাঁয়ের সেরে আসল বমির কথা লেখা থাকিল। ডাইনের সেরে শঙ্কার বমির কথা লেখা থাকিল। এক দুয়ের দাগ ধরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বেশ ঠাউরে ঠাউরে খতিয়ে দেখিলে, দু রকম বমির তফাত বেশ বুঝিতে পারিবে। কিসে কিসে তফাত, যদি বেশ মনে করিয়া রাখিতে পার, তবে আসল বমি কি শঙ্কার বমি ধরা করিতে কখনই ঠকিবে না—বমি থামাইতে পারিলে না বলিয়া কখনও অপ্রতিভও হইবে না।

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
১। বমি হইবার আগে গা ন্যাকার ন্যাকার করে। বমি হইয়া গেলেই গা ন্যাকার ন্যকার সারিয়া যায়। কোন কোন জায়গায়, বমি হওয়ার পর কেবল খানিক ক্ষণ গা ন্যাকার ন্যাকার থাকে না। তার পর আবার গা ন্যাকার ন্যাকার আরম্ভ হয়। যাই	১। বমি হইবার আগে মোটেই গা ন্যাকার ন্যাকার করে না। বমি হইয়া পেট খালি হইয়া গেলেও অকি আর ওয়াক্ উঠিতে থাকে। জলই হোক্, দুধই হোক্, আর যাই হোক্, পেটে পড়িবা মাত্রই তা বমি হইয়া যায়। রোগী নড়িলে চড়িলেও তার বমি হয়।

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
হোক্, আসল বমিতে বমি হওয়ার পরই গা ন্যাকার ন্যাকার সারে। আসল বমিতে, বমি হইবার আগে গা ন্যাকার ন্যাকারই থাক, মাথা-ঘোরাই থাক, আর মাথা-ধরাই থাক, বমি হওয়ার পরই সে সব অসুখ হয় একবারেই সারিয়া যায়, নয় খুবই কম হয়।	
২। পেটের উপর আর যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে। আঙুলের উপর আঙুল দিয়া কেমন করিয়া ঘা দিতে হয়, আর কোন যন্ত্রে ব্যথা হইলে তা কেমন করিয়া ঠিক্ করিতে হয়, ১১৩—১১৪র পাতে তা বলিছি। পেটের উপর, কি যকৃতের উপর	২। পেটের উপর কি যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে না। পেটের উপর কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর অকিও উঠে না —ওয়াকও উঠে না। চাপ দিলে তার কোন অসুখই হয় না।

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
চাপ দিলে রোগীর অকি উঠে—ওয়াক উঠে।	
৩। রোগী যা বমি করে, তা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে আসল বমিতে আধ-হজম আহার, পিত্তি আর দুর্গন্ধ রস দেখিতে পাবে। কখনও টক জল, পূয বা রক্ত দেখিতে পাবে।	৩। রোগী যা খাইয়াছিল, শঙ্কার বমিতে তা বজনিশ্ উঠিয়া পড়ে। হজম হওয়ার এক আধটু চিহ্নও পাওয়া যায় না। রোগী গাঁজলা গাঁজলা শ্লেষ্মা বমি করে। শঙ্কার বমিতে পূয কি রক্ত কখনও থাকে না। কখন বা খুব বেশী পিত্তি উঠে, কখন বা কেবল নামে মাত্র পিত্তি উঠে।
৪। আসল বমিতে খিদে বা খাইবার ইচ্ছা মোটেই থাকে না। এমন কি, খাইবার নামে বমি আসে।	৪। শঙ্কার বমিতে খিদে থাকে। এমন কি, বমির পরই খাইবার ইচ্ছা হয়। তবেই দেখ, খাইবার নামে ত বমি আসেই না, বরং তার বিপরীত।
৫। আসল বমিতে	৫। শঙ্কার বমিতে

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
জিব অপরিষ্কার হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয়। চকের রং প্রায়ই একটু হল্‌দে হল্‌দে হয়। বমির পর তবে মাথা ধরে।	জিব পরিষ্কার থাকে। মুখে দুর্গন্ধ থাকে না। চক হয় বেশ পরিষ্কার থাকে, নয় অল্প রাঙা হয়। বমির আগে মাথা ধরে।
৬। আসল বমির মাথা-ধরায় কপাল ব্যথা করে। চব্বিশ ঘণ্টার বেশী মাথা-ধরা থাকে না। বমির পর প্রায়ই মাথা-ধরা সারিয়া যায়।	৬। শঙ্কার বমিতে মাথা-ধরা খুবই বেশী হয়। মাথার খাবরি আর পিছন দিক্ ব্যথা করে। মাথা-ধরা অনেক দিন ধরিয়া নিয়ত থা-কিতে পারে। আবার চাই কি, মাথা-ধরা মোটেই না থাকিতে পারে।
৭। আসল বমিতে পেটের কামড় থাকে। দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে। পেট নাবে। মল পাত্‌লা হয়, আর কাদার যেমন রং, তেম্‌নি রং হয়।	৭। শঙ্কার বমিতে পে-টের কামড়ের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে না। পেট ত নাবেই না, তার বিপরীত কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকে। যেখানে

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
	কোষ্ঠ-বদ্ধ না থাকে, সেখানে রোগীর সহজ বাহ্যে হয়। মলের বেশ আঁইট দেখা যায়।
৮। আসল বমিতে রোগীকে অনেক চেষ্টা করিয়া বমি করিতে হয়। বমি করিবার আগে অনেক বার ওয়াক্ তুলিতে হয়, মুখ দিয়া ঢের জল উঠে, ছেপ উঠে, লাল পড়ে। বমির পর রোগী যেন নেতিয়ে পড়ে।	৮। শঙ্কার বমিতে রোগীকে চেষ্টা করিয়া বমি করিতে হয় না। বমি যেন আপনিই হয়। মুখ দিয়ে জলও উঠে না, ছেপও উঠে না। বমির পর রোগী নেতিয়েও পড়ে না।
৯। আসল বমিতে নাড়ীর খুব বেগ হয়, আর নাড়ী দুর্ব্বল হয়।	৯। শঙ্কার বমিতে নাড়ীর বেগও হয় না, নাড়ী দুর্ব্বলও হয় না। হাত ধরিয়া বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিলে নাড়ী যেন শক্ত শক্ত মালুম হয়।
১০। আসল বমিতে	১০। শঙ্কার বমিতে

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
কেবল উপর-পেটেই রাইয়ের পলস্তরা (মষ্টার্ড প্লাষ্টর) বা বেলস্তরা দিলে বমি বন্ধ হয়। উপর-পেটকে ডাক্তরেরা এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম্ বলেন। উপর-পেটের ঊর্দ্ধ সীমা বুকের কড়া।	কেবল ঘাড়েই রাইয়ের পলস্তারা বা বেলস্তরা বসাইলে বমি বন্ধ হয়।
১১। প্রায়ই ভোর ৪টের সময় আসল বমির বাড়াবাড়ি হয়। যকৃতের (লিবরের) ব্যামোতে এই নিয়মটী সব চেয়ে বেশী দেখা যায়।	১১। শঙ্কার বমির বাড়াবাড়ি প্রায়ই বেলা ৭টার সময় দেখা যায়।

আসল বমিতে আর শঙ্কার বমিতে যে তফাত, এক রকম মোটামুটি তা বলিলাম। এই তফাত গুলি যদি বেশ ঠাউরে ঠাউরে মনে করিয়া রাখ, আর রোগীর কাছে বসিয়া এক এক করিয়া মিলা-ইয়া লও, তবে রোগীর আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে, সহজেই ঠিক্ করিতে পারিবে। তার পর এখন বমির চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা—এর আগেই বলিছি, রোগীর আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে, যদি ঠিক্ করিতে না পার, তবে সাত দিক্ হাতড়াইয়াও বমি থামাইতে পারিবে না। পিত্ত-নলির (গল-ডক্টের) ভিতর দিয়া পাত্রি নামিতেছে বলিয়া রোগীর শূল-ব্যথার মত ব্যথা ধরিয়াছে, আর সেই ব্যথার তাড়শে তার বমি হইতেছে। তুমি তা ঠিক্ করিতে না পারিয়া বমি থামাইবার জন্যে তার উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তারা (মষ্টার্ড প্লাষ্টর) বসাইয়া দিলে, বরফ খাইতে দিলে, সোডা য়্যাসিড্ খাওয়াইলে, অস্থদের পুথিতে বমির যত অস্থদ লেখা আছে, এক এক করিয়া সব দিলে, কিন্তু বমির কিছুই করিতে পারিলে না। কিছু ত করিতে পারিবেই না; করিতে না পারিবারই কথা বটে। ব্যথার তাড়শে বমি হইতেছে, পেট ঠাণ্ডা করিলে কি সে বমি থামে? এক বারে যদি দু গ্রেন্ আফিং খাওয়াইয়া দেও, তবে ব্যথাও নরম পড়ে, বমিও থামে। আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি ব্যথা নরম না পড়ে, তবে ফের দু গ্রেন্ আফিং খাওয়াইয়া দিবে। অনেক জায়গায় পুরো মাত্রায় আফিং এক বার দিলেই কায হয়। বড়ি করিয়া আফিং খাওয়াইয়া দিলে উঠিয়া পড়ে না। বড়ি করিয়া আফিং খাওয়া-

ইয়া দেওয়ারও যে ফল, গুহ্যদ্বারের মধ্যে আফি-ঙের আরকের (লডেনমের) পিচ্‌কিরি দেওয়ারও সেই ফল। কত খানি লডেনম্ কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে হয়, ১১৬—১১৭র পাতে তা বলিছি। তবেই দেখ, বমির কারণ ঠিক্ করিতে পারাই সব। অন্ত্রের ভিতর কৃমি আছে বলিয়া বমি হইতেছে, গা ন্যাকার ন্যাকার করিতেছে, অকি হইতেছে, কাঠ-বমি হইতেছে। তুমি তা ঠাউরাতে না পারিয়া, বুঝিতে না পারিয়া, বমি থামাইবার জন্যে কতই চেষ্টা করিলে, কিন্তু কিছুতেই বমি থামাইতে পারিলে না। তুমি বমি থামাইতে পা-রিলে না বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা আর এক জন চিকিৎসককে ডাকিলেন। নূতন চিকিৎসক আসিয়া রোগীর সব পরিচয় লইলেন, আর তার অবস্থা বেশ ঠাউরে দেখিলেন। বমির কারণ ঠিক্ করিয়া তিনি তোমার সব প্রেস্কৃপ্‌শন্ (ব্যবস্থা পত্র) দেখিতে চাইলেন। তোমার প্রেস্কৃপ্‌শনে কৃমির অসুদ একটীও লেখা নাই। এতেই তুমি তাঁর কাছে অপ্রতিভ হইলে। রোগীকে তিনি কৃমির অসুদ দিলেন। কৃমি সব নামিয়া পড়িল; রোগী-রও বমি থামিয়া গেল। তাতেই বলিতেছি, বমির কারণ ঠিক্ করিতে পারাই সব। শুদ্ধ বমি বলিয়া

কেন? এ কথাটা সব রোগেরই বেলায় সমান খাটে। রোগ চিনিতে না পারিলে, রোগের কারণ ঠিক্ করিতে না পারিলে তার চিকিৎসাই হয় না। সবিরাম-জ্বরে কি স্বল্পবিরাম-জ্বরে যে বমি হয়, জ্বরের সঙ্গে সে বমির বেশ একটা সম্বন্ধ আছে। সবিরাম-জ্বরে জ্বর আসিলে বমি আরম্ভ হয়। অনেক জায়গায়, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই বমি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বর ছাড়িয়া গেলে বমি থামিয়া যায়। স্বল্প-বিরাম-জ্বরে যতক্ষণ জ্বর কম থাকে, ততক্ষণ বমিও কম হয়। জ্বরের প্রকোপ হইলে বমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। এতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সবিরাম-জ্বরে জ্বর আসা বন্ধ করিতে পারিলেই বমিও বন্ধ হয়; আর স্বল্পবিরাম-জ্বরে জ্বরের প্রকোপ হইতে না দিলে বমিরও আর বাড়াবাড়ি হয় না। তাতেই বলি, ধরিতে গেলে জ্বরের বমির আসল অসুদই কুইনাইন্। এখানে বমির কারণই জ্বর। সে কারণ দূর করিবার তোমার কেবল একটা অসুদই আছে। সে অসুদ আর কি? কুইনাইন্। তবে বমির বাড়াবাড়ির সময় রোগীর কষ্ট ঘুচাইবার জন্যে আর কিছু অসুদ বিসুদ দেওয়া চাই। কাচের দুটি গ্লাসে এক ছটাক করিয়া চিনি-পানা কি মিছুরি-পানা লও। একটা গ্লাসে ৩০ গ্রেন্ বাইকার্ব্বণেট্ অব্

সোডা ঢালিয়া দেও। আর একটী গ্লাসে ২৫ গ্রেন্ টার্ট্যারিক য়্যাসিড ঢালিয়া দেও। টার্ট্যারিক্ য়্যাসিড্ যদি আগে গুঁড়ো করা না থাকে, তবে গুঁড়ো করিয়া লইবে। সোডা আর টার্ট্যারিক্ য়্যাসিড্ দুই গ্লাসের জলে বেশ গুলিয়া গেলে, বাঁ হাতে করিয়া একটী গ্লাস মুখের কাছে আন, আর ডাইন হাতে করিয়া আর একটী গ্লাসের জল বাঁ হাতের গ্লাসে ঢালিয়া দেও। ঢালিয়া দিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ হাতের গ্লাসের জল ফোঁস করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। ফুটিয়া উঠিতেই রোগীকে তা চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিতে বলিবে। এই যে অসুদ খাওয়াইয়া দিলে, ডাক্তরেরা একে এফর্ব্বেসিং ড্রাফ্ট বলেন। বাইকার্ব্বণেট অব্ সোডা আর টার্ট্যারিক্ য়্যাসিড্‌কে সোজাসুজি সোডা-য়্যাসিড্ বলিলেই চলে। আমরাও সোজাসুজি সোডা-য়্যাসিড্ই বলিয়া থাকি। অমুকের জ্বর হইয়াছে, সে কেবল বমি করিতেছে। বার দুই সোডা-য়্যাসিড্ খাওয়াইয়া দিই; বমি এখনই থামিয়া যাবে। আজ্ কাল্ গৃহস্থেরাও নিজে নিজে এ রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ফলে, সোডা-য়্যাসিড্ কথাটা খুবই চলিত হইয়াছে। সোডা-য়্যাসিড্ খাইলে বমি থামে, তাও অনেকে বেশ জানিতে পারিয়াছেন। এই জন্যে, অনেক জায়গায় সোডা-য়্যাসিড়

খাইবার বা খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিতে ডাক্তারের দরকার হয় না। সোডা-য়্যাসিড্ একবার খাইলেই যে বমি থামিয়া যায়, তা নয়। কোন জায়গায় একবার খাইলেই কাজ হয়। কোন জায়গায় দু বারও খাইতে হয়, কোন জায়গায় আবার তিন চারি বারও খাইতে হয়। যাই হোক্, জ্বরে যে বমি হয়, সোডা-য়্যাসিডে সে বমি যেমন সারে, তেমন আর কোনও অষুদে নয়। সোডা-য়্যাসিডে বমি সারে বলিলে কি বুঝায়? ৩০ গ্রেন্ বাইকার্ব্বনেট্ অব সোডা, আর ২৫ গ্রেন্ টার্ট্যারিক্ য়্যাসিড্, চিনি-পানা কি মিস্‌রি-পানায় ঐ রকম আলাদা আলাদা করিয়া গুলিয়া একত্র মিশাইয়া ফুটিয়া উঠিতেই তা খাওয়াইয়া দিলে বমি সারে—এই বুঝায়। সোডা-য়্যাসিড্ খাইবার জন্যে কাচের গ্লাস ব্যবহার করিতে বলিছি। পাড়াগাঁয়ে সব জায়গায় কাচের গ্লাস পাওয়া যায় না। পাড়াগাঁয়ে কাচের গ্লাসের ব্যবহার খুবই কম; পাড়াগাঁয়ে কাচের গ্লাস অনেকে দেখেনও নাই। কাচের গ্লাস নইলে যে সোডা-য়্যাসিড্ খাওয়া হয় না, তা নয়। কাচের গ্লাসের বদলে পাথরের বাটী ব্যবহার করিলেই হইতে পারে।

বরফের টুক্‌রো খাইলেও পেট বেশ ঠাণ্ডা হয়,

আর বমি থামিয়া যায়। বরফের টুক্‌রো মুখে রাখিয়া সহজে গিলিবার মত সে গুলি ছোট ছোট হইয়া গেলে গিলিয়া ফেলিবে। খানিক ক্ষণ ধরিয়া বরফের টুক্‌রো এই রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলে বমি থামিয়া যায়। বরফের টুক্‌রো পেটে গিয়া গলিলে, পেটের উদ্দীপনা শীঘ্রই দূর হয়। পেটের উদ্দীপনা গেলেই বমি থামিয়া যায়। উদ্দী-পনা কি— উদ্দীপনা কাকে বলে, এর আগে অনেক বার বলিছি। পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়া যায় না। কাজেই বরফের ব্যবস্থা সেখানে চলে না।

বমি থামাইবার আর একটী ভাল অসুদ আছে। এক ফোটা করিয়া বাইনম্‌ ইপেকা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দেও, তবে বমি, অকি, ওয়াক্‌-উঠা, গা ন্যাকার ন্যাকার শীঘ্রই সারিয়া যায়। এক ফোটা করিয়া বাইনম্‌ ইপেকা ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে। এ ছাড়া, যখন গা ন্যাকার ন্যাকার করিবে, অকি উঠিবে, ওয়াক্‌ আসিবে, কি বমির চেষ্টা হইবে, তখনই এক ফোটা বাইনম্‌ ইপেকা খাইতে দিবে। খুব একটু খানি জলের সঙ্গে বাইনম্‌ ইপেকা খাওয়া চাই। নৈলে জল বেশী হইলে উঠিয়া পড়িবে। এক এক বারে এক ড্রামের বেশী জল না খাইলে ভাল হয়। কতটুকু জলে ক ফোটা বাইনম্‌ ইপেকা

কি রকম করিয়া খাইতে দিবে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

বাইনম্ ইপেকা	২৪ ফোটা
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	৩ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ২৪টী দাগ কাটিয়া দেও। যত ক্ষণ বমি না থামিবে, এক এক দাগ খাইতে বলিবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাড়া আর কখন্ কখন্ খাইতে দিবে, এই মাত্র তা বলিছি।

এ সব অসুদ দিয়া যদি বমি বেশ থামাইতে না পার, তবে রোগীর উপর-পেটে রাইয়ের ছোট এক খানি পলস্তরা (মষ্টার্ড প্লাষ্টর) বসাইয়া দিবে। বুকের কড়া আর নাইয়ের ৪। ৫ আঙুল উপর, এই দুটী সীমার মাঝখানের জায়গাকে উপর-পেট বলে। উপর-পেটকে ডাক্তরেরা এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম্ বলেন। রাইয়ের পলস্তরা ঠিক্ এই জায়গায় বসাইয়া দিবে। রাই (মষ্টার্ড) বেশ টাট্কা হওয়া চাই। অনেক দিনের পুরাণ রাইতে তেমন কাজ হয় না। পুরাণ রাইতে জ্বালাও ধরে না, বমিও থামে না। রাইয়ের বেশ তেজ আছে, কি না, কাক্ খুলিয়া রাইয়ের শিশি শুঁকিয়া দেখিলেই তা জানিতে পারা যায়।

নাকে যদি খুব ঝাঁজ লাগে, তবে সে রাইয়ের পলস্তরায় উপকার হইবে, ঠিক্ করিবে। রাইয়ের পলস্তরা যদি খুব তেজাল করিতে চাও, তবে পলস্তরা তয়ের করিবার সময় তাতে ফোটা কতক য়্যাসীটিক্ য়্যাসিড্ দিবে। পলস্তরায় খুব জ্বালা না ধরিলে কাজ হয় না। একটু জ্বালা ধরিতেই রোগীর কথা শুনিয়া যদি পলস্তরা উঠাইয়া ফেল, তবে তাকে তোমার কেবল কষ্ট দেওয়াই সার হবে। এই জন্যে, রোগী যতই কেন আর্ত্তনাদ করুক না, আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পলস্তরা খান বসাইয়া রাখা চাই-ই। তার পর, পলস্তরা উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর, গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া পলস্তরা বসানর জায়গাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া দিবে। রোগীর পেটের উপর রাই যেন একটুও লাগিয়া না থাকে। তার পর অলিব্ অইলই হোক্, নারিকেল-তেলই হোক্, আর ঘিই হোক্, গরম করিয়া সেই জায়গায় বেশ করিয়া লাগাইয়া দিবে। পলস্তরা উঠাইয়া লইলেও খানিক ক্ষণ জ্বালা থাকে। ঘি কি তেল গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে জ্বালাটা শীঘ্রই থামিয়া যায়।

সোডা-য়্যাসিড্ খাইলে, বরফের টুক্রো ঐ রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলে, আর এক

ফোটা করিয়া বাইনম্ ইপেকা ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাইলে ১০০র মধ্যে ৯০ জায়গায় আসল বমি থামিয়া যায়। বমি থামাইবার জন্যে, সব জায়গাতেই যে এ তিন রকম উপায়ই করা চাই বা করিতে হয়, তা নয়। কোন জায়গায় শুদু সোডা-য়্যাসিডেই বমি সারে। কোন জায়গায় শুদু বরফের টুক্‌রো ঐ রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলেই বমি ভাল হয়। কোন জায়গায় কেবল রাইয়ের পলস্তরাতেই বমি থামিয়া যায়। আবার কোন কোন জায়গায় বমি থামাইবার জন্যে এ কয় রকম উপায়ই করিতে হয়। যেখানে এ কয় রকম উপায় করিয়াও বমি থামাইতে না পারিবে, সেখানে কি করিবে? সেখানে আর একটী উপায় করিবে। সে উপায় আর কি? বেলস্তরা বসান। রাইয়ের পলস্তরা যে জায়গায় বসাইয়াছিলে, বেলস্তরাও ঠিক্ সেই জায়গায় বসাইয়া দিবে। যকৃতের (লিবরের) সঙ্গে আর পেটের (পাকস্থলীর) সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ যে, একটীর উদ্দীপনা হইলে আর একটীর উদ্দীপনা তার সঙ্গে সঙ্গে হয়। ফল কথা, আসল বমিতে পেটের উদ্দীপনা আর যকৃতের উদ্দীপনা, দুই উদ্দীপনাই এক সঙ্গে থাকে। তাতেই ৭১৫র পাতে বলিছি, আসল বমিতে পেটের উপর আর যকৃতের উপর ঘা দিলে

রোগীর ব্যথা লাগে। শঙ্কার বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে না। আসল বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর অকি উঠে—ওয়াক্ উঠে। শঙ্কার বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর অকিও উঠে না—ওয়াক্ও উঠে না। এই জন্যে, আসল বমি থামাইতে পেটেরও উদ্দীপনা দূর করা চাই—যকৃতেরও উদ্দীপনা দূর করা চাই। আর এই জন্যে, রাইয়ের পলস্তরাই হোক্, আর বেলস্তরাই হোক্, উপর-পেটে এমনি জুত বরাত করিয়া বসাইয়া দিবে যে, তার খানিকটে যেন যকৃ-তের (লিবরের) জায়গার উপরে আসিয়া পড়ে। ডাইন দিকে পাঁজরের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ি-লেই, যকৃতের জায়গার উপর তোমার রাইয়ের পল-স্তরা কি বেলস্তরা বসান হইল। ফল কথা, আসল বমিতে পেটের উদ্দীপনা আর যকৃতের উদ্দীপনা, দুই উদ্দীপনাই এক বারে দূর করা চাই—এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ কথাটা মনে না থাকিলে পদে পদে অপ্রতিভ হবে।

সাহেবদের দেশে আমাদের কাঁচ্-পোকার মত দেখিতে সুশ্রী এক রকম মাছি আছে।* সে মাছির এমনি তেজ যে, গায়ে বসিলেও ফোস্কা হয়।

বেলস্তরা সেই মাছি থেকে তয়ের হয়। বেলস্তরার কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। বেলস্তরার আরোকেও ফোস্কা হয়, বেলস্তরার পটিতেও ফোস্কা হয়। বেলস্তরার আরোককে ডাক্তরেরা লাইকর্ লিটী বলেন। বেলস্তরার পটিকে তাঁরা এম্প্লাষ্ট্রম্ লিটী বলেন। লাইকর্ লিটীর বদলে লাইকর ক্যান্থ্যারিডিস্ বলিলেও হয়। এম্প্লাষ্ট্রম্ লিটীর বদলে এম্প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থ্যারিডিস্ বলিলেও হয়। যে মাছি থেকে বেলস্তরা তয়ের হয়, লিটা আর ক্যান্থ্যারিডিস্—এ দুটীই সেই মাছির নাম। লাইকর লিটী ছাড়া বেলস্তরার আর একটী আরোক আছে। সে আরোককে ডাক্তরেরা লিনিমেণ্ট ক্যান্থ্যারিডিস্ বলেন। লাইকর লিটীর চেয়ে লিনিমেণ্ট ক্যান্থ্যারিডিসের তেজ ঢের বেশী। লাইকর লিটী অনেক বার লাগাইলে তবে ফোস্কা হয়। লিনিমেণ্ট ক্যান্থ্যারিডিস্ এক বার লাগাইলেই ফোস্কা হয়। যেখানে তড়ি ঘড়ি বেলস্তরার ফোস্কা উঠান দরকার, সেখানে লিনিমেণ্ট ক্যান্থ্যারিডিস্ লাগাইবে। তবে লিনিমেণ্ট ক্যান্থ্যারিডিস্ বেশ বুঝিয়া সুজিয়া ব্যবহার করা চাই। ডাক্তরেরা বেলস্তরার পটিই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। অষুদের দোকানে এম্প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থ্যারিডিস্ কিনিতে

পাওয়া যায়। এম্‌প্লাষ্ট্রম ক্যান্থ্যারেডিস্ থেকে গায়ে বসাইবার বেলস্তরার-পটি তয়ের করিয়া লইতে হয়। ডাক্তরেরা প্রেস্ক্রপ্‌শনে (ব্যবস্থাপত্রে) এম্‌-প্লাষ্ট্রম্ লেখেন। এম্‌প্লাষ্ট্রম্‌কে সোজা ইংরিজিতে প্লাষ্টর্ বলে। প্লাষ্টর্‌কে আমরা সোজাসুজি পল-স্তরা বলিয়া থাকি। সব রকম পলস্তরা কাগজের লম্বা ঠোঙার ভিতর পোরা থাকে। ঠোঙার দু মুখই আঁটা। বেলস্তরার পটি আড়ে দীঘে যত খানি হবে, আগে মাপিয়া লইবে। তার পর, সেই মাপে কাগজ কিম্বা খুব পুরু ন্যাকড়া কাটিয়া লইবে। তার পর, স্প্যাচুলার আগায় করিয়া খানিক এমপ্লা-ষ্ট্রম্ ক্যান্থ্যারিডিস্ লইয়া পিল্-টাইলের উপর বেশ করিয়া মাড়িবে। স্প্যাচুলার বদলে বাঁশের চেয়াড়ি ব্যবহার করিতে পার। আর পিল্-টাইলের বদলে থালা, পাথর কি পিঁড়ি ব্যবহার করিতে পার। স্প্যাচুলা আর পিল্-টাইলের কথা মেটিরিয়া মেডি-কায়, ডিস্‌পেনসরির সরঞ্জমের কথা বলিবার সময় বলিব। বার কতক এই রকম করিয়া মাড়িতেই এম্‌প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থ্যারেডিস্ মলমের মত বেশ নরম হইয়া যাবে। নরম হইয়া গেলে সেই স্প্যাচুলায় করিয়া কাগজের উপর কিম্বা খুব পুরু ন্যাকড়ার উপর বেশ সমান করিয়া লাগাইবে। এই তোমার

বেলস্তরার পটি তয়ের হইয়া গেল। বেলস্তরার এই পটি উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তরার জায়গায় ঐ রকম জুত বরাত করিয়া বসাইয়া দিবে। রাই-য়ের পলস্তরার খুব জ্বালা ধরিলে, আর চামড়া বেশ লাল হইয়া উঠিলে পর, সেই জায়গায় বেলস্তরার পটি বসাইলে বেলস্তরার ফোস্কা শীঘ্রই উঠে। পটি এক ঘণ্টার বেশী রাখিবার দরকার নাই। তার পরই পটি উঠাইয়া ফেলিবে। পটি উঠাইয়া সেই জায়গায়, ময়দারই হোক্ আর মসিনার খৈলেরই হোক্, গোটা কতক গরম গরম পুল্‌টিশ লাগাইবে। গরম গরম পুল্‌টিশে বেলস্তরার ফোস্কা খুব শীঘ্র উঠে। ফোস্কা বেশ উঠিলে কাঁচি দিয়া বেশ জুত বরাত করিয়া কাটিয়া ফোস্কার ছালটা সব উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর বেলস্তরার ঘায়ের মাপে খুব পুরু ন্যাকড়া কাটিয়া লইবে। সেই ন্যাকড়ার উপর পুরু করিয়া সিম্পল্ অইণ্টমেণ্ট লাগাইবে। সিম্পল্ অইণ্টমেণ্ট এক রকম মলম। ডিস্‌পেনসরিতে বা ভাল ইংরিজি অসুদের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। মলমকে ডাক্তরেরা অইণ্টমেণ্ট বলেন। মলমের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় লিখিব। তার পর, সেই মলমের পটির উপর এক গ্রেন্ মর্ফিয়া বেশ জুত বরাত করিয়া ছড়াইয়া দিবে। তার পর,

যে দিকে মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলে, সেই দিক্‌টে বেল-স্তরার ঘায়ের উপর বসাইয়া দিবে। মলমের পটি সরিয়া পড়িতে না পারে, এই জন্যে ন্যাকড়ার চৌড় ফালি দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। ন্যাকড়ার চৌড় ফালিকে ডাক্তরেরা ব্যাণ্ডেজ্ বলেন। মর্ফিয়া দেওয়া মলমের এই পটি বেলস্তরার ঘায়ের উপর বসাইয়া দিবার খানিক পরেই বমি বেশ থামিয়া যায়। মলমের পটি উঠাইয়া ফেলিবার জন্যে ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। পটি এক দিন এক রাত্তি রাখিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর বেলস্তরার ঘা শুকাইবার জন্যে শুদ্ধু সিম্পল্ অইণ্টমেণ্টের পটি লাগাইতে পার।

রাইয়ের পলস্তরা না বসাইয়া প্রথমেই যদি বেলস্তরার পটি বসাইয়া দেও, তবে সে পটি আট ঘণ্টা না রাখিলে ফোস্কা উঠে না। বমি থামাইতে অত দেরি কি সয়? এই জন্যে, রাইয়ের পলস্তরা উঠাইয়া ফেলিয়া সেই জায়গায় বেলস্তরার পটি বসান বেশ যুক্তি। রাইয়ের পলস্তরার জ্বালা, তার উপর বেলস্তরার জ্বালা! উপ্‌রো উপ্‌রি দুটো জ্বালা সৈতে হয় বটে। কিন্তু ৮।৯ ঘণ্টা বেলস্তরার পটির জ্বালা আর বমির কষ্ট সওয়ার চেয়ে, খানিক ক্ষণের জন্যে উপ্‌রো উপ্‌রি দুটো জ্বালা সওয়া ঢের ভাল।

বেলস্তরার ঘায়ের উপর ঐ রকম করিয়া মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলেও বমি থামে। আবার উপর-পেটের চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচকিরি করিয়া দিলেও বমি থামে। চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিবার যন্ত্রকে ডাক্তরেরা হাইপোডর্ম্মিক্ সিরিঞ্জ বলেন। এই যন্ত্রের কথা, আর চামড়ার নীচে কেমন করিয়া পিচ্কিরি করিতে হয়, ৯২—৯৫র পাতে তা বলিছি। ৬০৫র পাতে বলিছি, মর্ফিয়া দু রকম, য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া আর মিয়ুরিয়েট অব্ মর্ফিয়া। চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিবার জন্যে, মিয়ুরিয়েট অব্ মর্ফিয়ার চেয়ে য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া ভাল। কেন না, মিয়ুরিয়েট অব্ মর্ফিয়ার চেয়ে য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া গুলিতে কম জল লাগে। ৬ মিনিম্ চোওয়ান জলে ১গ্রেন্ য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া গোলে। কিন্তু ১ গ্রেন্ মিয়ুরিয়েট অব্ মর্ফিয়া গুলিতে ২০ মিনিম্ চোওয়ান জল লাগে। চোওয়ান জলকে ডাক্তরেরা ডিষ্টিল্ড ওয়াটর বলেন; ভাল বাঙ্গালায় পরিশ্রুত জল বলা যায়। সোজাসুজি চোওয়ান জলই বলিব। ৬ মিনিম্ চোওয়ান জলে ১ গ্রেন্ য়্যাসিটেট অব্ মর্ফিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া তার সিকি ভাগ, অর্থাৎ ঠিক্ দেড় মিনিম্, উপর-পেটের চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিয়া দিবে। তা হইলে সিকি $\frac{1}{8}$ গ্রেন্

য়্যাসিটেট অব্ মর্ফিয়া চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিয়া দেওয়া হবে। চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচ্‌কিরি করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি থামিয়া যায়। উপর-পেটের চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিলেও হয়; বাউতে যেখানে ইংরিজি টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিলেও হয়।

বেলস্তরার ঘায়ের উপর ঐ রকম করিয়া মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলেও বমি থামে; আবার উপর-পেটের চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও বমি থামে। এখন দেখ, এ দুয়ে তফাত কি। তফাত ঢের। এক রোগের দু রকম চিকিৎসা। দু রকম চিকিৎসারই ফল এক। সে দু রকম চিকিৎসার কোন্ রকম চিকিৎসা তুমি ভাল বল? যে চিকিৎসায় রোগীর কষ্ট কম, সেই চিকিৎসাই ভাল। কেন, তা কি আর বলিতে হবে? সোডা-য়্যাসিডে যদি বমি সারে, তবে কি রোগী রাইয়ের পলস্তরার নাম করিতে দেয়? অমুদ খাইলে, কি পটি দিলে যদি ফোড়া ভাল হয়, তবে কি রোগী অস্ত্রের নাম করিতে দেয়? কখনই না। বেঁধে মারে, সয় ভাল—সব রোগীরই কাছে এই কথা। চিকিৎসকদেরও যেন এ কথাটা সর্ব্বদা মনে থাকে। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। চামড়ার নীচে,

পিচ্‌কিরি করিবার যন্ত্র যাঁরা জুটাইতে না পারিবেন, বমি থামাইবার জন্যে, কাজে কাজেই, তাঁদের রোগীকে একটু কষ্ট সওয়াইতেই হবে।

পেটে অম্বল হইলে বমি হয়। চুণের জল, ম্যাগ্‌নীশিয়া, আর বিস্‌মথ্‌, সে বমির এই তিনটী খুব ভাল অসুদ। অম্বলের বমি থামাইবার জন্যে সোডা য়্যাসিডে সোডা বেশী করিয়া দিবে; আর চিনি-পানা কি মিছরি-পানার বদলে শুদু জল দিবে। কেন না, মিষ্টিতে অম্বল বাড়ে বৈ কমে না। সোডা য়্যাসিডে এক এক বারে ৩০ গ্রেন্ বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা, আর ২৫ গ্রেন্ টার্ট্যারিক্ য়্যাসিড্ লাগে। অম্বলের বমি থামাইবার জন্যে ৩০ গ্রেণের বদলে এক এক বারে ৪০ গ্রেন্ করিয়া বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা দিবে। চুণের জল দুধের সঙ্গে খাইতে হয়। তিন ভাগ দুধ আর এক ভাগ চুণের জল একত্র মিশাইবে। দুধ এক-বল্কা আর ঠাণ্ডা হওয়া চাই। চা-চামচের তিন চামচ এক-বল্কা দুধের সঙ্গে এক চা-চামচ চুণের জল মিশাইয়া, মাঝে মাঝে তারই এক চা-চামচ করিয়া খাইতে দিবে। পোনর মিনিট অন্তরও দিতে পার; বিশ মিনিট অন্তরও দিতে পার; আধ ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার। চা-চামচের বদলে ছোট ঝিনুক ব্যবহার করিতে

পায়। যদি বল, চুণের জল-মিশন এক-বক্কা দুধ বারে বারে এত টুকু করিয়া দিবার দরকার কি? দরকার একটু আধটু নয়—খুবই দরকার। অম্বুদই হোক্, আর পথ্যই হোক্, এক এক বারে খুব কম মাত্রায় না দিলে তাতে বমি বাড়ে বৈ কমে না। পেটে যা পড়িবে, তাতে পেট ভার হওয়া দূরে থাক্, পেটে কিছু পড়িল কি না, পেট নিজেও যেন তা না জানিতে পারে। বেশী কথা আর কি বলিব? বমির চিকিৎসায় সব চিকিৎসকেরই যেন এ কথাটা মনে থাকে। বমি থামাইবার জন্যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক ফোটা করিয়া বাইনম্ ইপেকা যে এক ড্রাম জলের সঙ্গে খাওয়াইতে বলিছি, তার কারণই এই। পেটের যে উদ্দীপনার জন্যে বমি হইতেছে, পেট ভার হইলে সে উদ্দীপনা যে বাড়িবে, তা বেশই বুঝা যাইতেছে।

চুণের জল কেমন করিয়া তয়ের করে? একটা বড় বোতলে আড়াই পোওয়া (দশ ছটাক) পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পূর। তার পর সেই জলে আধ কাঁচ্চা (দু ড্রাম) গুঁড়ো চুণ ঢালিয়া দেও। তার পর, কাক্ দিয়া বোতলের মুখ বেশ করিয়া আঁটিয়া দু তিন মিনিট ধরিয়া বোতলটা খুব ঝাঁকাও। তার পর, বোতলটা একটা নিনড় জায়গায় রাখিয়া দেও। ১২ ঘণ্টায়

পর বোতলের থিতন জল আর একটা বোতলে এমন স্থুত বরাত করিয়া ঢালিয়া লইবে যে, নীচে-কার চূণ যেন ঘুলাইয়া না উঠে। বোতলের থিতন জল সব যদি একবারে ঢালিয়া লইতে চেষ্টা কর, তবে নীচেকার চূণ ঘুলাইয়া উঠিবেই উঠিবে। এই জন্যে, বোতলের থিতন জল আর একটা বোতলে ঢালিবার সময় নীচেকার চূণ ঘুলাইয়া উঠিতেছে কি না, সে দিকে যেন খুব নজর থাকে। ঘুলাইয়া উঠিতেছে দেখিলেই, থিতন জল আর ঢালিবে না। চূণের জল যে বোতলে রাখিবে, কাক্ দিয়া সে বোতলটীর মুখ বেশ করিয়া আঁটিয়া রাখা চাই। চূণ যদি নির্ভাঁজ খাটি হয়, আর চূণের বোতলের মুখ কাক্ দিয়া খুব আঁটা থাকে, তবে সেই চূণ থেকে ঐ রকম করিয়া আরও চারি পাঁচ বার চূণের জল তয়ের করিয়া লইতে পার। চূণের জলের মাত্রা ৪ড্রাম (এক কাঁচ্চা) থেকে ৩ ঔন্স (দেড় ছটাক)। চূণের জল এক-বল্কা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। এক ঔন্স (আধ ছটাক) চূণের জলে প্রায় আধ গ্রেন চূণ আছে।

বমির যদি বাড়াবাড়ি না দেখ, তবে এক এক বারে ছটাক দেড়েক দুধের সঙ্গে আধ ছটাক (এক ঔন্স) করিয়া চূণের জল খাইতে দিতে পার।

পেটে অম্বল হইলে ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হইয়া থাকে। দুধ খাইয়া যে সব ছেলে ছানা ছানা দুধ তোলে, চূণের জল তাদের ভারি অসুদ। তাদের শুদু দুধ না দিয়া, চূণের জল-মিশন এক-বল্কা দুধ খাওয়াইলে তারা আর দুধ তোলে না। চূণের জলে পেটের অম্বল নষ্ট করে। এই জন্যে, চূণের জল-মিশন দুধ পেটে গিয়া ছানা বাঁধিতে পারে না। চারি ভাগ দুধের সঙ্গে এক ভাগ চূণের জল মিশাইয়া ছেলেদের খাইতে দিবে।

দাঁত উঠিবার সময়, দাঁত উঠিবার তাড়শে ছেলে-দের বমি হইয়া থাকে। বিস্‌মথ্ ছেলেদের সে রকম বমির ভারি অসুদ। এক গ্রেন্ থেকে তিন গ্রেন্ বিস্‌মথ্ একটু ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে দিতে পার। দাঁত উঠিবার তাড়শে ছেলে-দের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। শঙ্কার বমি কি—শঙ্কার বমি কাকে বলে, ৭০৫র পাতে তা বলিছি।

বিস্‌মথ্ জোওয়ান রোগিদেরও অম্বলের বমির বেশ অসুদ। ১৫ গ্রেন্ বিস্‌মথ্ আর ১৫ গ্রেন্ ম্যাগ্-নীশিয়া এক-বল্কা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে খাইলে পেটের অম্বলও নষ্ট হয়; পেটের উদ্দীপনাও দূর হয়। অম্বলেই পেটের উদ্দীপনা হয়। আর সেই

উদ্দীপনা থেকেই বমি হয়। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, এর আগে অনেক বার বলিছি।

আর্সেনিক্ (শেঁকো), মাতালদের বমির বড় অস্থুদ। মাতালদের বমি সকাল বেলা খালি পেটেই বেশী হইয়া থাকে। বমি খুব কমই হয়। বমির কেবল চেষ্টাই বেশী দেখা যায়। অকি আর ওয়াক তুলে তুলে তারা একবারে নেতিয়া পড়ে। আহার করিবার একটু আগে তারা যদি এক ফোটা করিয়া লাইকর আর্সেনিকেলিস্ (একটু জলের সঙ্গে) খায়, তবে তাদের সে রকম কষ্টের বমিও শীঘ্রই সারিয়া যায়। মাতালরা যা বমি করে, তার রং সচরচর সবুজই দেখা যায়। আর সেই বমিতে তাদের মুখ যেমন তিত হয়, তেমনি টক্ হইয়া যায়।

ক্রুয়েসোট্ বমির আর একটী খুব ভাল অস্থুদ। গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, ক্রুয়েসোটে সে বমিও ভাল হয়। জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইবার সময় অনেকের বমি হয়। ক্রুয়েসোটে সে বমিও সারে। পেটের ভিতরে ঘা হইলে যে বমি হয়, সে বমিও এতে ভাল হয়। পেটের ভিতর ঘায়ের কথা এর পর বলিব। আহারের পর কারু কারু পেট-ব্যথা করে। সে ব্যথায় সে একবারে অস্থির হইয়া পড়ে। ডাক্তরেরা সে ব্যথাকে

গ্যাষ্ট্রোডীনিয়া বলেন। গ্যাষ্ট্রোডীনিয়ার সোজা বাঙ্গালা পেট-ব্যথা। ক্রেয়েসোট্ এ রকম পেট-ব্যথারও খুব ভাল অস্থদ। ক্রেয়েসোটের মাত্রা—১ ফোটা থেকে ৫ ফোটা। ম্যাগ্নীশিয়ার সঙ্গে ক্রেয়ে-সোটের বড়ি তয়ের করিয়া খাইতে দিবে। প্রথম প্রথম এক ফোটার বেশী দিবার দরকার নাই। রোজ এক বার কি দু বারেরও বেশী দিবার দর-কার হয় না। হাত দিয়া ক্রেয়েসোটের বড়ি তয়ের করা হবে না। কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ গায়ে লাগিলে যেমন জ্বালা করে, আর সে জায়গাটা তখনই যেমন শাদা হইয়া যায়; ক্রেয়েসোট গায়ে লাগিলেও ঠিক্ তেমনি জ্বালা করে, আর সে জায়গাটা ঠিক্ তেমনি শাদা হইয়া যায়। এই জন্যে, গালে জল লইয়া ক্রেয়েসোটের বড়ি বেশ দ্রুত বরাত করিয়া গিলিয়া খাইতে বলিবে।

জ্বর জাড়ি থেকে উঠিয়া অনেক রোগীর আহারে রুচি থাকে না, খিদে হয় না, গা-ন্যাকার ন্যাকার করে, কখন কখন ন্যাকারও হয়। কলম্বো এমন সব রোগীর পেটের এ রকম উদ্দীপনায় একটী খুব ভাল অস্থদ। কলম্বো গাছড়া অস্থদ। সাহেবদের কলম্বো আর আমাদের গুলঞ্চ সমান। দুয়েরই সমান গুণ। এ সব রোগীকে কলম্বোর শিকড়ের

ক্বাথ দিলেই বেশী উপকার হয়। কলম্বোর শিক-ড়ের কাথকে ডাক্তরেরা ইন্‌ফিয়ুষণ কলম্বো বলেন। ইন্‌ফিয়ুষণ কলম্বোর মাত্রা—১ ঔন্স থেকে ২ ঔন্স, রোজ ৩ বার করিয়া খাইবে। গর্ভ হইলে মেয়ে-দের যে বমি হইয়া থাকে, ইন্‌ফিয়ুষণ কলম্বো সে বমিরও খুব ভাল অসুদ।

ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ বমির আর একটী খুব ভাল অসুদ। গুণে ক্রিয়েসোটের প্রায় সমানই বলিলে হয়। নির্ভাঁজ হাইড্রোসিয়্যা-নিক্ য়্যাসিড্ ভারি ভয়ানক বিষ। এই জন্যে, ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক্ য়্যাসিডও খুব সতর্ক আর সাবধান হইয়া ব্যবহার করিবে। ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক্ য়্যাসিডের মাত্রা ১ ফোটা থেকে ৩ ফোটা ; ৬ ফোটা পর্য্যন্তও দেওয়া যায়। কিন্তু হাইড্রোসিয়্যানিক্ য়্যাসিডের নামে যখন ডরাইতে হয়, তখন মাত্রা বেশী না দিয়া কম দেওয়াই ভাল। ইন্‌ফিয়ুষণ্ কলম্বোর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ডাইলিয়ুট্ হাইড্রোসিয়্যানিক্ য়্যাসিডে আরও বেশী উপকার হয়।

গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমির আর একটী খুব ভাল অসুদ আছে। সে অসুদটীর কথা এখনও বলি নাই। সে অসুদ আর

কি? কুঁচ্‌লের আরোক। কুঁচ্‌লের আরোককে ডাক্তরেরা টিংচর অব্ নক্স-বমিকা বলেন। আমি অনেক জায়গায় দেখিছি, টিংচর অব্ নক্স-বমিকা গর্ভবতী স্ত্রীদের বমির বড় চমৎকার অসুদ। টিংচর অব্ নক্স-বমিকা খুব কম মাত্রায় দিতে হয়। মাঝে মাঝে চা-চামচের এক চামচ ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে কেবল এক ফোটা করিয়া খাইলেই কাজ হয়। আর আর রকম বমি থামাইবার জন্যে বাইনম্ ইপেকা যে নিয়মে খাওয়াইতে বলিছি, টিংচর অব্ নক্স-বমিকাও ঠিক্ সেই নিয়মে খাইতে দিবে।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম বমির আর একটী ভাল অসুদ। কাঁচ্চা থানেক খুব ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে বিশ (২০) ফোটা করিয়া স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম মাঝে মাঝে খাইতে দিলে অনেক জায়গায় বমি বেশ থামিয়া যায়। বরফের জলের সঙ্গে দিতে পারিলে আরও বেশী উপকার হয়। ছোট ছেলেদের বমিতে এ অসুদটী বেশ খাটে।

১৮২ থেকে ১৯০র পাতে যে ছেলেটীর স্বল্প-বিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) চিকিৎসার কথা বলিছি, দাঁত উঠিবার সময় সে ছেলেটী আমাকে বড়ই ভোগাইয়াছিল। ছুতোয় নতায় তার তড়কা হইত। জ্বরের সঙ্গে তার তড়কা যেন একেবারে

গাঁথা থাকিত। জ্বরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তড়্‌কা আসিয়া উপস্থিত হইত। ১৮৩র পাতেও এ কথা বলিছি। দাঁত উঠিবার সময় যে সব ছেলের পেটের-ব্যামো হয়—বারে বারে পাতলা বাহ্যে হয়, তড়্‌কার ভয় তাদের খুবই কম। এ একটা সোজা-সুজি হিসাব জানিয়া রাখ। মাড়ি ফুঁড়িয়া দাঁত উঠিবার সময় মাড়ির শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সে উদ্দীপনা যদি অধো হইয়া যায়, তবেই মঙ্গল। সে উদ্দীপনা অধো হইয়াছে কি না, ছেলের পেটের-ব্যামোতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে উদ্দীপনা অধো না হইলে ছেলের পেটের-ব্যামো হয় না। এই জন্যে, দাঁত উঠিবার সময় ছেলেদের পেটের-ব্যামো, না বুঝিয়া সুজিয়া, হঠাৎ বন্ধ করিতে নাই। আর সে উদ্দীপনা অধো না হইয়া যদি ঊর্দ্ধ হয়, তবে বারে বারে পাতলা বাহ্যে না হইয়া, তার বদলে বারে বারে ছেলের বমি হয়, ছেলে বারে বারে ওয়াক তোলে—অকিং তোলে। ফল কথা, সে বমিতে শঙ্কার বমির সব পরিচয়ই পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ছেলে অস্থির হয়, চক্ষু আধ-বুজন্ত ভাবে ঝিমোয়, আর বারে বারে হাই তোলে। মাড়ি ফুঁড়িয়া দাঁত উঠিবার সময় শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হইয়া থাকে, ঊর্দ্ধ হইয়া সে

উদ্দীপনা মাথার মগজে (ব্রেণে) গেলে এই সব লক্ষণ দেখা দেয়। মাথার মগজের উদ্দীপনা সামান্য রকম হইলে এই সব লক্ষণ দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু মাথার মগজের উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলে শেষে তড়্কা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার সে ছেলে-টীর দাঁত উঠিবার সময় মাড়ির শ্লেষ্মা-ঝিল্লি ফোঁ-ড়ার দরুণ যে উদ্দীপনা, তা অধো না হইয়া বরাবরি ঊর্দ্ধ হইত। এই জন্যে, মাথার মগজের উদ্দীপনার ও সব লক্ষণেরও পরিচয় পাইতাম। মাথার মগজের উদ্দীপনাই ও সব লক্ষণের কারণ বলিয়া ছেলের মাথায় জল-পটি দিতাম; আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়মের সঙ্গে ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতাম। এই দুটী অসুদের কথা ৩৪০র পাতে বলিছি। মগজের উদ্দীপনা কমাইবার জন্যে, এই দুটী অসুদ ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতাম। বমি, অকি, বা ওয়াক-তোলা থামাইবার জন্যে ১ ফোটা করিয়া স্পিরিট ক্লোরো-ফর্ম্ম বরফের জলের সঙ্গে বারে বারে খাইতে দিতাম। দাঁত উঠার দরুণ যখন তার মগজের এই রকম উদ্দীনা হইত, তখনই এই রকম চিকিৎসা করিয়া তাকে ভাল করিতাম। বমির বাড়াবাড়ি থাকিতে তাকে নুন দেওয়া জল-য়্যারারুট ছাড়া

আর কিছুই দিতে দিতাম না। মাইয়ের দুধও খুব কম দিতে বলিতাম। দাঁত উঠার দরুণ মগজের উদ্দীপনা যেবারে এতে নিতান্তই না কমিত, সেবারে ছুরি দিয়া তার মাড়ি চিরিয়া দাঁত বাহির করিয়া দিতাম। দাঁত বাহির করিয়া দিতে পারিলেই তার বালাই সব চলিয়া যাইত। মাড়ির যদি বেশী নীচে দাঁত থাকে, তবে মাড়ি চিরিলে কোনও ফল হয় না; ছেলেকে কেবল কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র। কেন না, দু এক দিনে সে চেরার চিহ্নও থাকে না। এই জন্যে, চিরিবার আগে আঙুল দিয়া মাড়ি খুব ঠাউরে দেখিবে। আঙুলেব নীচে দাঁত বেশ মালুম হইলে তবে মাড়ি চিরিবে। যে অস্ত্র দিয়া ডাক্তরেরা মাড়ি চিরিয়া দেন, সে অস্ত্রকে তাঁরা গম্-ল্যান্সেট বলেন।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম ছোট ছেলেদের বমির যেমন অসুদ, একের নম্বর ব্রাণ্ডিও তাদের তেমনি অসুদ। চা-চামচের আধ চামচ (ছোট ঝিনুকের আধ ঝিনুক) ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে এক ফোটা স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম আর এক ফোটা ব্রাণ্ডি ১৫ মিনিট অন্তর, ২০ মিনিট অন্তর, আধ ঘণ্টা অন্তর, কি এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে ছোট ছেলেদের বমি দেখিতে দেখিতে থামিয়া যায়। এতে যে

কেবল বমিই থামে, তা নয়; পেট-নাবাও (ডায়া-রীয়াও) ভাল হয়; আবার ছেলে চাঙ্গা হইয়াও উঠে। তবেই দেখ, বারে বারে বমি করিয়াই হোক্, আর বারে বারে পাতলা বাহ্যে গিয়াই হোক্, যে ছেলে একবারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম আর ব্রাণ্ডি সে ছেলের জীবন।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম আর ব্রাণ্ডি জোওয়ান রোগিদেরও বমির কম অসুদ নয়। জোওয়ান রোগিদের পক্ষে স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্মের মাত্রা ২০ ফোটা; ব্রাণ্ডির মাত্রা ১ ড্রাম। ছ মাসের শিশুর পক্ষে দুই অসুদেরই মাত্রা ১ ফোটা।

বমির আরও ঢের অসুদ আছে। সে সব অসুদের কথা বলিতে গেলে এক খান মেটিরিয়া মেডিকাই লিখিয়া ফেলিতে হয়। সে সব অসুদের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব।

পথ্য—এর আগেই বলিছি, যে রোগীর বমি থামাইতে তোমাকে ডাকিবে, অসুদই হোক্ আর আহারই হোক্, তাকে এক এক বারে এত কম দিবে যে, পেটে গিয়া পড়িল কি না, পেটেও যেন তা ভাল না জানিতে পারে। বেশী আর কি বলিব। পেট ভার করে বা করিতে পারে, এমন

কোন আহারই তাকে দিবে না। চূণের জল-মিশন এক-বল্কা দুধ, নূন-দেওয়া জল-য়্যারারুট, খুবপাতলা যবের-মণ্ড (বার্লি ওয়াটর), কি বড় জোর, খুব পাতলা জল-সাগু—এই কয়টীর মধ্যে যেটীতে রোগীর ইচ্ছা, এক এক বারে খুব অল্প করিয়া তাকে সেইটী দিতে পার। খুব দুর্ব্বল রোগীকে ব্রাণ্ডির সঙ্গে মাংসের ক্বাথ একটু একটু দিতে পার।

অনেক জায়গায় শুদু দুর্গন্ধ শুঁকেই বমি হয়। যেখানে বমি না হয়, সেখানে নিয়ত কেবল গা ন্যাকার ন্যাকার করিতে থাকে। সুগন্ধ জিনিষ শুঁকিলে তেমনি অনেক জায়গায় বমি নিবারণ হয়—গা-ন্যাকার ন্যাকার ভাল হয়। বমি থামাই-বার সময় এ কথাটা যেন চিকিৎসদের মনে থাকে। অনেকেই জানেন, লেবুর পাতা শুঁকিলে অনেক জায়গায় গা-ন্যাকার ন্যাকার ভাল হইয়া যায়—কাজে কাজেই বমিও নিবারণ হয়। বমি নিবার-ণের জন্যে আমাদের বৈদ্যরা সার-চন্দন মাখান পরিষ্কার ন্যাকড়া শুঁকিতে দেন—শসা কাটিয়া শুঁকিতে দেন। শসার বেশ এক রকম শোঁদা শোঁদা গন্ধ। আতর, গোলাপ, ল্যাবেণ্ডর, ওডি-কলোঁ—এ সব সুগন্ধ জিনিষেও গা-ন্যাকার ন্যাকার ভাল হয়—বমি নিবারণ হয়।

বমির কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। এখন হিক্কির কথা বলি।

৮। **হিক্কি**——হিক্কিকে ডাক্তরেরা হিকপ্ বলেন। রোগের চেয়ে রোগের উপসর্গ লইয়া চিকিৎসককে অনেক জায়গায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। লোকে কথায় বলে, বড় শক্রুর হাতে নিস্তার আছে; কিন্তু পুন্কে শক্রুর হাতে নিস্তার নাই। হিক্কির বেলায় এ কথাটা খুবই খাটে। হিক্কিকে আমাদের বৈদ্যরা বড়ই ডরান্। এই জন্যে, হিক্কিকে তাঁরা যমের ভগিনী বলেন। হিক্কিকে যমের ভগিনী বলা বেশ মানায়। কেন না, কোন শক্ত রোগে হিক্কি উপসর্গ ঘটিলে রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয়। অনেক তরুণ (নূতন) রোগের শেষে হিক্কি আসিয়া উপস্থিত হয়। তার পর যমের ভগিনীরই হাতে রোগীর প্রাণ যায়। যে সব যন্ত্রে, বা যে সব যন্ত্রের বলে পরিপাক (হজম) হয়, সে সব যন্ত্রকে ভাল কথায় পাক-যন্ত্র বলে। পাক-যন্ত্র গুলিকে ডাক্তরেরা ডাইজেষ্টিব্ অর্গ্যান্স বলেন। পেট (পাকস্থলী), অন্ত্র, যকৃত (লিবর)—এ সবই পাক-যন্ত্র। হিক্কি এই সব পাক-যন্ত্রের উদ্দীপনার বা প্রদাহের একটী লক্ষণ। উদ্দীপনা কি—উদ্দী-

পনা কাকে বলে, ৫৪৬র পাতে তা বলিছি। প্রদাহ কি—প্রদাহ কাকে বলে, ২৪৮র পাতে তা বলিছি। পেটের উদ্দীপনা বা প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। অন্ত্রের উদ্দীপনা বা প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। যকৃ-তের উদ্দীপনা বা প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মূত্রগ্রন্থির ব্যামোতে হিক্কি সচরা-চরই ঘটে। মূত্রগ্রন্থিকে ডাক্তরেরা কিড্‌নি বলেন। মূত্রগ্রন্থির কথা ৭৭০র পাতে বলিছি। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অন্ত্র কষিয়া ধরিলে রোগীর, এমন কি, বিষ্ঠা পর্য্যন্ত বমি হয়। এ রকম বমির সঙ্গে হিক্কি হয়। কখন কখন গুল্মবায়ু রোগ থেকে হিক্কি হয়। গুল্ম-বায়ুকে ডাক্তরেরা হিষ্টিরিয়া বলেন। ধরিতে গেলে, গুল্মবায়ু কেবল মেয়েদেরই হইয়া থাকে; কখন কখন পুরুষেরও হয়। হিক্কি যে কেবল রোগীরও হইয়া থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। সহজ মানু-ষেরও হিক্কি হয়। শিশু আর প্রাচীন, এই দুই বয়সেই হিক্কি বেশী হয়। সহজ শরীরে যে হিক্কি হয়, তাকে সহজ হিক্কি বলে। আর রোগে যে হিক্কি হয়, তাকে রোগের হিক্কি বলিতে পার।

সহজহিক্কি——এই মাত্র বলিছি, শিশু আর

প্রাচীন, এই দুই বয়সেই হিক্কি বেশী হয়। শিশুদের ছুতোয় নতায় হিক্কি হয়। পেট ভরিয়া খাইলে তাদের হিক্কি হয়; বেশী হাসিলে তাদের হিক্কি হয়। অনেকেই দেখিয়াছেন, খুব কচি ছেলেকে পেট ভরিয়া দুধ খাওয়াইয়া দিলে, খানিক পরেই সে ঢুকুত্ ঢুকুত্ করিয়া হিক্কি তুলিতে থাকে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুধ-তোলার মত এক একটু দুধ তার কল্‌শা বয়ে পড়িতে থাকে। হিক্কির সঙ্গে সঙ্গে এ রকম দুধ-তোলা দেখিলে, বোধ হয়, দুধ যেন তার পেটে থেকে উপ্‌চে পড়িতেছে। ফল কথা, যাতেই হোক্, পেট ভার হইলেই কচি ছেলেদের হিক্কি হয়। যদি অনেক ক্ষণ থাকে, তবে হিক্কিতে তাদের বেশই কষ্ট হয়।

চিকিৎসা——ডিল্ ওয়াটর্ (য়্যাকোওয়া য়্যানিথাই) ছোট ছেলেদের হিক্কির খুব ভাল অসুদ। ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক করিয়া ডিল্ ওয়াটর্ উপ্‌রো-উপ্‌রি বার দুই তিন খাওয়াইয়া দিলে হিক্কি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। অনেক জায়গায় ডিল্ ওয়াটর্ এক বারের বেশী খাওয়াইতে হয় না। শিশুকে পেট ভরিয়া খাইতে দিবে না। দুধই হোক্, য়্যারুরুটই হোক্, আর সাগুই হোক্, যা খাইতে দিবে, তা যেন বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, টাট্‌কা আর পাতলা হয়।

ফল কথা, যা খাইতে দিবে, তাতে যেন তার পেট ভার না হইতে পারে।

সহজ হিক্কি অনেক সময় সহজেই থামাইতে পারা যায়। কথা বুঝিতে পারিয়া সেই রকম কাজ করিবার মত যদি রোগীর বয়স হয়, তবে তাকে খুব জোরে এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে বলিয়া, তার পর খানি ক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ রাখিতে বলিবে। অনেক জায়গায় এই রকম এক বার করিতেই সহজ হিক্কি বন্ধ হইয়া যায়। এই রকম এক বার করিয়া যেখানে হিক্কি বন্ধ না হইবে, সেখানে দু তিন বার ঐ রকম করিতে বলিবে। দীর্ঘ নিশ্বাস যত জোরে লইতে পার লইবে। তার পর, যত ক্ষণ পার নিশ্বাস বন্ধ রাখিবে। সহজ হিক্কি থামাইবার এ একটী খুব ভাল মুষ্টিযোগ।

উপর পেট বেড়িয়া কোমর-বঁধ খুব কষিয়া বাঁধিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ হয়। কোমর-বঁধের বদলে পুরু রকম শক্ত চৌড় ন্যাকড়া তিন চারি ফের করিয়া জড়াইলেও হইতে পারে।

নস্যি কি হাঁচুটি নাকে দিয়া উপ্‌রো উপ্‌রি অনেক বার হাঁচিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ হয়।

হঠাৎ অন্যমনস্ক করিতে পারিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ করিতে পারা যায়। মনে একটু ভয় হয়,

লজ্জা হয়, ভাবনা হয়, হঠাৎ এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই অন্যমনস্ক করিতে পারা যায়। অন্যমনস্ক যেই হয়, সেই-ই হিক্কি বন্ধ হইয়া যায়। আমার বেশ মনে আছে, ছেলে বেলা এক দিন সন্ধ্যা কালে মোল্লাহাটীর নীল কুটীতে গুরুমহাশয়ের কাছে বসিয়া ডাক বলিতেছি; এমন সময় আমার হিক্কি উঠিতে আরম্ভ হইল। পাঁচ সাত দশ বার হিক্কি উঠিলে পর গুরুমহাশয় আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না কি আজ্ এক খান নীল বড়ি চুরি করিয়া আনিয়াছ? তাঁর এই রকম জিজ্ঞাসামাত্রেই আমার হিক্কি থামিয়া গেল। যিনি অন্যমনস্ক করিবেন, তাঁর একটু কৌশল খাটান চাই—আর গম্ভীর হইয়াও বলা চাই। যার হিক্কি হইতেছে, সে যদি জানিতে পারে যে, ইনি আমাকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন, তবে সে অন্যমস্কও হবে না—তার হিক্কিও বন্ধ হবে না।

অনেক জায়গায় সহজ হিক্কিও সহজে থামাইতে পারা যায় না। সে সব জায়গায় রোগীর পিঠের শির-দাঁড়ায় ওপিয়ম্ লিনিমেণ্ট নিয়ত মালিষ করিবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর্ খাইতে দিবে। ওপিয়ম্ লিনিমেণ্টকে য়্যানোডাইন্ লিনিমেণ্ট বলে। এক এক বারে কত টুকু সল্‌ফি-

য়ুরিক ঈথর্ কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, ১১৯—১২০র পাতে তা বলিছি। সল্‌ফিয়ুরিক ঈথরের মত হিক্কির ভাল অসুদ আর নাই; এ কথাও ১২০র পাতে বলিছি। কখন কখন সহজ হিক্কিও দেখিতে দেখিতে গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। এ রকম ঘটিলে রোগীর উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তরা বসাইয়া দিবে। রাইয়ের পলস্তরায় যদি তেমন ফল পাওয়া না যাব, তবে তার উপর বেলস্তরার পটি লাগাইয়া দিবে। রাইয়ের পলস্তরা কি বেলস্তরার পটি বসাইতে হয়, সহজ হিক্কি এমন গুরুতর হইতে খুব কমই দেখা যায়।

অপাক থেকে যে হিক্কি হয়, তার চিকিৎসা একটু আলাদা। রোগী যা আহার করিয়াছে, তা পরিপাক হয় নাই, এ রকম পরিচয় পাইলে আধ পোওয়া গরম জলের সঙ্গে বিশ (২০) গ্রেন্ ইপেকা-কুয়ানা (ইপেকা পাউডর—ইপেকার গুঁড়ো) খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ত গরম জলের সঙ্গে আধ ছটাক খানেক ক্যাষ্টর অইল খাওয়াইয়া দিবে। রোগী যদি জোলাপ লইতে না চায়, তবে তিন পোওয়া গরম জলে সাবান গুলিয়া, সেই জলে এক ছটাক (দু ঔন্স) ক্যাষ্টর অইল আর আধ ছটাক (এক ঔন্স) তার্পিণ্ তেল দিয়া তার

পিচ্‌কিরি দিবে। কোষ্ঠবদ্ধর কথা বলিবার সময় জোলাপ দেওয়ার কথা আর পিচকিরি দিবার কথা ভাল করিয়া বলিব। পেট-ভার কমিলে আর কোষ্ঠ-বদ্ধ ঘুচিয়া গেলে, আধ ছটাক পেপরমিণ্ট ওয়াটরের সঙ্গে বিশ (২০) ফোটা য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব্ য়্যামোনিয়া মাঝে মাঝে খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। ১৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্‌মথ্ মাঝে মাঝে খাইতে দিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়।

গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) থেকে যে হিক্কি হয়, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সে অসুদে সে হিক্কি সারে।

টিংচর য়্যাসাফিটিডা (হিঙের আরোক)	...	৩ ড্রম্
টিংচর ব্যালীরিয়ান্ কো	... ...	৩ ড্রাম্
সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর	... ...	৩ ড্রাম
ডিল্ ওয়াটর (য়্যাকোওয়া য়্যানিথাই)	...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইতে বলিবে। গুল্মবায়ুর (হিষ্টিরিয়ার) কথা এর পর বলিব।

আর এক রকম হিক্কি আছে; ডাক্তরেরা তাকে ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট হিকপ্ বলেন। বাঙ্গালায় তাকে সবিরাম হিক্কি বলা যাইতে পারে। সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরে) যেমন জ্বর ছাড়িয়া

আবার জ্বর আসে, সবিরাম হিক্কিতে তেমনি হিক্কি থামিয়া আবার হিক্কি হয়। কুইনাইন্ আর শেঁকো (আর্সেনিক্) সবিরার-জ্বরের যেমন অস্থদ, সবিরাম-হিক্কিরও তেমনি অস্থদ। সবিরাম-জ্বরে জ্বর ছাড়িলে কুইনাইন্ কি শেঁকো খাওয়াইতে হয়, সবিরাম হিক্কিতে হিক্কি থামিলে কুইনাইন্ কি শেঁকো খাওয়াইতে হয়। একষ্ট্রাক্ট অব্ জেন্শনের সঙ্গে ৫ গ্রেন্ কুইনাইনের এক একটী বড়ি তয়ের করিবে। যে হিক্কি থামিবে,সেই এই বড়ি একটী খাইতে বলিবে। আবার হিক্কি ফিরে আসিবার ঘণ্টা খানেক আগে আর একটী বড়ি খাইতে দিবে। কুইনাইনের বড়ি এই রকম নিয়ম করিয়া খাইলে সবিরাম হিক্কি শীঘ্রই ভাল হইয়া যায়। শেঁকোর কথা ১৩৫—১৪১র পাত।

রোগের হিক্কি——রোগের হিক্কির কথা এখানে আলাদা করিয়া আর কি বলিব? বার (১২) বছরেরও বেশী হইল, স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) একটী রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। তার হিক্কি থামাইবার জন্যে যে সব অস্থদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। সেই সঙ্গে রোগীর পরিচয়ও কিছু দিলাম। রোগীর বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়। শরীর দুর্ব্বল আর কাহিল। জ্বরের আট দিনের দিন হিক্কি আরম্ভ হয়। হিক্কি

আরম্ভ হওয়ার পর পাঁচ দিনের দিন আমি রোগীকে দেখিতে যাই। গিয়া দেখিলাম, হিক্কির জন্যে রোগী যার পর নাই কষ্ট পাইতেছে। তার পর, তার সব শরীর বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। যকৃতের (লিবরের) জায়গায় ব্যথা ছাড়া, তার আর কোনও অসুখের পরিচয় পাইলাম না। ডাইন্ কোঁকে আঙুলের ঘা দিয়া যকৃতের জায়গায় ব্যথা কেমন করিয়া ঠিক্ করিতে হয়, ১১৩—১১৫র পাতে আর ১৩০র পাতে তা বলিছি। যকৃতের জায়গায় এ রকম ব্যথায় কিসের পরিচয় পাওয়া যায়? যকৃতে রক্ত জমিলে যকৃতের জায়গায় এ রকম ব্যথা হয়। গায়ের তাত প্রায় সহজ। জিব বেশ পরিষ্কার আর সরস। কেবল নাড়ীর বেগ সহজ বেলার চেয়ে ঢের বেশী। নাড়ীর এ রকম বেগের কারণ, কি স্থির করিলাম? এ রকম হিক্কিতে তেমন দুর্ব্বল রোগীর নাড়ী কি কখনও স্থির থাকিতে পারে? কখনই না।

হিক্কি থামাইবার জন্যে—

ব্যালিরিয়্যানেট অব্ জিঙ্ক্ ...		...	৬ গ্রেন্
এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলাডনা	...	...	৩ গ্রেন্
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্ ...	...	...	যত টুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা বড়ি তয়ের কর। যত ক্ষণ হিক্কি না থামিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক একটা বড়ি খাইতে বলিলাম।

যকৃতে রক্তজমা ঘুচাইবার জন্যে।

রোগীর যকৃতের জায়গায় বেলস্তরার পটি (এমপ্লাষ্ট্রম লিটী) এমন জুত বরাত করিয়া বসাইতে বলিলাম যে, বেলস্তরার খানিকটে যেন উপর-পেটে আসিয়া পড়ে। উপর-পেটে বেলস্তরার খানিকটে আসিয়া পড়িলে যকৃতের ভিতর রক্ত-জমা ঘুচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের যে কিছু উদ্দীপনা, তাও দূর হইয়া যায়। পেটের উদ্দীপনা গেলে হিক্কি শীঘ্রই থামিয়া যায়। এই জন্যে, যকৃতের জায়গায় অমন জুত বরাত করিয়া বেলস্তরার পটি বসাইতে বলিলাম।

ঐ রকম জুত বরাত করিয়া বেলস্তরার পটি বসান হইলে, আর চারিটী বড়ি খাওয়া হইলে পর হিক্কি বন্ধ হইল। হিক্কিতে রোগী এতই কষ্ট পাইয়াছিল যে, হিক্কি থামিয়া গেলে সে ভয়ে ভয়ে তার পরও আর দুটি বড়ি খাইয়াছিল।

হিক্কিতে রোগীর বড়ই কষ্ট হয়। হিক্কির রোগীকে দেখিলেও কষ্ট হয়। খুব শক্ত রোগে হিক্কি উপসর্গ ঘটিলে রোগীকে প্রায়ই বাঁচাইতে পারা যায় না। এ ছাড়া, হিক্কি উপসর্গ হইলে সোজা রোগও বাঁকা হইয়া দাঁড়ায়। তাতেই বলিতেছি, হিক্কিকে কোন মতেই সোজা মনে

করিবে না। কোন রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করিতে হইলে, আসল রোগের আর উপসর্গের, দুয়েরই চিকিৎসা এক সঙ্গেই করা চাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। বেলাডনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্ক হিক্কির খুব ভাল অসুদ। কোন রোগে হিক্কি উপসর্গ ঘটিলে এ দুটী অসুদ দিতে কখনও ভুলিও না। এই দুই অসুদে অনেক জায়গায় আমি খুব শক্ত শক্ত হিক্কিও ভাল করিছি। সোজা-সুজি হিক্কি শুদু মুষ্টিযোগেই সারে। যেখানে মুষ্টিযোগে হিক্কি না সারিবে, সেখানে বেলাডনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব্ জিঙ্কের কথা যেন মনে থাকে। হিক্কির চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে, রোগীকে সবল রাখিবার জন্যে বিশেষ তদ্বির বিধি মতে করিতে চাও। দুর্ব্বল রোগীকে সবল করিবার যেমন অসুদ দুধ, মাংসের ক্কাথ, আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি, তেমন অসুদ আর নাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

বছর আষ্টেক হইল বাতশ্লেষ্ম বিকারের একটী রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। গোড়ায় দস্তুর মত ভাল চিকিৎসা না হইলে, স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) শেষে বাতশ্লেষ্ম বিকারে গিয়া দাঁড়ায়। বাতশ্লেষ্ম বিকারকে আমাদের ডাক্তারেরা টাইফয়িড্

ফীবর বলেন। এখানে আমরা টাইফয়িড্ ফীবর তয়ের করি। ১৭৪—১৭৭র পাতে এ সব কথা বলিছি। তার পর বলি। রোগীর বয়স ৬০ বছরের কম নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বর খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে সচরাচর রোগীর যে অবস্থা হইয়া থাকে এ রোগিটীর সে অবস্থা ত হইছিলই; বাড়তির ভাগ, তার আর একটী ভয়ানক উপসর্গ ঘটিছিল। উপসর্গও আবার যে সে নয়; হিক্কি—যমের ভগিনী। হিক্কি দু রকম। এক এক বারে এক একটী, আর জোড়ায় জোড়ায়। এক এক বারে এক একটী হিক্কির চেয়ে, জোড়ায় জোড়ায় হিক্কি ঢের শক্ত। এ রোগিটীর জোড়ায় জোড়ায় হিক্কি হইছিল। এর আসল রোগের চিকিৎসা আর হিক্কির চিকিৎসা, দুই চিকিৎসাই এক সঙ্গে করিছিলাম। যকৃতের জায়গায় আর উপর-পেটে বেল-স্তরার পটি বসাইয়া, বেলাডনা আর ব্যালিরিয়্যনেট অব্ জিঙ্কের ঐ বড়ি দু ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিইছিলাম। এতে হিক্কি সদ্য সারিবার কথা। কিন্তু দু দিনেও হিক্কি বিশেষ নরম পড়ে নাই। এই জন্যে, তাকে সল্ফিরিক্ ঈথরও নিয়ম মত খাইতে দিইছিলাম। ঐ বড়ি আর সল্ফিয়ুরিক্ ঈথর নিয়ম করিয়া খাইয়া তার যে তেমন হিক্কি, তাও তিন চারি

দিনে ভাল হইয়া গিইছিল। এ রোগীটীর এত উপ-সর্গ ঘটিছিল যে, বলিতে গেলে তার কেবল বজ্রা-ঘাত বাকী ছিল। কত টুকু সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর, কি নিয়মে খাওয়াইতে হয়, ১১৯—১২০র পাতে তা মোটামুটি এক রকম বলিছি। সল্‌ফিয়ুয়িক্ ঈথরের মত হিক্কির ভাল অসুদ আর নাই, এ কথাও ১২০র পাতে বলিছি।

সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথরের বিশেষ গুণ এই যে, খাইবা-মাত্র হিক্কি বন্ধ হয়। হিক্কি একবারে বন্ধ হয় না; খানিক পরে আবার হয়। আবার সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর পেটে যে পড়ে, সেই হিক্কি বন্ধ হয়। এই রকম করিয়া বারে বারে সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর খাইতে খাইতে শেষে হিক্কি একবারেই বন্ধ হইয়া যায়। তাতেই বলিতেছি, যেখানে শুদু মুষ্টিযোগে, কি বেলাডনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব্ জিঙ্কের ঐ বড়িতে হিক্কি বন্ধ না হবে, সেখানে ঐ বড়ি আর সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়া হিক্কি বন্ধ করিবে। হিক্কি যত বার হবে, সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথরও তত বার খাওয়াইবে। যত ক্ষণ হিক্কি একবারে বন্ধ হইয়া না যাবে, তত ক্ষণ এই নিয়ম করিয়া সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর খাওয়াইবে। এতে হিক্কি বন্ধ করিতে যদি দু তিন দিনও লাগে, তাতেও হানি নাই। কেন

না, সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর খাওয়ার পর থেকে রোগীর হিক্কির জন্যে যে কষ্ট, তা থাকে না বলিলেই হয়। সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথরে হিক্কি থাকিতেই দেয় না। কাজেই, হিক্কির জন্যে যে কষ্ট, রোগীকে তা ভোগ করিতে হয় না বলিলেই হয়। সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর খাওয়ানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিক্কি বন্ধ হয়। আবার ও খাওয়াইতে খাওয়াইতে হিক্কি ক্রমে খুব তফাত তফাত হইতে থাকে; শেষে একবারেই বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া, বারে বারে সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর খাইয়া খুব অবসন্ন রোগীও চাঙ্গা হইয়া উঠে। কেন না, সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর একটী খুব ভাল উত্তেজক অসুদ। উত্তেজক অসুদকে ডাক্তরেরা ষ্টিমুলেণ্ট বলেন। উত্তেজক অসুদের কথা ১০৮—১১০র পাতে বলিছি। তাতেই বলি, সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথরের মত হিক্কির ভাল অসুদ আর নাই।

তার পর এখন হিক্কির গুটি কতক মুষ্টিযোগের কথা বলি।

হিক্কির মুষ্টিযোগ——সহজ হিক্কির মুষ্টিযোগের কথা ত এর আগেই বলিছি। সামান্য হিক্কিরও মুষ্টিযোগ অনেক। হিক্কি থামাইবার জন্যে অনেকে অনেক রকম মুষ্টিযোগের কথা বলিয়া থাকেন। আমি যে কয়টী মুষ্টিযোগ জানি, এখানে কেবল সেই কয়টীরই কথা বলিলাম।

(১) একটু দোক্তা তামাক আর একটু কর্পূর একত্র মিশাইয়া কল্‌কেতে সাজিয়া টানিলে সামান্য হিক্কি তখনই বন্ধ হয়।

(২) ছুঁচ দিয়া বিঁধিয়া একটা গোলমরিচ প্রদী-পের শিশে পোড়াইয়া তার ধোঁওয়া নাকে টানিলে সামান্য হিক্কি বন্ধ হয়।

(৩) শুক্ন হলুদ ভাঙিয়া কল্‌কেতে সাজিয়া থানিলে শক্ত হিক্কিও তখনই বন্ধ হয়।

(৪) আনারসের পাতার রস আধ ছটাক, একটু চিনির সঙ্গে মিশাইয়া উপ্‌রো উপ্‌রি কয়বার খাইলে সামান্য হিক্কি বন্ধ হয়। কৃমি থেকে যে হিক্কি হয়, এতে সে হিক্কিও বন্ধ হয়।

(৫) কুলের অাঁটির শাঁস আর মধু একত্র মিশা-ইয়া মাঝে মাঝে চাটিয়া খাইলে সামান্য হিক্কি বন্ধ হয়। চাটিয়া খাইবার অসুদকে বৈদ্যরা অবলেহ বলেন; ডাক্তরেরা ইলেক্‌চুয়ারি বলেন।

জুত বরাত করিয়া খাটাইতে পারিলে, এ সব মুষ্টিযোগে অনেক জায়গায় বেশ ফল পাওয়া যায়। সহজ কি সামান্য হিক্কি মুষ্টিযোগেই সারে।

কৃমি——২৪৬—২৪৭র পাতে স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) যে ১৮ রকম উপসর্গের নাম করিছি, কৃমি তার মধ্যে ধরি নাই। কিন্তু

কৃমি কম উপসর্গ নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসায় অনেক জায়গায় কৃমি উপসর্গ লইয়া চিকিৎসককে একবারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এ ছাড়া, কৃমি উপসর্গ ঘটিলে গা ন্যাকার ন্যাকার, অকি, কাঠ-বমি, কি হিক্কি প্রায়ই হইয়া থাকে। এই জন্যে, বমি আর হিক্কির পরই কৃমির কথা বলিলাম।

অন্ত্রের মধ্যে ৫। ৬ রকম কৃমি থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে সচরাচর কেবল দু রকম কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা এক রকম কৃমি। এ কৃমি দেখিতেও কেঁচোর মত। আর (২) সূতর মত সরু ছোট ছোট এক রকম কৃমি। মানুষের শরীরে এই দু রকম কৃমিই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর মত কৃমিকে ডাক্তরেরা রাউণ্ড্ ওয়র্ম্ম্ বলেন। সূতর মত সরু ছোট ছোট কৃমিকে তাঁরা স্মল্ থ্রেড্ ওয়র্ম্ম্ বলেন। এখন এই দু রকম কৃমির কথা এক এক করিয়া বলি।

(১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা কৃমি—এ কৃমি ছেলেদেরই বেশী হইয়া থাকে। শরীরে বল হয়, শরীর বেশ সুস্থ থাকে, এমন আহারের অভাবে যে সব ছেলে পিলে যা পায়, তাই খায়; এ কৃমি তাদের যত বেশী হয়, আর আর ছেলে পিলের তত

নয়। আকার প্রকারে কেঁচোর সঙ্গে এ কৃমির ঢের মিল দেখা যায়। কেঁচো যেমন লম্বা আর মোটা, এ কৃমিও তেমনি লম্বা আর মোটা। কেঁচোর শরীর যেমন গোল, এ কৃমিরও শরীর তেমনি গোল। কেঁচোর দু মুখ যেমন সরু আর ছুঁচ্‌লো, এ কৃমিরও দু মুখ তেমনি সরু আর ছুঁচ্‌লো। কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা কৃমি—এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে সোজাসুজি কেঁচো-কৃমি বলিব। সব কৃমি সমান লম্বা নয়। যে কৃমি গুলি সব চেয়ে ছোট, সে গুলি ৯ আঙুলের বেশী লম্বা নয়। আবার যে গুলি সব চেয়ে বড়, সে গুলি ১৫। ১৬ আঙুলের কম লম্বা নয়। কেঁচো-কৃমির রং ফিঁকে জর্দ্দা। কৃমি গুলি পেনের কলমের মত মোটা। মেয়ে কৃমি গুলি পুরুষ কৃমির চেয়ে বড়। আবার পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি ঢের বেশী। কেঁচো কৃমি ছোট অন্ত্রেই থাকে। কিন্তু সময় সময় উপর দিকে উঠিয়া যায়, আর একবারে পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর গিয়া উপস্থিত হয়। সেই রকম করিয়া আবার বড় অন্ত্রেরও ভিতর নামিয়া আসে। এই জন্যে, কৃমি মুখ দিয়াও উঠিতে পারে, আবার গুহ্যদ্বার দিয়াও বাহির হইয়া যাইতে পারে। সোজা কথায়, কৃমি বমিও হইতে পারে; কৃমি বাহ্যেরও

সঙ্গে বাহির হইতে পারে। কখন কখন অন্ত্রের ভিতর কেবল একটী কৃমি থাকে। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। দুটী, পাঁচটী, দশটী, বিশটী একত্র থাকেই। কখন কখন একবারে দেড় শ দু শরও বেশী কৃমি একত্র থাকে। বছর চারি পাঁচ হইল আমি একটী সাহেবের মেয়ের কৃমির চিকিৎসা করিছিলাম। মেয়েটীর বয়স ৮। ৯ বছরের বেশী নয়। আমি গুনিছিলাম, অসুদ খাইয়া এক হপ্তার মধ্যে তার ১৬৬টী কৃমি বাহ্যের সঙ্গে বাহির হইছিল। তার পেটে আর কৃমি ছিল কি না, তখন তা ঠিক্ করিতে পারি নাই। তার পর জানিতে পারিলাম, তার পেটে আরও কৃমি ছিল। মাঝে মাঝে দুটো পাঁচটা করিয়া কৃমি তার বাহ্যের সঙ্গে বাহির হইত। জর্ম্মণি দেশের এক জন ডাক্তর গুনিয়াছিলেন, একটা মেয়ে কৃমির পেটে ছ কোটি চল্লিশ লক্ষ (৬৪০০০০০০) ডিম ছিল।

লক্ষণ——এ কৃমির লক্ষণ সচরাচর বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। তবে যার পেটে এ কৃমি আছে, বেশ ঠেউরে দেখিলে, জানিতে পারিবে যে, তার পিপাসা হয়; রাত্রে ভাল ঘুম হয় না; ঘুমাইয়া নানা রকম স্বপ্ন দেখে; ঘুমাইয়া দাঁত কিড়মিড় করে; সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকে; তার

মুখের রং ফ্যাঁকাশে হইয়া যায়; মুখে দুর্গন্ধ হয়; পেটটা উচু উচু হয়; হাত পা সরু সরু হয়; খিদে বা খাইবার ইচ্ছা এক দিন এক রকম থাকে না; কোন দিন খুব খিদে হয়, কোন দিন খিদে মোটেই থাকে না, কোন দিন আহারে বেশ রুচি হয়, কোন দিন রুচি মোটেই থাকে না; মলের সঙ্গে আম নির্গত হয়; নাক চুল্‌কোয়, নাক খোঁটরায়; বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয়; আর গুহ্যদ্বারের কেমন এক রকম অসুখ অসুখ হয়। এ রকম অসুখকে উদ্দীপনা বলিতে পার। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে ৫৪৬র পাতে তা বলিছি। অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকাই যে গুহ্যদ্বারের এ রকম উদ্দীপনার কারণ, তা কি আর বলিতে হবে? এ ছাড়া, পেট ব্যথা করা, পেটের কামড়, পেটে কৃমি থাকার আর একটা লক্ষণ। পেটে কৃমি থাকার লক্ষণ যতই কেন জড়ো কর না, মলের সঙ্গে কৃমি বাহির হওয়াই পেটে কৃমি থাকার নিশ্চিত চিহ্ন—এ কথাটা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

চিকিৎসা——এ কৃমির চিকিৎসা খুব সোজা। স্যাণ্টোনীন্ এ কৃমির ব্রহ্মাস্ত্র। স্যাণ্টোনীন্ গাছড়া অসুদ। সিংকোনা গাছের ছাল থেকে যেমন কুইনাইন্ তয়ের হয়, স্যাণ্টোনাইকা গাছের ফুল

থেকে তেমনি স্যাণ্টোনীন্ তয়ের হয়। স্যাণ্টো-নীন্ চক্‌-চকে শাদা গুঁড়ো, দেখিতে ঠিক্ যেন কাচ-গুঁড়ন। স্যাণ্টোনীনের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। স্যাণ্টোনীনের মাত্রা ২ গ্রেন থেকে ৬ গ্রেন্। কত টুকু স্যাণ্টোনীন্ কি রকম করিয়া খাওয়াইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

স্যাণ্টনীন্	৫ গ্রেন্
ভাল চিনি	১৫ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। সকাল বেলা ১টা পুরিয়া, তুপর বেলা ১টা পুরিয়া, আর রাত্রে শুইবার সময় ১টা পুরিয়া, তিন বারে ৩টা পুরিয়া খাইতে দিবে। তার পর দিন সকালে ছটাক খানেক খুব গরম তুধের সঙ্গে আধ ছটাক (এক ঔন্স) ক্যাষ্টর অইল খাইতে বলিবে। জোলাপ লওয়ার পর রোগী যত বার বাহ্যে যাবে, তত বার তাকে মল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিবে। কত গুলি ক্বমি বাহির হইয়া যায়, সে যেন তা ঠিক্ করিয়া রাখে। কেন না, চিকিৎসকের কাছে রোগীর এ সব ঠিক্ করিয়া বলা চাই। যে দিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে স্যাণ্টোনীনের আর ৩টা পুরিয়া রোগীকে ঐ রকম করিয়া খাইতে দিবে। ক্যাষ্টর

অইলের জোলাপও সেই নিয়মে আবার দিবে। এ বারেও বাহ্যের সঙ্গে কত গুলি কৃমি বাহির হয়, রোগীকে তা ঠিক্ করিয়া রাখিতে বলিবে। নিয়ম মত স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া খাইয়া, আর ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ লইয়া যেবারে কৃমি বাহির না হবে, সেবারেই ঠিক্ করিবে, পেটে কৃমি আর নাই। এক দিনে উপ্‌রো উপ্‌রি তিন মাত্রার বেশী স্যাণ্টোনীন্ কখনও দিবে না। রাত্রে শুইবার সময় শেষ মাত্রা দিবে। আর তার পর দিন সকাল বেলা ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিবে। যে দিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া আবার দিবে। চারি দিনের আগে আর দিবে না। কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় রোগীকে স্যাণ্টোনীন্ খাওয়াইবার এ নিয়মটী কখনও ভুলিও না। যত খানি স্যাণ্টোনীন্, তার তিন গুণ চিনি মিশাইয়া স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া তয়ের করিতে হয়, এ কথাটাও যেন মনে থাকে। খালি পেটে স্যাণ্টোনীন্ খাইতে হয়। কৃমির প্রায় সব অসুদই খালি পেটে খাইতে হয়।

স্যাণ্টোনীন্ নিজে জোলাপ নয়। এই জন্যে, খুব ছোট ছেলেকেও স্যাণ্টোনীন্ নির্ব্বিঘ্নে দিতে পারা যায়। চারি বছরের ছোট ছেলেকে এক

এক বারে ২ গ্রেন্ করিয়া স্যাণ্টোনীন্ খাওয়াইতে পার। ডিস্পেন্সেরিতে আর অসুদের দোকানে বন্-বন্ বলিয়া কৃমির এক রকম অসুদ বিক্রি হয়। এক এক খান বন্-বনে এক গ্রেণের তিন ভাগের এক ভাগ ($\frac{1}{3}$ গ্রেন্) স্যাণ্টোনীন্ আছে। ৬ মাসের ছেলেকে এক খান বন্-বন্ একবারে খাওয়াইতে পার। ছেলের বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া বন্-বন্ দিবে।

স্যাণ্টোনীন্ খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। জীয়ন্ত বাহির হয় না কেন? স্যাণ্টো-নীন্ যে কেঁচো-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। সে বিষের তেজে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত থাকিতে পারে না।

স্যাণ্টোনীন্ বারে বারে খাওয়াইলে রোগী সব জিনিশ হল্‌দে দেখে। চিকিৎসকদের এটা জানিয়া রাখা ভাল। নৈলে, রোগী আপনার ভয় ঘুচাইতে আসিয়া, চিকিৎসকেই ভয় দেখাইয়া যাইতে পারে। স্যাণ্টোনীন্ খাইলে প্রস্রাবেরও রং কেমন এক রকম হল্‌দে হল্‌দে হয়।

তার্পিন তেল কেঁচো-কৃমির আর একটী খুব ভাল অসুদ। তার্পিন তেলও কেঁচো-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। কেন না, তার্পিন তেল খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। জোওয়ান রোগিদের

পক্ষে তার্পিন তেলের মাত্রা ৪ ড্রাম (এক কাঁচ্চা)। তার্পিন তেল, আহারের পর ২।৩ ঘণ্টা বাদে খাইতে হয়; খালি পেটে খাইতে নাই; খালি পেটে খাইলে বমি হইতে পারে—বমি হইয়াও থাকে। ঠাণ্ডা দুধ তার্পিন তেলের বেশ অনুপান। এই জন্যে, যখন তার্পিন তেল খাইতে দিবে, ছটাক খানেক ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। তার্পিন তেল খাওয়ার পর রোগীকে চলা ফেরা করিতে বারণ করিয়া দিবে। তার্পিন তেল খাইয়া রোগী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে তার গা ন্যাকার ন্যাকারও করে না, বমিও হয় না। কম মাত্রার চেয়ে, তার্পিন তেল বেশী মাত্রায় খাওয়া ভাল। কম মাত্রায় খাইলে প্রস্রাবের যাতনা হয়—প্রস্রাব করিতে কষ্ট হয়—ফোটা ফোটা করিয়া প্রস্রাব হয়, আর সেই সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা হয়। কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় রোগীকে তার্পিন তেল খাওয়াইবার এ নিয়মটী কখনও ভুলিও না।

আল্কুশি-ফলের গায়ের শুঁও (লোম) কেঁচো-কৃমির আর একটী ভাল অসুদ। এই শুঁও ১০ গ্রেন্, একটু মধুর সঙ্গে মিশাইয়া বড়ি তয়ের করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। রোজ রাত্রে শুইবার সময় সে এই বড়ি এক একটী খাইবে। উপরো-

উপ্‌রি তিন দিনের বেশী এ বড়ি খাইবার দরকার নাই। বড়ি খাইতে আরম্ভ করার আগে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ লইবে; আর বড়ি খাওয়া শেষ হইলে ঐ জোলাপ আর এক বার লইবে। আল্‌কুশি-ফলের শুঁও গায়ে লাগিলে গা কি রকম চুল্‌কোয়, চুল্‌কে চুল্‌কে গায়ের কি রকম দুর্দ্দশা হয়, আমাদের দেশের ছেলে, বুড়ো, জোওয়ানের তা জানিতে বাকী নাই। অন্ত্রের ভিতর কৃমিদেরও ঐ রকম দুর্দ্দশা হয়। ঐ রকম দুর্দ্দশা হইলে অন্ত্রের ভিতর তারা আর থাকিতে পারে না; বাহির হইয়া আসে। এ অষুদ খাইবার আগে জোলাপ লইবার মানে কি? মানে আর কি? জোলাপে অন্ত্র বেশ ছাপ হইয়া গেলে আল্‌কুশি-ফলের শুঁও কৃমির গায়ে বিঁধিবার বেশ সুবিধা হয়।

সূতর মত সরু ছোট ছোট কৃমি—সচরাচর লোকে একেই কৃমির ছা বলিয়া থাকে। ডাক্তারেরা এ কৃমিকে স্মল্ থ্রেড্ ওয়র্ম্ম বলেন। সূতর মত সরু ছোট ছোট কৃমি—এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে ছোট সূত-কৃমি বলিব। মলের নাড়ী (রেক্‌টম্) আর গুহ্যদ্বারের কাছে, এই দুই জায়গাতেই এ কৃমি বেশীর ভাগ থাকে। অন্ত্রের ভিতর যত রকম কৃমি থাকে, সব চেয়ে এই কৃমি

ছোট। এক একটী কৃমি লম্বায় এক আঙুলের তিন ভাগের এক ভাগের বেশী নয়। পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি গুলি বড়। আবার পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি ঢের বেশী। ছেলেদেরই এ কৃমি বেশীর ভাগ হয়। এ কৃমির হাত একবারে এড়ান সোজা নয়। এ কৃমি কখনও এক আধটী এক জায়-গায় থাকে না। যেখানে থাকে, সেখানে একবারে দলে দলে, রাশি রাশি থাকে।

লক্ষণ—গুহ্যদ্বার ভারি চুল্‌কোয়, আর গুহ্য-দ্বারের খুব উদ্দীপনা হয়। উদ্দীপনা কি—উদ্দী-পনা কাকে বলে, এর আগে অনেক বার বলিছি। বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয়। খিদে কোন দিন বা বেশী হয়, কোন দিন বা কম হয়, কোন দিন বা মোটেই হয় না। রোগী নাক খোঁটে। তার মুখে দুর্গন্ধ হয়। আর রাত্রে ভাল ঘুমোয় না। এ কৃমি থেকে গুরুতর ব্যাপার কখনও ঘটে না, বলিলেই হয়। তবে কচিৎ কখনও ঘটে। গুরুতর ব্যাপার আর কি? তড়্‌কা, ঘাড়-কাঁপা, মৃগির মত খেঁচুনি, আর প্রস্রাবের দুওর প্রভৃতির ভারি রকম উদ্দীপনা। ঘাড়-কাঁপাকে ডাক্তরেরা কোরিয়া বলেন। কোরি-য়ার কথা এর পর বলিব। কেঁচো-কৃমি থেকেই গুরুতর ব্যাপার বেশী ঘটে।

এ কৃমি গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া ছোট ছোট মেয়েদের যোনির ভিতর যাইতে পারে—গিয়াও থাকে। যোনির ভিতর গেলে যোনির উদ্দীপনা ঘটে। সেই উদ্দীপনা থেকে তাদের ধাতের ব্যামো হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মেয়েদের ধাতের ব্যামোকে ডাক্তরেরা লিয়ুকোরিয়া বলেন। লিয়ুকোরিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় শ্বেতপ্রদর বলে।

এই কৃমি গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া জোওয়ান রোগিদেরও প্রস্রাবের দ্বুওর প্রভৃতির ভারি রকম উদ্দীপনা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। জোওয়ান রোগিদের প্রস্রাবের দ্বুওর প্রভৃতির এ রকম উদ্দীপনা হইলে, সময় সময় তাদের আপনা হইতেই বীর্য্য নির্গত হয়।

বছর খানেকরও বেশী হইল আমার কাছে একটী রোগী আসিয়াছিল। তার বয়স ত্রিশ বছরের বেশী নয়। শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট আর খুব সবল। দেখিয়া তার কোনও রোগ আছে, এমন বোধ হইল না। ছোট ছোট কৃমির জ্বালায় আমি কোন খানে এক দণ্ডও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। গুহ্যদ্বার নিয়ত এমনি চুল্‌কোয় যে, পাঁচ জন লোকের মাঝখানে আমার বসিবার জো

নাই। গুহ্যদ্বারে সময় সময় এত কৃমি এসে জমা হয় যে, দুটী আঙুল দিয়া চিমটে আনিলে এক এক বারে এক শ দেড় শ কৃমি বাহির হইয়া আসে। বাহ্যের সঙ্গে এত কৃমি বাহির হয় যে, কৃমির জন্যে মল মোটে দেখাই যায় না। কৃমিতে মল একবারে ছাওয়া থাকে। আপনার রোগের কথা সে এই রকম করিয়া বলিল। এ কৃমির জন্যে, জোওয়ান রোগিদের এ রকম অস্বস্তি বড় সাধারণ নয়। সাধারণ নয় বলিয়াই এখানে এ রোগীটীর কথা বলিলাম। এখন এ কৃমির চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——শুদ্ধু ঠাণ্ডা জল পিচ্কিরি করিয়া দিলেই এ কৃমি মরিয়া যায়। ইন্‌ফিয়ুশন্ কোওয়াশিয়া পিচ্কিরি করিয়া দিলেও এ কৃমি মরে। ইন্‌ফিয়ুশন কোওয়াশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ পিচ্কিরি করিয়া দিলে, এ কৃমি খুব শীঘ্র মরে। লবণের সঙ্গে মিশাইয়া যবের মণ্ড (বার্লি-ওয়াটর) পিচ্কিরি করিয়া দিলেও এ কৃমি খুব শীঘ্র মরে। চুণের জলের পিচ্কিরিতেও এ কৃমি মরে।

ইন্‌ফিয়ুশন্ কোওয়াশিয়া এক এক বারে ৮ ঔন্স পিচ্কিরি করিতে পার।

ইন্‌ফিয়ুশন্ কোওয়াশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া যদি টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ পিচ্কিরি করিতে চাও,

তবে ৮ ঔন্স ইন্‌ফিয়ুশন কোওয়াশিয়ার সঙ্গে ১ড্রাম্ টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ মিশাইয়া পিচ্‌কিরি দিবে।

যবের মণ্ড দেড় পোওয়া আর লবণ আধ ছটাক একত্র মিশাইয়া তার পিচ্‌কিরি দিবে।

চূণের জল এক এক বারে ৫। ৬ ঔন্স পিচ্‌কিরি করিতে পার।

আধ ছটাক (এক ঔন্স) ঠাণ্ডা জলে ১৫ মিনিম্ সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর দিয়া, সেই জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও এ কৃমি শীঘ্র মরিয়া যায়। এক এক মিনিম্ প্রায় দু ফোটা হবে। মিনিম্ আর ফোটার কথা মেটিরিয়া মেডিকায় বলিব।

জোওয়ান রোগিদের এ কৃমির চিকিৎসায় এক এক বারে তিন পোওয়া ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে এক কাঁচ্চা (৪ ড্রাম্) টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ মিশাইয়া পিচ্‌কিরি দিবে।

টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্-মিশন জল গায়ে লাগিলে এ কৃমি সব একবারে দলা শলা হইয়া এক এক জায়গায় আলাদা আলাদা জমাট বাঁধিয়া যায়। শুদু টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিসেই যে এ রকম হয়, তা নয়; লবণেতেও হয়; ইন্‌ফিয়ুশন্ কোওয়াশিয়াতেও হয়; চূণের জলেতেও হয়। মেটিরিয়া মেডিকায় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব।

ঐ রকম করিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া ছোট সূত-কৃমি মারিয়া ফেলা খুবই সহজ বটে। কিন্তু এ কৃমির হাত একবারে এড়ান সোজা নয়। সোজা নয় কেন? কেন, তা এক কথায় বলিয়া দিতেছি। এ কৃমি যদি কেবল মলের নাড়াতেই (রেক্‌টমেই) থাকিত, তবে সহজেই এ কৃমির হাত এড়াইতে পারা যাইত। এ কৃমি মলের নাড়ীতেও থাকে, মলের নাড়ীর ঢের উপরেও থাকে। মলের নাড়ীতে যেমন থাকে আর ছা করে; মলের নাড়ীর ঢের উপরেও তেমনি থাকে আর ছা করে। এই জন্যে, অসুদ পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, মলের নাড়ীতে যে সব কৃমি থাকে, কেবল সেই সব কৃমিই মরিয়া যায়। পিচ্‌কিরির জল তার উপরে যায় না বলিয়া উপরকার কৃমি সব যেমন তেমনিই থাকে; তাদের কিছুই হয় না। কাজেই, মলের নাড়ীর কৃমি গুলি মরিয়া যায় বলিয়া রোগী দিন কতক একটু ভাল থাকে—একটু স্বস্তি পায়। তার পর উপরকার কৃমি গুলি মলের নাড়ীতে নামিয়া আসিলে রোগীর যে অস্বস্তি, আবার সেই অস্বস্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। বারে বারে এ রকম হইতে থাকিলে, অসুদ বিসুদে এ কৃমির কিছুই হবে না বলিয়া ছেলের মা বাপ আর

চিকিৎসা করাইতে চায় না। রোগী যদি জোও-
য়ান হয়, তবে সে আপনিই সব আশা ভরসা
ছাড়িয়া দেয়। তাতেই বলিতেছি, এ কৃমি সব যদি
এক বারে মারিয়া ফেলিতে চাও, তবে রোগীকে
উপ্‌রো উপ্‌রি ৩। ৪ বার জোলাপ দিবে। তার
পর, ঐ সব অসুদের যে সে একটা পিচ্‌কিরি করিয়া
গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিবে। উপ্‌রো উপ্‌রি ৩। ৪
বার জোলাপ দিবার মানে কি? জোলাপ দিলে
উপরকার কৃমি সব নীচের দিকে নামিয়া পড়ে।
কাজেই, পিচ্‌কিরির জলের হাত তারা আর এড়া-
ইতে পারে না। দশ পোনর দিনে বা দু এক
মাসে, এ কৃমির হাত এক বারে এড়াইতে পারা যায়
না। এমন কি, যদি ছ মাস ধরিয়া হপ্তায় দু বার
করিয়া পিচ্‌কিরি দেও, আর সময় সময় জোলাপ
দেও, তবেই এ কৃমির জড়্ একবারে মারিয়া
ফেলিতে পার। কৃমি আর না জন্মিতে পারে, সেই
সঙ্গে সঙ্গে সে ফিকিরও করা চাই। সে ফিকিরের
কথা—সে উপায়ের কথা এখনই বলিব।

পেটে কৃমি হয় কেন? পেটে কেমন করিয়াই
বা কৃমি যায়? কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা কোন
রকমে পেটের ভিতর গেলেই, আর কি, কৃমি হয়।
অপরিষ্কার ময়লা জলেই কৃমির ডিম আর অফুটন্ত

ছা বেশীর ভাগ থাকে। এই জন্যে, অপরিষ্কার ময়লা জল খাইলে পেটে কৃমি হওয়া যত সম্ভব, এত আর কিছুতেই নয়। যারা কাঁচা বা কম সিদ্ধ মাংস খায়, তাদেরও পেটে কৃমি হয়। অনেক জন্তুর মাংসে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা থাকে; শূওরেরই মাংসে বেশীর ভাগ থাকে। মাংস খুব সিদ্ধ করিলে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা একবারে মরিয়া যায়। কাজেই, সে মাংস খাইলে পেটে কৃমি হইবার কোন ভয়ই থাকে না। এই জন্যে, মাংস খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়া এত দরকার? শুদু মাংস কেন? শাক সব্জিও খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়া চাই। কেন না, শাক সব্জিতেও কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা থাকে। ফল ফুলরিবও সঙ্গে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা পেটে গিয়া থাকে। পাকা ফলের চেয়ে কাঁচা ফল খাওয়া আরও দোষের।

পেটে কৃমি থাকার সাধারণ লক্ষণ গোটা কতক সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। কেঁচো-কৃমির কথা বলিবার সময়, পেটে কেঁচো-কৃমি থাকার যে সব লক্ষণের কথা বলিছি, মোটামুটি ধরিতে গেলে, পেটে কৃমি থাকার সাধারণ লক্ষণই সেই। তবে বাড়তির ভাগ, কোন কোন জায়গায় আরও

কিছু কিছু অসুখের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সব অসুখ আর কি? মাথা ধরা, গা মাটি মাটি করা, আর মুখের একটু কষো কষো ভাব।

শুধু গোটা কতক লক্ষণ দেখিয়াই পেটে কৃমি আছে বলিয়া একবারে ঠিক্ করিতে পার না; ঠিক্ করা উচিতও নয়। বাহ্যের সঙ্গে কৃমি বাহির হওয়াই, পেটে কৃমি থাকার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে।

পেঠে কৃমি থাকাকে সোজা জ্ঞান করা হবে না। পেটে কৃমি থাকার দরুণ যদি বেশী উদ্দীপনা ঘটে, তবে ছেলেদের তড়কা হইতে পারে—হইয়াও থাকে; জোওয়ান রোগিদের মৃগির মত খেঁচুনি হইতে পারে—হইয়াও থাকে; মেয়েদের হিষ্টি-রিয়া হইতে পারে—হইয়াও থাকে। হিষ্টিরিয়া এক রকম মূর্চ্ছাগত বাই। হিষ্টিরিয়াকে বৈদ্যরা গুল্মবায়ু বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি। হিষ্টিরিয়ার কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। এ ছাড়া, পেটে কৃমি থাকার দরুণ কানের ভিতর নানা রকম শব্দ হইতে পারে; মাথা-ঘোরা হইতে পারে; শরীরের রক্ত একবারে কমিয়া যাইতে পারে। এমন কি, কৃমি থেকে উন্মাদ রোগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে।

কৃমি অন্ত্রেরই ভিতর থাকে। কিন্তু আমরা

ঘরাও কথা বার্ত্তায় "অন্ত্র" কথাটা বড় ব্যবহার করি না। "এর পেটে কৃমি নিশ্চয়ই আছে। কৃমি না থাকিলে, এই সামান্য জ্বরে এত উপসর্গ কখনই ঘটিত না"। ঘরাও কথা বার্ত্তায় আমরা এই রকম করিয়াই বলিয়া থাকি। এই জন্যে, অন্ত্রের ভিতর কৃমি আছে—অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকে—অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকার দরুণ—বারে বারে এ রকম না বলিয়া তার বদলে—পেটে কৃমি আছে, পেটে কৃমি থাকে, পেটে কৃমি থাকার দরুণ—বলিছি।

তার পর বলি।

কৃমির চিকিৎসা দু রকম।

(১) পেটের কৃমি বাহির করিয়া দেওয়া।

(২) কৃমি আর জন্মিতে না পারে, তার উপায় করা।

পেটের কৃমি বাহির করিয়া দিবার উপায় ত এক রকম মোটামুটি বলিলাম। পেটে কৃমি আর না জন্মিতে পারে—তার উপায় এখন বলি। পেটে কৃমি হয় কেন? পেটে কেমন করিয়াই বা কৃমি যায়? এর উত্তর যদি তোমার মনে থাকে, তবে পেটে কৃমি আর না জন্মিতে পারে, এমন উপায় তুমি সহজেই করিতে পার।

১। ময়লা কি অপরিষ্কার জল কখনও খাইও না।

২। খুব সিদ্ধ না করিয়া কখনও কোনও মাংস খাইও না।

৩। কাঁচা ফল ফুলরি খুব কম খাবে।

৪। শাক সব্জি খুব ভাল করিয়া না ধুইয়া আর বেশ সিদ্ধ না করিয়া কখনও খাইও না।

৫। মিষ্টি খুব কম খাবে।

৬। রোজ নিয়ম করিয়া খাবার জিনিষের সঙ্গে একটু একটু লবণ খাবে।

এ ছাড়া, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, নিয়ম করিয়া কিছু দিন সে অসুদটী খাবে। কৃমি নিবারণের এটী বড় চমৎকার অসুদ।

কুইনাইন্	১২ গ্রেন্
টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্	২ ড্রাম্
ডাইলিয়ুট্ হাইড্রোক্লোরিক্ য্যাসিড্ ...	২ ড্রাম্
টিংচর কলম্বো	৬ ড্রাম্
ইন্‌ফিয়ুশন্ কোওয়াশিয়া	১০ ঔন্স ৬ ড্রাম

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ ৩ বার করিয়া খাবে। যত দিন শরীর বেশ সুস্থ আর সবল না হয়, তত দিন এ অসুদটা বেশ নিয়ম করিয়া খাওয়া চাই। চারি দিন অন্তর অসুদ তয়ের করিয়া লইবে।

কৃমি নিবারণের যেমন অসুদ লবণ, সামান্য

জিনিষের মধ্যে তেমন অসুদ আর নাই। এ কথাটা সকলেরই যেন মনে থাকে। খাবার জিনিষের সঙ্গে নুন বেশী করিয়া খাইলে কৃমি জন্মিতে পারে না, আমাদের দেশের মেয়েরাও তা জানে।

কেঁচো-কৃমি আর ছোট সূত-কৃমি, আমাদের দেশে সচরাচর এই দু রকম কৃমিই দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবদের দেশে এ দু রকম কৃমি ত আছেই। তা ছাড়া, আর এক রকম কৃমি আছে। ডাক্তরেরা সে কৃমিকে টেপ্-ওয়র্ম্ম বলেন। টেপ্ ইংরিজি কথা। টেপের অর্থ ফিতে। ফিতে যেমন পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা, এ কৃমিও তেমনি পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা। এই জন্যে, এ কৃমিকে ফিতে-কৃমি বলে। কেঁচোর মত দেখিতে বলিয়া যেমন কেঁচো-কৃমি বলা যায়; ফিতের মত দেখিতে বলিয়া এ কৃমিকে তেমনি ফিতে-কৃমি বলিতে পার। কেঁচো-কৃমির চেয়ে ফিতে-কৃমি ঢের লম্বা। যে গুলি খুব খাটো, সে গুলি দশ হাতের বেশী লম্বা নয়। আবার যে গুলি খুব লম্বা, সে গুলি ত্রিশ হাতের কম লম্বা নয়। অন্ত্রে ফিতে-কৃমি একটাও থাকে, এক বারে তিন চারিটাও থাকে। ফিতে কৃমি ছোট অন্ত্রেই থাকে। ফিতে কৃমির গায়ে বিছের গায়ের মত যোড় আছে। যোড় এত যে,

গুণিয়া উঠা ভার। এক আঙুল জায়গার মধ্যে এমন ৮। ১০টা যোড় আছে। যোড়ের ভাল কথা সন্ধি। ছা ডিম করিবার জন্যে স্ত্রী পুরুষের যে সব যন্ত্রের দরকার, এক একটী যোড়ে সে সব যন্ত্রই আছে। এই জন্যে, ধরিতে গেলে এক একটী যোড়, দুটী আস্ত ক্রিমির সমান। বাহ্যের সঙ্গে এই সব যোড় খসিয়া খসিয়া বাহির হয়। রোগী যখন চলা ফেরা করে, তখনও যোড় বাহির হয়। এক্রিমির মাথাটীই আসল মূল। মাথাটী সুদ্ধ সব ক্রিমি যত ক্ষণ না বাহির হইয়া না আসে, তত ক্ষণএ ক্রিমির হাতে রোগীর নিস্তার নাই। এ ক্রিমির যোড় যতই কেন বাহির হইয়া যাক্ না, তাতে কোনও ফল নাই। আর আর ক্রিমি যে সব অস্থদে বাহির হইয়া যায়, সে সব অস্থদে মাথা সুদ্ধ এ ক্রিমি বাহির হয় না। হাজারের মধ্যে যদি ৯৯৯টী যোড় বাহির হইয়া আসে, আর একটী যোড় আর মাথাটী অন্ত্রের ভিতর থাকে, তবে দু পাঁচ দিনেই আবার যে ক্রিমি, সেই ক্রিমি হইয়া দাঁড়ায়।

এ ক্রিমির কেবল একটী ভাল অস্থদ আছে। সে অস্থদটীর নাম মেল্-ফর্ণ। মেল্-ফর্ণ গাছড়া অস্থদ। মেল্-ফর্ণের কেবল মূলই অস্থদে লাগে। আদা যেমন মূল, মেল্-ফর্ণেরও মূল ঠিক্ তেমনি। মেল-

ফর্ণের মূল থেকে এক রকম আরোক তয়ের হয়। ডাক্তরেরা সে আরোককে লিকুইড্ এক্ষ্ট্রাক্ট অব মেল্-ফর্ণ বলেন। কতটুকু লিকুইড্ এক্ষ্ট্রাক্ট অব মেল্ ফর্ণ কি রকম করিয়া খাওয়াইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

লিকুইড্ একষ্ট্রাক্ট অব্ মেল্-ফর্ণ	...	১ ড্রাম্
সিরপ্ জিঞ্জর	... ...	১ ঔন্স
মিয়ুসিলেজ্ (গঁদ-ভিজের জল)	...	১ ঔন্স
পরিষ্কার হিম জল	... ...	৩ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

এই যে অস্থুদ তয়ের করিলে, এ এক বার খাই-বার মত। খুব ভোরে অস্থুদ টুকু সব একবারে খাইবে। আগের দিন সকালে ক্যাষ্টর্ অইলের জোলাপ লইবে, আর শুদ্ধু একটু য়্যাররুট খাইয়া থাকিবে। রাত্রে ফের ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ লইবে। এক দিনে উপ্‌রো উপ্‌রি দু বার জোলাপ লইবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই না। জোলাপে অন্ত্র খুব ছাপ হইয়া গেলে, কৃমি মলে তেমন আর ঢাকা থাকিতে পারে না। কাজে কাজেই, যে অস্থুদ এ কৃমির পক্ষে ভয়ানক বিষ, সে অস্থুদে কাজের কোন ব্যাঘাতই ঘটিতে পারে না। বড় জোর, দু বার কি তিন বার এই রকম করিয়া এ অস্থুদ খাইতে হয়। তা হইলেই কাজ সিদ্ধি হয়।

মাথা সুদ্ধ এ কৃমি বাহির হইয়া আসে। মাথা সুদ্ধ সব কৃমি বাহির হইয়া আসিল কি না, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই।

কৃমি আর জন্মিতে না পারে, এই জন্যে ৭৮২র পাতে যে অস্থুদটী লিখিয়া দিইছি, নিয়ম করিয়া কিছু দিন সেই অস্থুদটী খাইবে। তা খাবার জিনি-ষের সঙ্গে নুন খুব বেশী করিয়া খাইবে। মাংস খুব সিদ্ধ করিয়া খাবে।

শূওরের মাংসেই এ কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা বেশীর ভাগ থাকে। এই জন্যে, যারা শূওরের মাংস কাঁচা খায় বা আধ-সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে এ কৃমি হয়।

বড় জাতের আর এক রকম ফিতে-কৃমি আছে। গো-মাংসেই সে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা বেশীর ভাগ থাকে। এই জন্যে, যারা গো মাংস কাঁচা খায় বা আধ সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে সে কৃমি হয়। তাতেই বলি, আহারের দোষে এ দেশেরও লোকের পেটে এ দু রকম কৃমি জন্মিতে পারে। এই জন্যে, এখানে এ দু রকম ফিতে-কৃমির কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। যদিই কখনও তোমার হাতে এমন রোগী পড়ে, সরল জ্বর-চিকিৎসায় ফিতে কৃমির কথা লেখা নাই বলিয়া তখন তোমাকে অপ্রতিভ হইতে হবে না।

মেল্-ফর্ণ ফিতে-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। কেন না, মেল্-ফর্ণ খাইলে এ কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। মেল্-ফর্ণে আরও অনেক কৃমি মরে। আর মেল্-ফর্ণেই কেবল ফিতে কৃমির মাথা সুদ্ধ সব খানি বাহির হইয়া আসে। ফল কথা, মেল্ ফর্ণের মত ভাল অসুদ ফিতে-কৃমির আর নাই। এ কথাটা যেন মনে থাকে।

ছেলেদেরই স্বল্প-বিরাম জ্বরে কৃমি উপসর্গ বেশী ঘটে। জ্বরে কৃমি উপসর্গ ঘটিলে আমাদের বৈদ্যরা তাকে কৃমি-বিকার বলেন। কৃমি-বিকারে বমি, ওয়াক, আঁকি, কাঠ-বমি কি হিক্কি—এ সব ত হয়ই। তা ছাড়া, ভুল বকা, ছট্-ফট্ করা, চীৎকার করা, চেঁচান, বারে বারে গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া ন্যাকার করিবার চেষ্টা করা, বালিশের উপর নিয়ত মাথা নাড়া, পিচ্ পিচ্ করিয়া বারে বারে একটু একটু পাতলা বাহ্যে যাওয়া, নাক খোঁটা, প্রস্রাবের দুওরে বারে বারে হাত দেওয়া, মল-দুওর বারে বারে চুল্‌কনো, ছেলে কি মেয়ের বিশেষ চিহ্নের উত্তেজনা, পেটের ফাঁপ—কৃমি বিকারে অনেক জায়গায় এ সব লক্ষণেরও বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বারে বারে গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া ন্যাকার করিবার চেষ্টা

করার কথা একটু বিশেষ করিয়া বলি। কৃমি-বিকারে, ছেলেরা বারে বারে এমন ভাবে আর এমনি জুত্ত বরাত করিয়া গলার ভিতর হাত পুরিয়া দেয় যে, তা দেখিয়া বোধ হয়, তাদের গলার ভিতর যেন কিছু আট্‌কে আছে; তাই যেন বাহির করিয়া ফেলিবার জন্যে, কি ন্যাকার করিয়া তুলিয়া ফেলিবার জন্যে, গলার ভিতর অমন করিয়া হাত পুরিয়া দিতেছে। সত্য সত্যই অনেক জায়গায় তারা ঐ রকম করিয়া গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া কৃমি বাহির করিয়া ফেলে। ঐ রকম করিয়া তারা অনেক জায়গায় কৃমি ন্যাকারও করে। আর কোনও কৃমি নয়, কেঁচো-কৃমি। কৃমি দেখিয়া চিকিৎসকের তখন চৈতন্য হয়। এই জন্যেই কি, কয়দিন ধরিয়া ছেলেটা গলার ভিতর অমন করিয়া বারে বারে হাত পুরিয়া দিতেছিল! তবে কি, কৃমি-তেই এ সব উপদ্রব, উপসর্গ আনিয়াছে! কৃমিতে যে এমন ঘটে, তা ত জানিতাম না! তবে ত এই জন্যেই, এত অসুদ বিসুদ দিয়াও রোগের উপদ্রব থামাইতে পারি নাই! এতে রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হইবার ত কথাই বটে। যাই হোক্, এখন, বাঁচিলাম—এখন বোধ হইতেছে, ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারিব। এই রকম ভাবিয়া

তখন তিনি কৃমির অস্বুদের ব্যবস্থা করেন। কেঁচো-কৃমির অস্বুদ আর কি? স্যাণ্টোনীন্। রোগী স্যাণ্টোনীন্ খাইল, কেঁচে-কৃমি সব বাহির হইয়া গেল; তার পর আগুণে জল পড়ার মত, রোগের উপদ্রব—উপসর্গ সব একবারে থামিয়া গেল। গলার ভিতর কৃমি কেমন করিয়া আসে? অন্ত্র থেকে পেটের ভিতর আসে—পেটের ভিতর থেকে গলার ভিতর আসে। গলার ভিতর আসিয়া গলার গোড়ায় পুঁটলি পাকাইয়া থাকে। গলার গোড়ায় অমন করিয়া পুঁটলি পাকাইয়া থাকে বলিয়াই, কৃমি-বিকারে ছেলেরা অমন করিয়া বারে বারে গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া কৃমি বাহির করিয়া ফেলি-বার চেষ্টা করে। তা না পারে ত, ন্যাকার করিয়া তুলিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করে। তার পর বলি। কৃমি যে এ সব উপদ্রবের কারণ, তুমি যদি ঠিক্ করিতে না পার, তবে তুমি কখনই সে সব উপদ্রব, উপ-সর্গ দূর করিতে পারিবে না। রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে তুমি দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হবে। তাতেই বারে বারে বলিছি, আর এখনও বলিতেছি, রোগ ঠিক্ করাই শক্ত। রোগের ঠিক্ কারণ বুঝিতে পারিলে, তা সে যে রোগই কেন হোক্ না, চিকিৎ-সকের কাছে তা সোজা হইয়া পড়ে।

জ্বর জাড়ি ছাড়া সহজ শরীরেও কৃমির উৎপাত হয়, আর তার জন্যে রোগীকে এক বারে অস্থির হইতে হয়। কেঁচো-কৃমির কথা বলিবার সময় এ কথা বলিছি।

৯। **পেট-ফাঁপা**——পেটের ফাঁপ সহজ শরীরেও হয়, রোগেও হয়। যদি আর কোনও উৎপাত না থাকে, তবে সহজ শরীরে পেট-ফাঁপায় কোন চিন্তাও নাই, কোন ভয়ও নাই। খুব সহজ শরীরে খুব সামান্য রকম অপাক হইলেও, পেটের যে এক আধটু ফাঁপ, তা হইয়াই থাকে। তবে সে ফাঁপ কেউ পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে যায় না—পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরকারও হয় না। সে পেট-ফাঁপায় কোন কষ্টও হয় না। পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর আর অন্ত্রের ভিতর বাতাস জমাকে পেট-ফাঁপা বলে। বাতাস কেবল নামে মাত্র জমিতে পারে। আবার চাই কি এত বাতাস জমিতে পারে যে, পেট ফুলিয়া একবারে ঢাক হইতে পারে। পেটের ভিতর আর অন্ত্রের ভিতর বাতাস কেমন করিয়া জমে? বাতাস কোথা থেকে আসে? বাইরের বাতাস পেটের ভিতর যাইতে পারে। আবার পেটের (পাকস্থলীর) ভিতরকার আর অন্ত্রের ভিতর-কার জিনিষ পচিয়া তা থেকে খারাপ বাতাস জন্মিতে

পারে। এই খারাপ বাতাসকে ডাক্তরেরা গ্যাস্ বলেন। গ্যাস্ কথাটা আজ্ কাল্ বেশ চলিত হইয়াছে। পেটের ভিতরকার আর অন্ত্রের ভিতরকার জিনিষ আর কি? যা খাওয়া যায়, তাই। যা খাওয়া যায়, তা যদি বেশ পরিপাক হয়—বেশ হজম হয়, তবে কোন উৎপাতই ঘটে না। পরিপাক না হইলে—হজম না হইলে, ভাত, মাচ, ডাইল, তরকারি বাইরে যেমন পচে, পেটের ভিতরও তেমনি পচে। বাইরে যে জিনিষ পচে, তা থেকে যেমন দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, পেটের ভিতর যে জিনিষ পচে, তা থেকেও সেই রকম দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে। পেটের ভিতরকার জিনিষ পচিলে যে তা থেকে দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, তার প্রমাণ কি? তা কেমন করিয়া জানা জায়? তার আর প্রমাণ কি? তার পরিচয় আর কি? দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা আর বায়ু সরাই তার প্রমাণ—আর তার পরিচয়। দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা আর বায়ু সরার সঙ্গে গা-ন্যাকার ন্যাকারও করে, পেটের এক আধটু কামড়ও হয়, পেট ডাকে, আর বাহ্যের চেষ্টা হয়। যত ক্ষণ বায়ু সরল থাকে, তত ক্ষণ ঢেকুরও উঠে, বায়ুও সরে। কাজে কাজেই, একবারে বেশী গ্যাস্ জমিয়া পেট ঢাক হইতে পারে না। আবার যতক্ষণ

শরীরে বেশ বল থাকে, তত ক্ষণ বায়ুও বেশ সরল থাকে। বল খাটো না হইলে আর বায়ু ক্রূর হইতে পারে না। বায়ু বদ্ধই বল, বায়ু ক্রূরই বল, আর বায়ু কুপিতই বল, সবই এক কথা। এ সব কবিরাজি কথা। এ সব কথা আমাদের বৈদ্যরাই বেশী বলিয়া থাকেন। তাঁদের এ সব কথার বেশ মানে আছে।

শরীরের বল খাটো করে কিসে? রোগে। বাঁকা রকম শক্ত জ্বরে বল যত শীঘ্র খাটো করিয়া ফেলে, এত আর কিছুতেই নয়। সবিরাম-জ্বরও (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরও) বাঁকা আর শক্ত হয়; স্বল্প-বিরাম-জ্বরও (রমিটেণ্ট ফীবরও) বাঁকা আর শক্ত হয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরই বাঁকা আর শক্ত বেশী হয়। স্বল্পবিরাম-জ্বর বাঁকা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইলেই আমরা তাকে বাতশ্লেষ্ম-বিকার বলি। ডাক্তরেরা তাকে টাইফয়িড্ ফীবর বলেন। ১৭৪—১৭৫র পাতে এ সব কথা বলিছি। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারেই পেট-ফাঁপার খুব বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, বাতশ্লেষ্ম বিকারে পেট-ফাঁপা থাকিতেই চায়। গায়ের তাত, ভুল-বকা, পেটের ভিতর বাতাস, আর বুকের ভিতর শ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে এই চারিটী প্রধান অঙ্গ। "পেটের ভিতর

বাতাস” এর অর্থ কি ? অর্থ আর কি ? পেট-ফাঁপা। “বুকের ভিতর শ্লেষ্মা” এর অর্থ কি। অর্থ আর কি ? ফুল্‌কোর নলির ভিতর শ্লেষ্মা—অর্থাৎ ব্রংকাইটিস্। ব্রংকাইটিস্ রোগের কথা বলিবার সময় এ সব কথা বলিছি।

হজম বল, পরিপাক বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বলেই হয়। শ্লেষ্মা-ঝিল্লিকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ বলেন। ৫৪৭র পাতে এ কথা বলিছি। যাতে শরীরের বল খাটো করে, তাতে শ্লেষ্মা-ঝিল্লিরও বল খাটো করে। শুদ্ধু শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল কেন, শরীরের বল খাটো হইলে সব রকম যন্ত্রেরই বল খাটো হয়। শক্ত রকম স্বল্পবিরাম জ্বরে (বাতশ্লেষ্ম বিকারে) অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল যেমন খাটো হয়, তেমন আর কোনও রোগে না। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে হজম এত কম হয়। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীকে যা খাইতে দেওয়া যায়, তার পেটে থাকিয়া তা এত পচে। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর পেট এত ফাঁপে। আর এই জন্যেই, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর পথ্যের এত ধরাধর করার দরকার। ছেলেদেরই বাতশ্লেষ্ম বিকারে এ সব পরিচয় ভাল রকম পাওয়া যায়।

বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর বায়ু সরিলে তার দুর্গন্ধে ঘরে তিষ্টিতে পারা যায় না। সে দুর্গন্ধ নাকে গেলে বোধ হয়, যেন তার পেটে কত জীব জন্তু পচিয়া আছে। রোগীর অন্ত্রের ভিতরকার এ অবস্থা থাকিতে তার ব্যামো ভাল করে, কার সাধ্য ? রোগীর অন্ত্রের ভিতরকার এ অবস্থা ঘুচাইবার কথা এর পরই বলিব।

যে কারণেই হোক্, শরীরের বল খুব খাটো হইলে পরিপাক করিবার শক্তিও খুব কমিয়া যায়। শরীরের বল যত কমে, পরিপাক করিবার শক্তিও তত কমে। শরীরের বল একবারে কমিয়া গেলে, পরিপাক করিবার শক্তিও একবারে কমিয়া যায়। শেষে সন্নিপাত অবস্থায় পরিপাক করিবার শক্তি মোটেই থাকে না। যে অবস্থায় রোগীর গায়ে বল মোটেই থাকে না—রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে, সেই অবস্থাকেই সন্নিপাত বলে। সন্নিপাত-বিকারে রোগীর কি অবস্থা হয়, ২১৬—২১৭র পাতে তা বলিছি। এর আগেই বলিছি, পরিপাক না হইলে—হজম না হইলে, ভাত, মাচ, ডাইল, তরকারি বাইরে যেমন পচে, পেটেরও ভিতর তেমনি পচে। বাইরে যে জিনিষ পচে, তা থেকে যেমন দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, পেটের ভিতর যে জিনিষ পচে, তা থেকেও তেমনি

দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে। এই জন্যে, সব রোগেরই সন্নিপাত অবস্থায় রোগীর পেটের ফাঁপ প্রায়ই দেখা যায়। এ ছাড়া, সন্নিপাত অবস্থায় রোগীর পেট-ফাঁপা যত সম্ভব, এত আর কোনও অবস্থায় নয়। কেন না, সন্নিপাত অবস্থায় পরিপাক করিবার শক্তি মোটেই থাকে না। কাজে কাজেই, পেটের ভিতর যা থাকে, হজম না হইয়া তা পচে। সেই পচা জিনিষ থেকে নিয়ত দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠিয়া পেটটী একবারে ঢাক করিয়া ফেলে। পেট ঢাক হবেই ত। রোগীর সন্নিপাত অবস্থা। গায়ে বল মোটেই নাই। কাজে কাজেই, বায়ুও সরল নাই। বায়ু সরল থাকিলেই না, ঢেকুর উঠে, বায়ু সরে। এ দিকে পেটের ভিতরকার পচা জিনিষ থেকে নিয়ত দুর্গন্ধ গ্যাস উঠিতেছে। ও দিকে রোগীর ঢেকুরও উঠিতেছে না, বায়ুও সরিতেছে না। এতে পেট ফাঁপিয়া ঢাক না হইবে কেন? পেট-ফাঁপা অনেক রোগের শেষ উপসর্গ। অনেক শক্ত রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিছি, পেট-ফাঁপার পরই শ্বাস হইয়া রোগী মরিয়া যায়। ফল কথা, পেট-ফাঁপা একটী খুব ভয়ানক উপসর্গ। রোগীর অবস্থা যত খারাপ, তার পেট-ফাঁপায় তত ভয়। রোগ যত শক্ত, রোগীর পেট-ফাঁপায় তত ভয়। এ বুঝাইবার

জন্যে, বেশী কথা বলিবার দরকার নাই। কেবল একটা দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। ওলাউঠার রোগীর পেট কাঁপিলে ভয়ে চিকিৎসকেরও ধড়ে প্রাণ থাকে না। যে রোগই কেন হোক্ না, খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে পর যদি রোগীর পেট কাঁপে, তবে তখনই ঠিক্ করিবে, রোগীর বলেরও দফা রফা হইয়াছে— বাঁচিবারও আশা ভরসার শেষ হইয়াছে। ছেলেদের বেলায় আর বুড়োদের বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে, তেমন আর কারু বেলায় নয়। আঁতুড়ে ছেলের পেট কাঁপিলে বাড়ীতে কান্না-কাটি পড়িয়া যায়—আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো জোওয়ানে তা জানে। কচি ছেলের পেট-কাঁপাই শেষ রোগ— এ কথাটা এক রকম ধরা আছে বলিলেই হয়। কোন রোগের বাড়াবাড়ি হইয়া পেট কাঁপিলে কচি ছেলেদের প্রায়ই বাঁচাইতে পারা যায় না। ছেলে যত কচি, তার পেট-কাঁপার তত ভয়। এ ছাড়া, কচি ছেলেদের ছুতোয় নতায় পেট কাঁপে। আবার তারা মরেও ছুতোয় নতায়। কচি ছেলেদের কোন রকম শক্ত রোগ হইলে, চিকিৎসা করিয়া তাদের প্রায়ই ভাল করিতে পারা যায় না। এই জন্যে, কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম ব্যামো স্যামো হইলে, বৈদ্য ডাকে না। রোজা আনিয়া ঝাড়ান কাড়ান

করায়। আর এই জন্যেই, কচি ছেলে-পিলে এত বেশী মরে। তাতেই বলি, কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম কোন রোগ ঘোগ না হইতে পায়, তারই উপায় করা ভাল। এ সব কথা ধাত্রী-শিক্ষা বৈতে খুলিয়া লিখিয়াছি। ধাত্রী-শিক্ষা দু ভাগ একত্র বাঁধা। দাম আগে দু টাকা ছিল। সাধারণের সুবিধার জন্যে এখন এক টাকা করিয়া দিইছি।

পেটের ভিতরকার জিনিষ পচিলে তা থেকে যে দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, আর সেই গ্যাসে পেটের যে ফাঁপ করে, তার কথা এক রকম মোটামুটি বলিলাম। এ পেট-ফাঁপাকে অপাকের পেট-ফাঁপা বলে। অপাকের পেট-ফাঁপায় দুর্গন্ধ চেকুর উঠে আর বায়ু সরে; পেট ডাকে—পেট ভাট ভুট করে—পেটের ভিতর গুজ্ গাজ্ করে; পেটের এক আধটু কামড় হয়; অম্ল গা-ন্যাকার ন্যাকার করে; আর বাহ্যের চেষ্টা হয়। এ কথা এর আগেই বলিছি।

বাইরের বাতাস পেটে গেলে, পেটের যে ফাঁপ হয়, তার কথা এখনও বলি নাই। বাইরের বাতাস পেটে কেমন করিয়া যায়? না গিলিয়া ফেলিলে বাইরের বাতাস পেটের ভিতর যাইতে পারে না। এ পেট-ফাঁপায় যে চেকুর উঠে, পেটের ভিতরকার

বাতাস তাতেই বাহির হইয়া যায়। সে ঢেকুরের স্বাদও নাই—গন্ধও নাই, বলিলে হয়।

এর আগেই বলিছি, পেট-ফাঁপা বাতশ্লেষ্ম-বিকারের একটী প্রধান লক্ষণ। বাতশ্লেষ্ম-বিকারকে ডাক্তরেরা টাইফয়িড্ ফীবর বলেন। ১৭৫র পাতে বলিছি, রিমিটেণ্ট ফীবরের অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের গোড়ায় ভাল চিকিৎসা না হইলে, ব্যামো ভারি বাড়িয়া গেলে, শেষে রোগীর অবস্থা বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরের রোগীর অবস্থার সঙ্গে অনেক মেলে। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারকে দেশী টাইফয়িড্ ফীবর বলিতে পার। বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরে রোগীর অন্ত্রেরই দুর্দ্দশা বেশী হয়; অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির অবস্থা যত খারাপ হয়, তত আর কোনও যন্ত্রের নয়। এই জন্যে, বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরকে ডাক্তরেরা এণ্টরিক্ ফীবর (ইণ্টেষ্টাইন্যাল্ ফীবর) বলেন। এণ্টরিক ফীবরের ঠিক বাঙ্গালা আন্ত্রিক (অন্ত্র থেকে আন্ত্রিক) জ্বর। বাতশ্লেষ্ম-বিকারেও অন্ত্রের দুর্দ্দশা যে খুবই হয়, পেট-নাবা আর পেট-ফাঁপাই তার প্রমাণ। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারকেও দেশী আন্ত্রিক জ্বর বলিতে পারা যায়। ছেলেদের শক্ত রকম স্বল্পবিরাম-জ্বর আর বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবর,

এক বলিলেই হয়। ছেলেদের ও রকম স্বল্পবিরাম-জ্বরকে ডাক্তরেরা ইন্‌ফ্যাণ্টাইল্ রিমিটেণ্ট ফীবর বলেন। ইন্‌ফ্যাণ্টাইল্ রিমিটেণ্টে ফীবরের কথা এর পর বলিব।

পেট-ফাঁপার কারণ—ধর ত পেট-ফাঁপার কারণ মোটামুটি এক রকম বলিছি। যে কারণেই হোক্, অন্ত্রের বল থাটো হইলেই পেট ফাঁপে। অন্ত্রের বল খাটো হওয়াও যা, পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়াও তাই। আবার পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়াও যা, অগ্নিমন্দ হওয়াই তাই। যা হজম না হয়, তাতেই পেট ফাঁপায়। এই জন্যে, শরীর যদি সুস্থ রাখিতে চাও, তবে যা খাইলে সহজে পরিপাক হয়, তাই খাবে। বারে বারে জোলাপ লইলে অন্ত্রের বল কমিয়া যায়। কাজে কাজেই, বারে বারে জোলাপ লওয়াও পেট-ফাঁপার আর একটী কারণ। মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাইতে পেট ফাঁপে। এই জন্যে, মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাই পেট-ফাঁপার আর একটী কারণ। মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাইকে ডাক্তরেরা হিষ্টিরিয়া বলেন; বৈদ্যরা গুল্মবায়ু বলেন। বাইয়ের ভাল কথা বায়ু।

পেট-ফাঁপা কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে? পেটের ফাঁপ মেয়েরাও ঠিক্ করিতে পারে। পেট-ফাঁপা

ঠিক্ করিবার জন্যে বেশী কিছু জানিবার দরকার নাই। রোগের নামেতেই রোগের পরিচয়। উদরী হইলে—পেটে জল হইলে পেট ডাগর হয়, পেট বড় হয়, পেট উচ হয়। পেট খুব ফাঁপিলেও পেট তেমনি ডাগর হয়, তেমনি বড় হয়, তেমনি উচ হয়। তবেই কেমন করিয়া জানিবে, রোগীর উদরী হইয়াছে, কি পেট ফাঁপিয়াছে ? উদরী-রোগীর পেটে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। পেট-ফাঁপায় পেটে ঘা দিলে, ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। তাতেই বলিতেছি, পেট-ফাঁপা রোগের নামেতেই রোগের পরিচয়। পেটের ভিতর বাতাস পোরা থাকিলেই, পেটে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বহির হয়। বাতাস ছাড়া, পেটের ভিতর আর যাই কেন থাক্ না, পেটে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বহির হয় না। এ ছাড়া, উদরী-রোগীর পেট দু হাত দিয়া বেশ জুত বরাত করিয়া চাপিলে পেট দল্-মল্ করে। তার পর, পেটের ফাঁপ দেখিতে দেখিতে হইতে পারে—হইয়াও থাকে ; কিন্তু পেটে জল তত শীঘ্র হয় না ; পেটে জল হইতে দেরি লাগে।

তার পর এখন পেট-ফাঁপার চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——সোজাসুজি পেট-ফাঁপায় আমি যে অসুদটী সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা	...	...	৩০ গ্রেন্
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	২ ড্রাম
একের নম্বর ব্রাণ্ডি ...	...	...	৬ ড্রাম
টিংচর কার্ডেমম্ কো ...	...	...	৩ ড্রাম
টিংচর জিঞ্জর	...	...	৬ ড্রাম
ডিল্ ওয়াটর	...	...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। পেটের-ফাঁপ যত ক্ষণ না বেশ সারিয়া যাবে, ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ খাবে। অসুদ খাইবার আগে শিশি বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে।

পেটের যে কোন ব্যামোই কেন হোক্ না, পথ্যের খুব ধরাধর না করিলে শুদু অসুদে কিছুই হয় না। (৫৯৮—৬০২র পাতে পেটের-ব্যামোর রোগীর পথ্য—দেখ)। অসুদে হইবার মধ্যে কেবল একটী হয়। অসুদ আর চিকিৎসক, দুয়েরই উপর রোগীর অভক্তি হয়। অসুদে উপকার হইল না কেন, চিকিৎসক নিজে যদি বেশ তলিয়ে বুঝিতে না পারেন, আর রোগীকে তা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে না পারেন,

তবে অস্থদের উপর তাঁরও অভক্তি হবে। অস্থদের উপর চিকিৎসকের অভক্তি হইলেই, আর কি, মস্কিল। সে চিকিৎসকের মুক্তিও নাই—গতিও নাই। যদি বল, চিকিৎসকের আবার গতি মুক্তি কি? রোগীর আরোগ্য আর রোগীর কাছে যশ পাওয়াই চিকিৎসকের গতি মুক্তি। অস্থদের উপর যে সব চিকিৎসকের ভক্তিও নাই, বিশ্বাসও নাই, সে সব চিকিৎসককে আমি নাস্তিক চিকিৎসক বলি। যাঁরা রোগ বেশ ঠাউরে উঠিতে পারেন না—রোগ বুঝিয়া ঠিক্ ঠাউরে তার মত উপযুক্ত অস্থদ দিতে পারেন না—ফল কথা, যাঁরা ঝোপ বুঝে কোপ মারিতে পারেন না, চিকিৎসা করিতে গিয়া তাঁরাই বারে বারে ঠকেন। এই রকম করিয়া বারে বারে ঠকিয়া শেষে তাঁরাই নাস্তিক হইয়া দাঁড়ান। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া যদি কেউ বারে বারে শোক, দুঃখ, ও কষ্ট পায়, তবে ঈশ্বরের মহিমার উপর তার সন্দেহ্ জম্মে। চাই কি, শেষে সে ঈশ্বর না মানিতেও পারে। আপনার শোক, দুঃখ, ও কষ্টের নিদান (আদি কারণ, আসল কারণ) না বুঝিতে পারিয়া এ ব্যক্তির নাস্তিক হওয়া, আর রোগের উপর অস্থদ খাটাইতে না পারার নিদান বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসকের নাস্তিক হওয়া, দুই-ই সমান।

উপরে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সোজা-সুজি পেট-ফাপার সেটী খুব ভাল অসুদ। পেটের কাম-ড়েরও সেটী বেশ অসুদ। ডিল্-ওয়াটরের বদলে পেঁপর্‌মিণ্ট ওয়াটর দিলে পেটের কামড় আরও শীঘ্র ভাল হয়। পেটের কামড়ের—পেট-কামড়ানির বাড়া-বাড়ি হইলে রোগীকে ৫৯৫র পাতের মর্ফিয়া-মিক্‌শ্চর খাইতে দিবে। মর্ফিয়া-মিক্‌শ্চর খাওয়াইবার নিয়ম সেই পাতেই লেখা আছে। বলিতে গেলে, এই মর্ফিয়া-মিক্‌শ্চরে না সারে, এমন যন্ত্রণাই নাই। ৫৯৭—৫৯৮র পাতে এ কথা বলিছি।

পেটের কামড়—পেট-কামড়ানি ভারি সাধারণ ব্যামো। ব্যামো খুব সাধারণ বলিয়া রোগী তাতে বড় কম কষ্ট পায় না। তাতেই বলিতেছি, পেটের কামড়ের—পেট-কামড়ানির অসুদ সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত।

অসুদের দোকানে—ডিস্পেন্সরিতে আদার এক রকম আরোক বিক্রি হয়। ডাক্তরেরা সে আরোককে এসেন্স অব্ জিঞ্জর্ বলেন। খুব গরম জলের সঙ্গে আদার সেই আরোক খাইলে সোজাসুজি পেট-ফাঁপা ভাল হয়। খুব গরম জলের সঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডিও খাইলে সোজা-সুজি পেট-ফাঁপা সারে। ব্রাণ্ডির সঙ্গে যে জল খাবে, তা খুব গরম গরম

খাওয়া চাই। জল যত গরম হবে, ততই ভাল। তাই বলিয়া, বেশী গরম জল খাইয়া যেন মুখ ঝুক্ পোড়াইয়া ফেলিও না। আদার আরক (এসেন্স অব্ জিঞ্জর) এক এক বারে ২০।২৫ ফোটা করিয়া খাবে। একের নম্বর ব্রাণ্ডি এক এক বারে এক ড্রামও খাইতে পারে—দু ড্রামও খাইতে পার। গরম জলের মাত্রা এক ছটাকের বেশী নয়।

সোজা-সুজি পেট-ফাপার চিকিৎসার কথা বলিলাম।

পেট-ফাঁপার যদি বাড়া-বাড়ি হয় আর রোগীর তাতে ভারি কষ্ট হইয়া উঠে, তবে নীচে যে অস্থুদটী লিখিয়া দিলাম, দেরি না করিয়া তাকে সেই অস্থুদটী খাইতে দিবে।

কার্ব্বনেট্ অব ম্যাগ্নিসিয়া	...	৮০ গ্রেন্
লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রা ক্ট অব্ ওপিয়ম্	...	৩০ মিনিম্
সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর	... ...	৩ ড্রাম্
পেপারমিণ্ট ওয়াটর্	... ...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যত ক্ষণ পেটের ফাঁপ আর যাতনা থাকিবে, ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অস্থুদ নিয়ম করিয়া খাইতে দিবে। এ ছাড়া, আধ ছটাক (এক ঔন্স) ডিল্

ওয়াটরের সঙ্গে ৪ ফোটা করিয়া ক্যাজুপট অইল্ (ভুর্জ্জপত্রের তেল) ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিবে। ক্যাজুপটঅইল্ পেট-ফাঁপার ভারি চমৎকার অসুদ। ক্যাজুপট্ অইলে পেট-কাপা যত শীঘ্র সারে, তত আর কিছুতেই নয়। ক্যাজুপট্ অইল শুধু পেট-ফাপার অসুদ নয়; আরও অনেক রোগের অসুদ। মেটিরিয়া মেডিকায় সে সব কথা বলিব।

এই দুই অসুদে যদি পেট-ফাঁপা তড়ি ঘড়ি কমিয়া যায় ত ভালই। নৈলে, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে তা পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে।

ক্যাষ্টর অইল	...	...	...	১ ঔন্স
তার্পিণ তেল	...	...	...	১ ঔন্স
টিংচর য়্যাসাফিটিডা (হিঙের আরোক)			...	৪ ড্রাম্
সাবানের জল	...	...		৩ পোওয়া

একত্র মিশাইয়া রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দেও।

হাতে সয়, পোওয়া তিনেক আন্দাজ এমন গরম জল একটা মাল্‌শায় করিয়া লও। তার পর, সাবান দিয়া হাত ধুইবার আগে-জল দিয়া দু হাতে করিয়া সাবান যে রকম ফেণায়, মাল্‌শার জলেও বারে বারে সেই রকম করিয়া সাবান ফেণাও আর সেই জলে হাত ধোও। মাল্‌শার জল যত ক্ষণ

না ঠিক্ সাবান-গোলা জলের মত শাদা, ঘন, আটা আট্টা, আর ফেণা ফেণা না হবে, তত ক্ষণ ঐ রকম করিয়া সাবান গুলিবে। তার পর, ক্যাষ্টর অইল্, তার্পিণ, আর হিঙের আরক মাল্‌শার সাবান-গোলা জলে ঢালিয়া দিবে। শেষে মাল্‌শার সব জল খানি পিচ্‌কিরি করিয়া রোগীর গুহ্যদ্বারের ভিতর চালাইয়া দিবে। কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, পিচ্‌কিরির জল তখনই তখনই বাহির হইয়া না আসে, তার জন্যে কি ফিকির বা উপায় করিতে হয়, ৫৮১—৫৮২র পাতে সে সব বেশ করিয়া বলিছি।

জুত বরাত করিয়া রোগীর অন্ত্রের ভিতর পিচ্‌কিরির জলটা যদি আধ ঘণ্টা খানেক রাখিয়া দিতে পার, তবে এক বারকার পিচ্‌কিরিতেই রোগীর অর্দ্ধেক পেট-ফাঁপা সারিয়া যায়। পিচ্‌কিরির জল যত জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির হইয়া আসিবে, রোগীর পেটের ফাঁপও তত কমিয়া যাবে। পিচ্‌কিরির জল জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির হইয়া আসে কেন? অন্ত্রের ভিতরকার গ্যাস্‌ই বল, আর বাতাসই বল, তেজে বাহির হইয়া আসে বলিয়া পিচ্‌কিরির জলও জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির হইয়া আসে। পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে পিচ্-

কিরিতে তা যত শীঘ্র কমিয়া যায়, তত আর কিছু-তেই নয়। ফল কথা, পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ রোগীর জীবন রক্ষা করিবার যেমন উপায় পিচ্‌কিরি, তেমন উপায় আর নাই। কয় বার পিচ্‌কিরি করিলে পেটের ফাঁপ একবারে যাবে, আগে থাকিতে তা কিছু ঠিক্ করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই জন্যে, পেটের ফাঁপ যে কয় দিন থাকিবে, রোজ দু বার হোক্, তিন বার হোক্, সাবানের জলের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইল্, তার্পিণ, আর হিঙের আরক রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে ঐ রকম করিয়া পিচ্‌কিরি করিবে। অনেক জায়গায় রোজ এক বারের বেশী পিচ্‌কিরি দিতে হয় না। পিচ্‌-কিরি কয় বার দিতে হবে, রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তুমি তা ঠিক্ করিয়া লইবে। পেট ফাঁপার বাড়া-বাড়ি দেখিলে, পিচ্‌কিরি দিয়া তখনই পেটের ফাঁপ কমাইয়া দিবে। পিচ্‌কিরির কলটা বিগ্‌ড়ে গিয়াছে, তার্পিণও নাই—হিঙের আরোকও নাই—সাবান যে টুকু ছিল, কাল্ তা ফুরাইয়া গিয়াছে—কাল্ পিচ্‌কিরি দিবার চেষ্টা দেখিব; আজ্ খাবার অসুদ দিয়া দেখি, পেটের ফাঁপ কমে কি না—এ রকম করিয়া ভাবিয়া যেন রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিও না। ঠিক্ এই রকম ভাবিয়া আর ঠিক্ এই

রকম কাজ করিয়া, অনেক মহাশয় অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। পিচ্‌-কিরি দিবার কোনও উপায় নাই ভাবিয়া, খাবার অম্লদের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তর মহাশয় সন্ধ্যার সময় বাড়ী গেলেন। রাত্রি দুপরের আগে থেকেই রোগীর নিশ্বাসটা জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। নিশ্বাসের জোর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর মেয়েরা কাঁদা-কাটি আরম্ভ করিল। এত রাত্রে লোক পাঠানর কর্ম্ম নয় ভাবিয়া, বাড়ীর কর্ত্তা নিজেই ডাক্তরের কাছে দৌড়িলেন। ডাক্তর খবর পাইয়া এক-ছুটেই তাঁর সঙ্গে ছুটিলেন। গিয়া দেখেন রোগীর শ্বাস হইয়াছে। তাই ত! পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে এত দূর হয়, তা ত জানিতাম না! আমি ত সন্ধ্যার সময় দেখিয়া গিইছি, রোগীর আর কোনও উপসর্গ ছিল না। তবে ত শুদ্ধ পেট-ফাঁপারই বাড়াবাড়ি হইলে রোগী মরে! আজি আমার জ্ঞান হইল। সন্ধ্যার সময় যখন পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি দেখিছিলাম, তখন শুদ্ধ খাবার অম্লদের ব্যবস্থা না করিয়া যদি পিচ্‌কিরি দিতাম, তা হইলে বোধ করি আজি রাত্রে রোগীর এ অবস্থা কখনই হইত না; আমাকেও এ বিষম লজ্জায় পড়িতে হইত না—এই রকম ভাবিতে ভাবিতে

নিতান্ত অপ্রতিভ ভাবে তিনি রোগীর আত্মীয় স্বজনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাইতে লাগিলেন। কি অছিলায়—কি বলিয়া রোগীর কাছ থেকে উঠিয়া যাইবেন, কেবল তাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে গলা খাঁকা দিয়া থুতু ফেলিবার অছিলায় বাইরে উঠিয়া গেলেন। এখন ত পলাইয়া বাঁচি, তার পর কাল্ সকালে যা হয় বলিব, কি শুনিব।

পেটের খুব বেশী ফাঁপ হইলে রোগীর শ্বাস হয় কেন? রোগীর নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় কেন? কেন, তা বলি। বুকের খোল আর পেটের খোল, এই দুই খোলের মাঝখানে মাংসের একটা পর্দ্দা আছে। সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা ডায়াফ্রাম্ বলেন। ডায়াফ্রামের কথা ৫২১র পাতে বলিছি। যে নিশ্বাসে বাইরের বাতাস ফুল্‌কোর ভিতর যায়, আর ফুল্‌কো দুটী ফাঁপিয়া একবারে প্রকাণ্ড হয়। এই প্রকাণ্ড দুটী ফুল্‌কোর জন্যে বুকের খোল বড় হওয়ার দরকার। এ দিকে বিধাতার আবার এমনি কল যে, বুকের খোল বড় হওয়ার যে দরকার হয়, সেই অমনি ডায়াফ্রাম্ নীচের দিকে নামিয়া পড়ে। ডায়াফ্রাম্ নীচের দিকে নামিয়া গেলে, বুকের খোলের ভিতর ঢের জায়গা হয়। কাজেই, বাতাস-পোরা প্রকাণ্ড দুই ফুল্‌কোর

জন্যে জায়গার অনাটন হয় না। তার পর যে নিশ্বাস ফেলি, সেই অমনি ফুল্‌কোর ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া যায়; আর ফুল্‌কো দুটী একবারে ছোট হইয়া যায়। এ রকম ছোট দুটী ফুল্‌কোর জন্যে বুকের খোলও ছোট হওয়ার দরকার। বুকের খোল ছোট হওয়ার যে দরকার হয়, সেই অমনি ডায়াফ্রাম্‌ উপর দিকে উঠিয়া যায়। ডায়াফ্রাম্‌ উপর দিকে উঠিয়া গেলে, বুকের খোলের ভিতরকার জায়গা ঢের কমিয়া যায়। আমরা যত বার নিশ্বাস লই, তত বারই ডায়াফ্রাম্‌ এই রকম করিয়া নীচের দিকে নামিয়া পড়ে। আর যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বারই ডায়াফ্রাম্‌ এই রকম করিয়া উপর দিকে উঠিয়া যায়। রোগীর পেট ফাঁপিয়া ঢাক হইয়াছে। ভিতরে বাতাস জমিয়া পেট (পাকস্থলী) আর অন্ত্র এত ফুলিয়াছে যে, ডায়াফ্রাম্‌কে উপর দিকে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ, রোগীর নিশ্বাস লইবার কেমন সুবিধা! ডায়াফ্রাম্‌ই বা নীচের দিকে কেমন করিয়া নামে? বুকের খোলই বা কেমন করিয়া ডাগর হয়? বাতাস-পোরা ফুল্‌কোরই বা কেমন করিয়া জায়গা হয়? জায়গার অনাটনে ফুল্‌কো মোটে গা মেলাতেই পারে না! তার ভিতর

বাতাস যাবে কেমন করিয়া ? কাজেই, রোগীর শ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলাকে ভাল কথায় শ্বাস বলে। যে কারণেই হোক্, সহজ বেলার মত পূর নিশ্বাস লইবার কোন রকম ব্যাঘাত ঘটিলেই ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে হয়। ফি নিশ্বাসে ফুল্‌কোর ভিতর বাতাস যত কম যাবে, নিশ্বাসও তত ঘন ঘন পড়িবে। পূর নিশ্বাস লইতে না পারিয়া, সেই ক্ষতি পুরাইবারই জন্যে যেন রোগী অত ঘন ঘন নিশ্বাস লয়। খুব হিসাব করিয়া ঠাউরে দেখিলে, ফলে তাই-ই বটে। তবেই দেখ, খুব শক্ত রোগীর পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে তার শ্বাস হইতেও বিস্তর ক্ষণ লাগে না, মরিতেও বিস্তর ক্ষণ লাগে না।

কচি ছেলেদের পেট-ফাঁপার বাড়া-বাড়ি হই-য়াছে কি, অমনি শ্বাস হইয়াছে। পেট ফাঁপিলে কচি ছেলে অনেক জায়গায় দেখিতে দেখিতে মারা যায়। ছেলে যত কচি, তার পেট-ফাঁপার তত ভয়। এ কথা এর আগেই বলিছি। ছেলেদের পেট-ফাঁপা, পেটের কামড়, পেট-ফাঁপার দরুণ পেট ব্যথা, আর হিক্কি—এ সব অস্বস্তির যেমন অসুদ ডিল্-ওয়াটর, তেমন অসুদ আর নাই। ছেলেদের অল্প স্বল্প পেট-ফাঁপা শুদ্ধু ডিল্-ওয়াটরেই সারে।

ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক করিয়া ডিল্-ওয়াটর মাঝে মাঝে খাওয়াইলে ছেলেদের সোজা-সুজি পেট-ফাঁপা শীঘ্রই সারিয়া যায়। তাদের পেট-ফাঁপার একটু বাড়াবাড়ি হইলে, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সে অসুদটী আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি।

কার্ব্বনেট্ অব্ ম্যাগনীশিয়া		...	১২ গ্রেন্
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	১২ মিনিম্
টিংচর কার্ডেমম্ কো	...	...	১৮ মিনিম্
সিরপ জিঞ্জর	...	...	৩৬ মিনিম্
ডিল-ওয়াটর	...	...	১½ (দেড়) ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। যত ক্ষণ পেটের ফাঁপ থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ খাওয়াইবে। এখানে যে মাত্রায় অসুদ লিখিয়া দিলাম, এক বছরের ছেলের পক্ষে সে মাত্রা জানিবে। এক বছরের ছেলের অসুদের মাত্রা জানা থাকিলে, ছেলের বয়স বুঝিয়া অসুদের মাত্রা ঠিক্ করা শক্ত নয়।

এই অসুদে যদি পেটের ফাঁপ তড়ি ঘড়ি কমিয়া যায় ত ভালই। নৈলে, ৮০৫র পাতে পিচ্‌কিরির যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, কাচের পিচ্‌কিরিতে করিয়া সেই অসুদ ছেলের গুহ্যদ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিবে। সেখানে পিচ্‌কিরির অসুদ পূর

মাত্রায় লিখিয়া দিইছি। বিশ বছরে পূর মাত্রা; এই হিসাব করিয়া ছেলের বয়স বুঝিয়া পিচ্‌কিরির অস্থুদেরও মাত্রা ঠিক্ করিয়া লইবে। সেখানে পিচ্‌কিরি দিবার যে নিয়ম আর যে জুত বরাত লিখিয়া দিইছি, এখানেও পিচ্‌কিরি দিবার সেই নিয়ম আর সেই জুত বরাত জানিবে।

পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়িতে যে ছেলে মর-মর হইয়াছে, পিচ্‌কিরি দিয়া সে ছেলেকেও বাঁচাইতে পারা যায়। সে রকম মর-মর ছেলে অনেক জায়-গায় বাঁচানও গিয়াছে। ফল কথা, ছেলেরই বা কি, বুড়োরই বা কি, আর জোওয়ানেরই বা কি, পেট-ফাপার বাড়াবাড়ি হইলে, পিচ্‌কিরি দিতে কখনও ভুলিও না; পিচ্‌কিরি দিতে কখনও ইতস্ততও করিও না। এ ছাড়া, যদি দেখ যে, ছেলে বড় দুর্ব্বল হইয়াছে আর নেতিয়ে পড়িয়াছে, তবে দশ পোনর মিনিট অন্তর ডিল-ওয়াটরের সঙ্গে তিন চারি ফোটা করিয়া একের নম্বর ব্রাণ্ডি খাওয়াইবে। এক বছরের ছেলেকে এক এক বারে চারি পাঁচ ফোটা করিয়া ব্রাণ্ডি দিতে পার।

য্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ য্যামোনিয়াও ছেলে-দের পেট-ফাঁপার আর একটা ভাল অস্থুদ। এই

জন্যে, খুব দুর্ব্বল ছেলেদের পেট-ফাঁপায় ব্রাণ্ডির সঙ্গে দু এক ফোঁটা করিয়া য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব্ য়্যামোনিয়া খাওয়াইলে আরও উপকার হয়। ছেলেদের পেট-ফাঁপার দরুণ পেট-ব্যথা, য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ য়্যামোনিয়ায় যেমন শীঘ্র সারে, তেমন আর কিছুতেই নয়।

হিংও ছেলেদের পেট-ফাঁপার খুব ভাল অসুদ। ১০ ঔন্স জলে ১ ড্রাম্ টিংচর য়্যাসাফিটিডা (হিঙের আরক) দিয়া চা-চামচের এক চামচ করিয়া সেই অসুদ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইলে ছেলেদের পেট-ফাঁপা খুব শীঘ্র সারিয়া যায়। এ অসুদ ছেলেরা বেশ খায়।

ছেলেরই বা কি, বুড়োরই বা কি, আর জোওয়ানেরই বা কি, পেট-ফাঁপায় কখনও জোলাপ দিও না। জোলাপে পেট ফাঁপা বাড়ে বৈ কমে না। পেট-ফাঁপায় জোলাপের অসুদ খাওয়ান ভাল নয়, জোলাপের অসুদ ঐ রকম করিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া দেওয়া ভাল।

তার পর, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর পেট-ফাঁপার চিকিৎসার কথা বলি। রোগীর পেট ফাঁপিয়া ঢাক হইয়াছে, মাঝে মাঝে তার এমনি দুর্গন্ধ বায়ু সরিতেছে যে, তার কাছে তিষ্ঠন ভার। এ ছাড়া, বাতশ্লেষ্ম বিকারে রোগীর যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, সে

অবস্থা ত উপস্থিতই আছে। এখন তার কি রকম চিকিৎসা করিবে? এখন তাকে কি অষুদ দিবে? বাতশ্লেষ্ম-বিকারের এ রকম রোগীকে আমি যে সব অষুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) খাবার অষুদ

কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়া		...	১ ড্রাম্
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	৪ ড্রাম
একের নম্বর ব্রাণ্ডি	...	...	৩ ঔন্স
টিংচর কার্ডেমম্ কো	...	...	৬ ড্রাম
টিংচর জিঞ্জর	...	...	৬ ড্রাম্
ডিল্-ওয়াটর	...		১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। যত ক্ষণ পেটের ফাঁপ থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অষুদ খাইতে দিবে। এই অষুদের সঙ্গে (১০) দশ ফোটা করিয়া তার্পিণও দু ঘণ্টা অন্তর দিবে। জ্বরের সঙ্গে পেটের ফাঁপ থাকিলে তার্পিণে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কোনও অষুদে নয়। এ ছাড়া, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের তার্পিণ একটা খুব ভাল অষুদ। স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে রোগীর যে অবস্থা হয়, যে অবস্থা দেখিয়া ডাক্তর-মহাশয়েরা বলেন রোগীর টাইফয়িড ফীবর হইয়াছে,

তার্পিণ সে অবস্থার যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর দুটী আছে কি না, বলিতে পারি না। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে তার্পিণ দিবার কথা মেটীরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। এখানে মোটামুটি জানিয়া রাখ, তার্পিণ বাতশ্লেষ্ম-বিকারের অসুদ নয়, রোগীর জীবন। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে জুত বরাত করিয়া তার্পিণ দিতে পারিলে, খুব খারাপ রোগীও জায় হইতে পারে না।

(২) পিচকিরির অসুদ।

৮০৫এর পাতে পিচ্‌কিরির যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, সেই অসুদ রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। সেখানে পিচ্‌কিরি দিবার যে নিয়ম আর যে জুত বরাত লিখিয়া দিইছি, এখানেও পিচ্‌কিরি দিবার সেই নিয়ম আর সেই জুত বরাত জানিবে। রোজ সকালে এক বার আর সন্ধ্যার আগে এক বার, নিয়ম করিয়া পিচ্‌কিরি দিবে। যত দিন পেটের দোষ নির্দ্দোষ হইয়া না সারিবে, তত দিন নিয়ম করিয়া পিচ্‌কিরি দেওয়া চাই। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর পেটের দোষেই চিকিৎসককে এক বারে হক্‌চকিয়ে দেয়। পেটের দোষ শুধরে দিতে না পারিলে বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগী ভাল করিতে পারা যায় না।

পেটের দোষ কাকে বল? পেটের দোষ কি? পেটের ফাঁপকে পেটের দোষ বলি। পেট-নাবাকে পেটের দোষ বলি। ছিড়িক্ ছিড়িক্ করিয়া বারে বারে পাতলা দুর্গন্ধ বাহ্যে হওয়াকে পেটের দোষ বলি। খুব দুর্গন্ধ বায়ু-সরাকে পেটের দোষ বলি। খুব দুর্গন্ধ গুটলে মল বাহ্যে হওয়াকে পেটের দোষ বলি। রকম বি-রকম, রং বি-রঙের বাহ্যে হওয়াকে পেটের দোষ বলি। আবার বাহ্যে না হওয়াকেও পেটের দোষ বলি। মোটামুটি ধর ত, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে পেটের দোষ এই কয় রকমই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দেখিছি, ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ, হিঙের আরক, আর সাবানের জলের পিচ্‌কিরিতে সব রকম পেটের-দোষই বেশ সারে। পেটের ফাঁপ গেলে, আর মলের আকার প্রকার, রং, আর গন্ধ সহজ মলের মত হইলে তবে পিচ্‌-কিরি দেওয়া বন্ধ করিবে। বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর সব রকম পেটের-দোষই পিচ্‌কিরিতে সারে। তাতেই বলি, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীকে বাঁচাইবার প্রধান উপায়ই পিচ্‌কিরি। এমন উপায় যেন হেলা করিয়া হারাইও না। ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ, হিঙের আরক, সাবান; আর পিচ্‌কিরির বাক্স—এই কয়টা জিনিষ যদি ঘর করিয়া রাখিতে

পার, আর সময় মত নিয়ম করিয়া সেই সব জিনিষ ব্যবহার করিতে পার, তবে বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর চিকিৎসায় তুমি কখনও অপ্রতিভ হইবে না।

পাড়াগাঁয়ে পিচ্‌কিরির ব্যবহারটা খুবই কম—নাই বলিলেও হয়। গৃহস্থদের কথা দূরে থাক্, পিচ্‌কিরির নামে পাড়াগাঁয়ের ডাক্তর কবিরাজরাও ভয় পান। এ রকম ভয়ের কারণ আর কিছুই না। পিচ্‌কিরির ব্যবহার, পিচ্‌কিরির দোষ গুণ, তাঁদের জানা নাই বলিয়াই তাঁরা ভয় পান। কুইনাইন্ আমাদের দেশে যখন বেশ চলিত হয় নাই, তখন জ্বরের রোগীকে কুইনাইন্ দিতে চিকিৎসকেরাও ভয় পাইতেন। এখন সেই কুইনাইন্ দিতে মেয়েরাও ডরায় না! জিনিষের ব্যবহার জানা থাকার এত গুণ! গায়ের তাত থাকিতে রোগীকে কুইনাইন্ দিতে এখন বড় বড় ডাক্তরেরাও ভয় পান। ছুট্‌লে ডাক্তরদের ত কথাই নাই। কিন্তু গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ দেওয়াই স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) থেকে রোগীকে বাঁচাইবার এক মাত্র উপায়—গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে যখন সকলেই এ জানিতে পারিবে, তখন গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ দিতে মেয়েরাও ভয়

পারে না।" হাঁপ-কাশের রোগীর হাঁপ চাগাইলে- এক ঔন্স (আধ ছটাক) ডিল্ ওয়াটরের সঙ্গে ১০গ্রেণ আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্, আধ ড্রাম্ সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথর, আর আধ ড্রাম্ টিংচর বেলাডনা খাওয়াইয়া দিলে প্রায় তখনই তখনই তার হাঁপ থামিয়া যায়। যিনি এ অসুদের ব্যবহার জানেন—যিনি এ অসুদ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন, হাঁপ-কাশের রোগীর হাঁপ চাগাইলে তিনি তাকে এ অসুদ দিতে কখনও ভয় পান না—কখনও ইতস্ততও করেন না। কিন্তু যাঁরা এ অসুদের ব্যবহার জানেন না, টিংচর বেলা-ডনার মাত্রা দেখিয়াই তাঁদের মাথা ঘুরিয়া যায়। এ রকম প্রেস্ক্রপ্‌শন্ (ব্যবস্থা-পত্র) তাঁদের হাতে পড়িলেই, তাঁরা অমনি বলিয়া বসেন, প্রেস্ক্রপ্‌শন্ লিখিতে ডাক্তর মহাশয় ভুল করিয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! টিংচর বেলাডনার মাত্রা আধ ড্রাম্! আমি ত ভরসা করিয়া রোগীকে এ অসুদ খাওয়া-ইতে বলিতে পারি না।" আমার বেশ মনে আছে, মাস পাঁচ ছয় হইল আমাদের দেশের এক জন গণ্য মান্য লোকের পৌত্রের কোষ্ঠবদ্ধ হইছিল। শিশুর বয়স তখন দু মাসের বেশী নয়। ছেলে আজি চারি দিন বাহ্যে যায় নাই। মাঝে মাঝে, থেকে থেকে চম্‌কো উঠিতেছে, আর চীৎকার করিতেছে।

ছেলের যে রকম ভাব গতিক দেখিতেছি, বোধ করি শীঘ্রই তার তড়্‌কা হবে। পিতামহের মুখে পৌত্রের অসুখের এই রকম পরিচয় পাইয়া, আমি ব্রোমাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ খাওয়াইতে বলিলাম, আর পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে করাইয়া দিতে বলিলাম। পিচ্‌কিরির নাম করিতেই তিনি যেন একবারে আঁত্‌কে্য উঠিলেন। কি সর্ব্বনাশ! অতটুকু ছেলেকে কি পিচ্‌কিরি দেওয়া যায়! পিচ্‌কিরির জল যদি বাহির হইয়া না আসে, তবেই ত বিপদ্‌! পিচ্‌কিরি দিবার সময়, হয় ত, ছেলে কাঁদিয়াই সারা হবে! পিচ্‌কিরি লইতে যে কষ্ট হয়, অতটুকু ছেলে সে কষ্ট সৈতে পারিবে ত? কথায় কথা বাড়ে—অমন তর সজ্ঞান বুড়োর অজ্ঞানের মত কথার উত্তর দেওয়া সোজা নয় ভাবিয়া, তাঁকে বলিলাম, আপনার কোনও চিন্তা নাই; আমি পিচ্‌কিরি দিয়া এখনই ছেলের বাহ্যে করাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া, ছটাক খানেক গরম জলে বেশ করিয়া সাবান গুলিলাম। সেই সাবান-গোলা জলে ড্রাম্‌ খানেক অলিব্‌ অইল্‌ (সুইট অইল্‌) ঢালিয়া দিলাম। ঘরে ক্যাষ্টর অইল ছিল না বলিয়া তার বদলে সুইট অইল দিইছিলাম। তার পর, কাচের পিচ্‌কিরিতে করিয়া সেইখানি সব তার গুহ্য-

দ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিলাম। পিচ্‌কিরির জল তখনই তখনই বাহির হইয়া না আসে, এই জন্যে, ন্যাকড়ার পুঁটলি দিয়া ছেলের গুহ্যদ্বার খানিক ক্ষণ চাপিয়া রাখিলাম। শিশু যখন খুব বেগ দিতে লাগিল, তখনই তার গুহ্যদ্বার থেকে ন্যাকড়ার পুঁটলি সরাইয়া লইলাম। ন্যাকড়ার পুটলি যে সরাইয়া লইলাম, সেই অমনি পিচ্‌কিরির জল যেন পিচ্‌কিরি দিয়া বাহির হইয়া আসিল। পিচ্‌কিরির জলের সঙ্গে বাতাস আর গুটলে মল বাহির হইয়া আসিল। তার পর সহজ মলও খানিক নির্গত হইল। বাহ্যে হইয়া গেলেই ছেলে চক মেলিল, আর সহজ বেলার মত চাইতে লাগিল। পিচ্‌কি-রির এমন প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, আর পৌত্রকে চক মেলিতে দেখিয়া, পিতামহের তখন কথা ফুটিল। পিচ্‌কিরি দেওয়া এমন সহজ ব্যাপার—আর পিচ্‌-কিরির এমন প্রত্যক্ষ ফল—এ আমার ধারণাই ছিল না। আগে আমি পিচ্‌কিরির নামেতেই ভয় পাই-তাম। আজি আমার সে ভয় ঘুচিয়া গেল। তার পর, পিতামহের মুখ এই রকম খুসি খুসি দেখিয়া আমি বিদায় হইলাম। তাতেই বলিতেছি, পিচ্‌কিরির ব্যবহার, পিচ্‌কিরির দোষ গুণ, জানা নাই বলিয়াই পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা পিচ্‌কিরিকে এত ভয় করেন।

বাতশ্লেষ্ম বিকারের রোগীর চিকিৎসা করিতে তোমাকে ডাকিল। তুমি গিয়া দেখিলে, রোগীর পেট ফাঁপিয়া ঢাক হইয়াছে। তুমি পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে করাইতে চাহিলে। এমন দুর্ব্বল রোগীকে কি পিচ্‌কিরি দেওয়া যায়? এমন দুর্ব্বল রোগীকে পিচ্‌কিরি দিতে বলিতে আমাদের ভরসা হয় না। খাবার অষুদের সঙ্গে এমন কোনও অষুদ যোগ করিয়া দিন, যাতে রোগীর দু এক বার খোলসা দাস্ত হয়। রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা এ রকম অনুরোধ করিলে তুমি কি করিবে? তাঁদের অনুরোধ শুনিবে, না আপনার বিবেচনা মত কাজ করিবে? তাঁদের অনুরোধ শুনিলেই অপ্রতিভ হইবে। পিচ্‌কিরি যে দুর্ব্বল রোগিদেরই পক্ষে ব্যবস্থা, তাঁরা তা জানেন না। জানিবেনই বা কেমন করিয়া? পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ রোগীর জীবন রক্ষা করিবার যেমন উপায় পিচ্‌কিরি, তেমন উপায় আর নাই—এও তাঁরা জানেন না। ৬৫২র পাতে বলিছি, রোগীর আব্‌দার শুনিয়া, কি রোগীর বাড়ীর লোকের অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া রোগীকে কুপথ্য দিলে, সে কুপথ্যের ফলাফলের জন্যে চিকিৎসককে তারা অপ্রতিভ করিতে ছাড়ে না—এ কথাটা সব চিকিৎসকেরই যেন মনে

থাকে। তাতেই এখানেও বলিতেছি, রোগীর আত্মীয় স্বজনের উপরোধে পড়িয়া যদি পিচ্‌কিরি না দেও, আর রোগী তোমার হাতে মারা পড়ে, তবে তখন তারা তোমাকে অপ্রতিভ করিতে কখনও ছাড়িবে না। আমি ত পিচ্‌কিরি দিবারই ব্যবস্থা করিছিলাম। আপনারাই ত পিচ্‌কিরি দিতে দিলেন না। রোগী মারা গেলে, তোমার এ সব ওজর আপত্তির, কথা তাদের কাছে তখন থাই পাবে না। পিচ্‌কিরি না দিলে রোগী মারা যাবে—এ যদি আপনি ঠিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন, তবে কেন আপনি জিদ্ করিয়া পিচ্‌কিরি দিলেন না? চিকিৎসার ভাল মন্দ আমরা কি জানি? আমরা ও বিষয়ে মূর্খ বৈ ত না। আমাদের অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া যদি আপনারা কাজ করিলেন, তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আর তফাত কি থাকিল? এ সব কথা বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজন শেষে তোমার গালে চূণ কালি দিতে পারে। তাতেই বলিতেছি, মোটামুটি একবারে জানিয়া রাখ, গৃহস্থের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, যতই কেন থাক্ না, তাঁর অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া তোমার বিবেচনার বিরুদ্ধ কোনও কাজ করিবে না।' চিকিৎসা করিতে গিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া, রোগীর আত্মীয়

স্বজনকে বুঝান সোজা নয়—সুখেরও বিষয় নয়। আমি ত বলি তর্ক-বিতর্ক করাই উচিত নয়। তুমি চিকিৎসক; চিকিৎসার বৈ পড়িয়াছ; দশ জায়গায় দশ রকম রোগের চিকিৎসা করিয়াছ; কোন রোগে কি করিলে কি ফল হয়, তুমি তা হাতে কলমে করিয়া দেখিয়াছ। রোগীর আত্মীয় স্বজন তার কিছু জানেনও না, শুনেনও নাই। তাঁদের সঙ্গে তোমার তর্ক-বিতর্ক তবে কেমন করিয়া চলিতে পারে? তাতেই বলিতেছি, তর্ক-বিতর্ক করিও না; হাতে কলমে করিয়া হাতে হাতে ফল দেখাইয়া দেও; তবে তাঁদের দিব্য জ্ঞান জন্মিবে।

৬৫২র পাতে বলিছি, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, বা প্রতিজ্ঞার একটু ত্রুটি হইলে চিকিৎসকের আর রক্ষা নাই। সেই একটু ত্রুটিতেই তাঁর মান সম্ভ্রম সবই যায়। পিচ্‌কিরি দিবারও বেলায় যেন এ সব কথা মনে থাকে। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর পেট ফাঁপিলে পিচ্‌কিরি দিতে হয়, জান; তাই বলিয়া রোগীর শ্বাস হইলেও পিচ্‌কিরি দিতে হবে, এমন কিছু কথা নাই। সব কাজেই বিবেচনার দরকার। তোমারও পিচ্‌কিরি দেওয়া সারা হইল—রোগীও খাবি খাইয়া মরিল। রটনা হইল, পিচ্‌কিরি দিয়াই তুমি রোগীটেকে মারিলে। ঘটনা কিন্তু

তা নয়। রোগী মরিতই। তবে তফাত এই যে, তুমি স্থির হইয়া রোগীর কাছে যদি খানিক ক্ষণ বসিতে, আর তার অবস্থা বেশ ঠাউরে দেখিতে, তবে তোমাকে পিচ্‌কিরিও করিতে হইত না, কলঙ্কের ডালিও মাথায় করিতে হইত না। অনেক ডাক্তর অনেক জায়গায় এই রকম করিয়া মিছামিছি অপযশ কিনিয়াছেন। চাপরাশ-ওয়ালা খুব নাম-জাদা ডাক্তরদের এ রকম অপযশে কিছু যায় আসে না। এ রকম অপযশ তাঁরা গ্রাহ্যই করেন না। তাঁদের বেলায় এ রকম অপযশের কথা কেউ ফুটিয়া বলি, তেই সাহস পায় না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের বেলায়, রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা, পাড়া প্রতিবাসিরা তিলে তাল করিয়া থাকেন। তাতেই বলিতেছি, যে কাজ করিবে, খুব বিবেচনা করিয়া করিবে। ধীরে, সুস্থে, খুব ঠাউরে দেখিয়া তবে কাজ করিবে। আগ পাছ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি যে কাজ করিবে, তাতেই ঠকিবে, তাতেই অপ্রতিভ হইবে; তাতেই কলঙ্কের ভাগী হইবে। রোগীর কাছে অনেক ক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া তার ভাব গতিক বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিবে। তার পর, পিচ্‌কিরি দেওয়া বিবেচনা হয়, পিচ্‌কিরি দিবে; আর যা যা করিতে হয়,

থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে বলিয়া হাঁকা দমকা কাজ করিও না।

করিবে। থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে বলিয়া, হাঁকা দম্‌কা কোনও কাজ করিও না। রোগী কাল্-ঘাম ঘামিতেছে, নাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে—এ সব দেখিয়াও, পেট ফাঁপিলে পিচ্‌কিরি দিতে হয় জান বলিয়া, আগ পাছ না ভাবিয়া পিচ্‌কিরি দিলে। এ রকম অবিবেচনার ফল কি? ফল মন্দ নয়। আমার ছেলেটীর বাতশ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছে। কাল্ রাত্রি থেকে পেটটা কিছু বেশী ফাঁপিয়াছে। আপনাকে আমার বাড়ীতে এখনই একবার যাইতে হবে। অনুগ্রহ করিয়া পিচ্‌কিরির বাক্সটা রাখিয়া আর যা যা লইতে হয়, লইয়া শীঘ্র আসুন্। আজি আবার কাকে খুন করেন দেখ। ডাক্তর মহাশয় ত পিচ্‌কিরির বাক্স হাতে করিয়া পাড়ার ভিতর ঢুকিলেন—অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁকে এই রকম ভাবের কথা বার্ত্তা শুনিতে হয়। এতে তাঁর পসার কেমন হয়, মান সম্ভ্রম কেমন বাড়ে, যাঁরা এ রকম দায়ে ঠেকিয়াছেন, তাঁরাই তা জানেন।

পেট-ফাঁপার কথা লিখিতে গিয়া অনেক ফাল্‌তো কথা লিখিয়া ফেলিলাম। যাঁদের জন্যে বৈ লিখিতেছি, তাঁরা যদি সাবধান আর চৌকোশ

হইতে চান, তবে এ সব ফাল্‌তো কথা মনে করিবেন না।

(৩) তার্পিণের সেক।

৮১৫র পাতে কার্ব্বণেট অব্ য়্যামোনিয়া মিক্‌শ্চরের সঙ্গে ১০ ফোটা করিয়া তার্পিণ দিতে বলিছি। ক্যাষ্টর অইল্, হিঙের আরক আর সাবানের জলের সঙ্গে তার্পিণ পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিছি। এ ছাড়া, রোগীর সকল পেটে তার্পিণের সেক দিবে। তার্পিণের সেক কেমন করিয়া দিতে হয়, ২১৩—২১৪র পাতে, তা বলিছি। পেটে তার্পিণের সেক দিলে যে কেবল পেট-ফাঁপাই কমে, তা নয়; রোগী চাঙ্গা হয়, আর তার সন্নিপাত ঘুচিয়া যায়। তার্পিণের সেকে রোগীর পেটের দোষ কাটিয়া যায়। তবেই দেখ, পেট-ফাঁপায় এক তার্পিণ তিন রকম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। এতেই বলিতেছি, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের পেট ফাঁপার যেমন অসুদ তার্পিণ, তেমন অসুদ আর নাই। সন্নিপাতের পেট ফাঁপারও তার্পিণ খুব ভাল অসুদ। যে কারণেই হোক্, শরীরের বল একবারে কমিয়া গেলে, রোগী একবারে নেতিয়া পড়িলে, তার যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাকেই সন্নিপাত বলে। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম বিকারের পেট-

ফাঁপাকেও সন্নি-পাতের পে-ফাপা বলিতে পার ।

(৪) বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেওয়া যায়, পেটে গিয়া তা না পচিতে পারে, তার অষুদ ।

এর আগে অনেক বার বলিছি, হজম বল, পরিপাক বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বলে হয় । বাতশ্লেষ্ম-বিকারে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সেই বল যেমন কমিয়া যায়, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যেমন দুর্দ্দশা হটে তেমন আর কোনও রোগে নয় । এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেও, পেটে গিয়া তা পচে, আর তা থেকে গ্যাস্ উঠিয়া পেটের ফাঁপ করে । এখন দেখ, রোগীকে যা পথ্য দিবে, তার পেটে গিয়া তা পচিতে না পারে, এমন কোনও অষুদ আছে কি না । আছে, ভাল অষুদই আছে । সে অষুদ আর কি ? সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্ সোডা। রোগীকে পথ্য দিবার একটু আগে দশ গ্রেন্ কি পোনর গ্রেন্ সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্ সোডা খাওয়াইয়া দিলে, তার পেটে আহার আর পচিতে পারে না। সল্‌ফো-কার্ব্ব-লেট অব্ সোডা সে আহার পচিতে দেয় না। কাজে কাজেই, তার পেট-ফাঁপার কারণই দূর করিয়া দেয়। সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্ সোডার এটী ভারি গুণ।

তাতেই বলি, যদি ধর ত বাতশ্লেষ্ম-বিকারের পেট-ফাঁপার যত অসুদ আছে, সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা সব চেয়ে ভাল অসুদ। কেন না, রোগীর আহার বন্ধ রাখিলে শুদু অসুদে তার জীবন রক্ষা হয় না। এ দিকে আবার এক গুণ আহার দিলে পেটের ফাঁপ তার দশ গুণ হয়। এ অবস্থায় কি করিবে? আহার বন্ধ রাখ ত রোগী মরে। আবার আহার দেও ত, যে পেট-ফাঁপা কমাইবার জন্যে এত যত্ন—এত চেষ্টা করিতেছ, সেই পেট-ফাঁপা বাড়িয়া যায়। এ বিষম বিপত্তি থেকে তোমাকে উদ্ধার করিবার উপায়ই সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা। ডিল্‌-ওয়াটরের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইয়া সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা খাওয়াইয়া দিবে। রোগীকে এ অসুদ রোজ তিন বারের বেশী খাওয়া-ইবার দরকার নাই। সকালে একবার, দু পর বেলা একবার, আর সন্ধ্যার পর একবার, নিয়ম করিয়া এ অসুদ এই তিন বার খাওয়াইবে। তার পর, যে পথ্য দিবে, মাত্রায় কম করিয়া বারে বেশী দিবে। সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা যে সে ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া যায় না; সাহেবদের ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া যায়। এর দাম বেশী নয়। তবে সাহেবদের ডিস্পেন্সরির সব

অম্বুদেরই দাম কিছু বেশী। তাই বলিয়াই যা কিছু বেশী নয়।

তার পর এখন পেট-কাঁপার রোগীর পথ্যের কথা বলি।

পথ্য——১৫৮র পাতে বলিছি, পেট-কাঁপা থাকিলে সাগু, য়্যারারুট, খৈ, যব (বার্লি), এ সব দেওয়া ভাল নয়; দিলে পেট কাঁপা বাড়ে। পেট-কাঁপায় মাংসের কাথ আর চূণের জল-মিশন এক-বল্কা দুধ ভাল। মাংসের কাথ কেমন করিয়া তয়ের করে, ১৫৮—১৬২র পাতে তা বলিছি। চূণের জলের কথা ৭৩৬—৭৩৯র পাতে বলিছি। অনেকেই বলেন, মাংসের কাথ, আর দুধ, দুই-ই সেই এক রোগীকে দেওয়া যায় না; দিলে তার পেটের দোষ ঘটে আমি তাঁদের এ যুক্তি বা নিদান বুঝিতে পারি না। রোগীর আহার লঘু, মাত্রায় কম, বারে বেশী—যুক্তি করিয়া এই তিনের মিল ঠিক্ রাখিতে পারিলে, সে পথ্যে রোগীর কোনও অপকার করে না। মোটামুটি এইটী জানিয়া রাখ। এ ছাড়া, মাংসের কাথ আর দুধ একত্র দিবার দরকার নাই। দুই জিনিষ একত্র মিশিয়া গুরুপাক হইতে পারে। এই জন্যে, যখন মাংসের কাথ দিবে, তখন নিয়ম করিয়া বারে বারে একটু একটু শুদু মাংসের-কাথই

দিবে। তার পর, যখন দুধ দিবে, তখন নিয়ম করিয়া বারে বারে একটু একটু শুদ্ধ দুধই দিবে। এ নিয়মে সেই এক রোগীকেই মাংসের কাথ আর দুধ, দুই-ই নির্ব্বিঘ্নে দিতে পার।

১০। **প্রস্রাব-বন্ধ**——প্রস্রাব না হওয়াকে প্রস্রাব-বন্ধ বলে। মূতের থলিতে (ব্লাডরে) মূত জমিয়া থাকে, কিন্তু প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইতে পারে না। এ এক রকম প্রস্রাব-বন্ধ। এ রকম প্রস্রাব-বন্ধকে প্রস্রাব-আট্‌কান বলে। প্রস্রাব আট্‌কানকে ডাক্তরেরা রিটেন্‌শন্ অব্ ইয়ুরিন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মূত্রাবরোধ বলে। আর এক রকম প্রস্রাব-বন্ধ আছে। তাতে আদৌ মূত সৃষ্টিই হয় না। কাজে কাজেই, মূতের থলিতে মূত মোটে আসেই না। রক্ত থেকে আলাদা আলাদা জিনিষ তয়ের করিবার জন্যে, শরীরের ভিতর আলাদা আলাদা যন্ত্র আছে। রক্ত থেকে মূত তয়ের করিবার যে যন্ত্র, তাকে ডাক্তরেরা কিড্‌নি বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মূত্রগ্রন্থি বলে। মূত্রগ্রন্থির কথা ৭০৭র পাতে বলিছি। ওলাউঠার রোগীর গা যখন পাঁকের মত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তখন রক্ত থেকে মূত আর তয়ের হয় না—মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া, খুব শক্ত এক রকম স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট

ফীবর) আছে। সে জ্বরে রোগীর গা সব হল্‌দে হইয়া যায়, আর রোগী ঠিক্ যেন পিয়াই কালি বমি করে। সে জ্বরকে ডাক্তরেরা ইয়লো ফীবর বলেন; ভাল বাঙ্গালায় পীত-জ্বর বলিতে পার। হল্‌দের ভাল কথা পীত। সে জ্বরেও রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। সে জ্বরের কথা এর পর বলিব। আরও অনেক রোগে—আরও অনেক কারণে রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে, কাজে কাজেই মূতের থলিতে মূত মোটে আসেই না। এ রকম প্রস্রাব-বন্ধকে ডাক্তরেরা সপ্রেশন্ অব্ ইয়ুরিন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মূত্রা-ঘাত বলে। মূত্রাঘাতকে সোজা বাঙ্গালায় মূতের অভাব বলিতে পারে। তবেই দেখ, প্রস্রাব-বন্ধ দু রকমে হয়। প্রস্রাব আট্‌কাইয়া গেলে, রোগীর প্রস্রাব হয় না; একেও আমরা প্রস্রাব-বন্ধ বলি। আবার রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর প্রস্রাব হয় না; একেও আমরা প্রস্রাব-বন্ধ বলি। এখন, রোগীর প্রস্রাব-বন্ধ হই-য়াছে বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। তুমি কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে, রোগীর প্রস্রাব আট্-কাইয়া তার প্রস্রাব বন্ধ হইয়াছে? কি, রক্ত

থেকে মূত্ত তয়ের হয় নাই বলিয়া তার প্রস্রাব-বন্ধ হইয়াছে? তা ঠিক্ করা শক্ত নয়। প্রস্রাব আট্-কাইয়া যে প্রস্রাব-বন্ধ হয়, তাতে মূতের থলিতে মূত জমিয়া থাকে। মূতের থলিতে মূত যত বেশী জমিয়া থাকে, রোগীর তল-পেটের নীচের দিক্ তত উচু উচু মালুম হয়; নজরেও উচু মালুম হয়; হাতেও সে উচু বেশ মালুম হয়। সেই উচু জায়গার উপর বাঁ হাতের একটী কি দুটী আঙুল উপুড় করিয়া রাখিয়া, তার উপর ডাইন্ হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগা দিয়া আস্তে আস্তে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। ফাঁপা শব্দ আর নিরেট শব্দের কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। নিরেট শব্দ বাহির হইলেই ঠিক্ করিবে, মূতের থলিতে (ব্ল্যাডরে) মূত জমিয়া আছে। মূতের থলিতে মূত যদি বেশীও না থাকে, নজরে তল-পেটের নীচেটা যদি বেশ উচু উচু মালুম না হয়, আর হাত দিয়াও সে উচু যদি বেশ টের পাওয়া না যায়, তবু আঙুলের ও রকম ঘা দিলে কিছু না কিছু নিরেট শব্দ বাহির হয়-ই। মূতের থলিতে মূত না থাকিলে, তল্ পেটের নীচে আঙুলের ও রকম ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। এ ছাড়া, মূতের থলিতে মূত জমিয়া থাকিলে; তল্-পেটের নীচে দিক্টের যেমন পূরন্ত বা উচু উচু ভাব

হয়, মূতের থলিতে মূত না থাকিলে তল্‌-পেটের নীচে দিকৃটের সে রকম ভাব কিছুই থাকে না। পূরন্ত বা উচু উচু ভাবের ঠিক্ উল্টই দেখা যায়। কাহিল বা হাড়ে মাসে জড়িত মানুষের পেটে কিছু না থাকিলে, আমরা বলি, তার পেটের মধ্যে পেট সাঁদিয়ে গিয়াছে। তেমনি, কাহিল বা হাড়ে মাসে জড়িত রোগীর মূতের থলিতে মূত না থাকিলে, তার তল্‌-পেটের মধ্যে তল্‌-পেটে সাঁদিয়ে গিয়াছে বলিতে পার। মোটা মানুষের বেলায় এ সব কথা খাটে না। খুব চর্ব্বি-ওয়ালা মোটা মানুষের পেটে কিছু থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই। তার মূতের থলিতে মূত জমিয়া আছে কি না, তার তল্‌-পেটের আকার প্রকার দেখিয়া তা বেশ মালুম করিতে পারা যায় না।

প্রস্রাব করাইবার এক রকম শলা আছে। সে শলাকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটর বলেন। মূতের থলিতে মূত জমিয়া আছে কি না, প্রস্রাবের ডুগুর দিয়া সেই শলা মূতের থলির মধ্যে চালাইয়া দিলে, তা যেমন ঠিক্ করিয়া জানিতে পারা যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়। মূতের থলিতে যদি মূত থাকে, তবে মূতের থলির মধ্যে শলা যে যায়, সেই অমনি তার ভিতর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসে।

মূতের থলিতে মূত যদি না থাকে, তবে শলার ভিতর দিয়া কিছুই বাহির হইয়া আসে না। তাতেই বলিতেছি, মূতের থলিতে মূত জমিয়া আছে কি না, প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূতের থলির মধ্যে শলা চালাইয়া তা যেমন ঠিক্ করিয়া বলিতে পারা যায়, এমন আর কিছুতেই নয়। প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূতের থলির মধ্যে শলা চালানকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটর পাস্ করা বলেন।

স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) একটী উপসর্গ বলিয়া যে প্রস্রাব-বন্ধের কথা এখানে বলিতেছি, সে প্রস্রাব-বন্ধ, প্রস্রাব-আট্কান বৈ আর কিছুই নয়। প্রস্রাব আটকানকে ডাক্তরেরা রিটেনশন্ অব্ ইয়ুরিন্ বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি।

প্রস্রাব-আট্কানর কারণ অনেক। অনেক কারণে প্রস্রাব আট্কাইতে পারে—আট্কাইয়াও থাকে। মোটামুটি ধর ত প্রস্রাব আট্কানর কারণ দু রকম। মূতের থলির নিজের একটী বল আছে। সেই বলেই মূতের থলি প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির করিয়া দেয়। সেই বলের অভাব প্রস্রাব-আট্কানর একটী কারণ। আর, প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিবার কোন রকম

ব্যাঘাত প্রস্রাব-আট্‌কানর আর একটা কারণ। এই দু রকম কারণের কথা এখন এক এক করিয়া বলি।

(১) মুতের থলিতে মুত জমিলে সে মুত বাহির করিয়া দেয় কে? মুতের থলি নিজেই সে মুত বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ড জড়-শড় হইয়া তার ভিতরকার রক্ত যেমন সব শিরের ভিতর চালাইয়া দেয়, মুতের থলিও তেমনি জড়-শড় হইয়া তার ভিতরকার মুত প্রস্রাবের দুওর দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ড যেমন মাংসের-থলি, মুতের থলিও তেমনি মাংসের থলি। তবে হৃৎপিণ্ডের থলি খুব মোটা; মুতের থলি তেমন মোটা নয়—ঢের পাত্‌লা। হৃৎপিণ্ড যেমন নিজের বলে জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দিতে পারে; মুতের থলিও তেমনি নিজের বলে জড়-শড় হইয়া ভিতরকার মুতের উপর চাপ দিতে পারে। শরীর যত দিন বেশ সবল আর সুস্থ থাকে, মুতের থলির সে বল ঠিক্ সমান থাকে। এই জন্যে, সহজ বেলায় প্রস্রাবের চেষ্টা হইলে, তখনই প্রস্রাব করিতে পারি। শরীরের ভিতর এমনি সব কল বল আছে যে, মুতের থলির ভিতর মুত জমিলেই প্রস্রাবের চেষ্টা হয়। তেমনি, মলের নাড়ীতে (রেক্টমে) মল জমিলেই বাহ্যের চেষ্টা হয়। তার

পর বলি। মূত্রের থলির সে বল যত দিন ঠিক্ থাকে, প্রস্রাবের চেষ্টা হইলেই প্রস্রাব করিতে পারি। যে কারণেই হোক্, মূত্রের থলির সে বল গেলে, প্রস্রাবের চেষ্টা হইলে আমরা আর প্রস্রাব করিতে পারি না। মূত্রের থলির সে বল কিসে যায়—সে বল কিসে নষ্ট হয়, এখন তাই বলি।

(ক) সহজ শরীরে মূত্রের থলিতে যদি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত খুব বেশী মূত্র জমিয়া থাকে, তবে মূত্রের থলির সে বল নষ্ট হয়—মূত্রের থলি জড় শড় হইয়া মূত্রের উপর চাপ দিয়া মূত্র আর বাহির করিয়া দিতে পারে না। যদি বল, সহজ শরীরে মূত্রের থলিতে কেমন করিয়া এত মূত্র জমিয়া থাকিবে ? মূত্রের থলিতে মূত্র জমিলেই ত প্রস্রাবের চেষ্টা হয় ? সে কথা সত্য। কিন্তু প্রস্রাবের চেষ্টা হইলেও—প্রস্রাবের পীড়া হইলেও যদি প্রস্রাব না কর—প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিয়া রাখ—প্রস্রাবের বেগ সম্বরণ কর, তবে তোমার মূত্রের থলিতে মূত্র জমিয়া থাকিবে বৈ আর কি হবে ? মূত্রের থলিতে মূত্র ক্রমেই বেশী জমিতে থাকে। যত বেশী জমে, রবারের থলির মত মূত্রের থলি ততই বাড়িয়া যাইতে থাকে। মূত্রের থলি মূত্রের ভরে যখন খুব বাড়িয়া যায়, জড়-শড় হইয়া

মূতের উপর চাপ দিবার তখন তার আর শক্তি থাকে না। তখন প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলেও প্রস্রাব করিতে পার না। এ অবস্থায় শলা দিয়া প্রস্রাব করান ভিন্ন তোমাকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। দু দিকের দুটী মূত্র-নলী (মূতের নলী) দিয়া মূতের থলিতে ফি মিনিটে ৫। ৬ ফোটা করিয়া মূত পড়ে। মূতের নলির কথা ৭০৭র পাতে বলিছি। এতেই মনে কর, মূতের থলিতে মূত কত শীঘ্র শীঘ্র জমে। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া গান বাজনা শুনিতে বসিলে, রাত্রি দশটার সময় তোমার প্রস্রাবের চেষ্টা হইল। প্রস্রাব করিবার জন্যে তখন উঠিয়া বাহিরে যাওয়া ঢের অসুবিধা মনে করিয়া, ভোর পর্য্যন্ত অনেক কষ্টে প্রস্রাবের বেগ সম্বরণ করিয়া রাখিলে। শেষে গান ভাঙিয়া গেলে তাড়াতাড়ি গিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলে। অনেক চেষ্টা করিলে, কিন্তু কিছুতেই প্রস্রাব করিতে পারিলে না। প্রস্রাব করিতে পারিবে কেমন করিয়া ? মূতের থলি জড়-শড় হইয়া ভিতর-কার মূতের উপর চাপ দিতে না পারিলে ত আর প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিতে পারে না। মূতের থলির জড়-শড় হইবার যে শক্তি, তার দফা ত-তুমি ইচ্ছা করিয়াই নিকেশ

করিয়াছ। এ রকম ঘটিলে উপায় কি? উপায় আর কি? শলা দিয়া প্রস্রাব না করাইয়া দিলে জীবন রক্ষা হওয়াই ভার। শলা দিয়া প্রস্রাব না করাইয়া দিলে, মূতের থলি ছাপাইয়া মূত ফিরে মূত্র-গ্রন্থিতে গিয়া উপস্থিত হয়। মূতের থলি থেকে মূত ফিরে আবার মূত্র-গ্রন্থিতে কেমন করিয়া যায়? মূতের যে দুটী নলি দিয়া মূত, মূত্র-গ্রন্থি থেকে মূতের থলিতে আসিয়া পড়ে, সেই দুই নলি দিয়াই মূত ফিরে মূত্রগ্রন্থিতে যায়। মূতের ভরে মূতের থলিও যেমন বাড়িয়া যায়, মূতের নলি দুটীও তেমনি বাড়িয়া যায়, আর মূত্রগ্রন্থি দুটীও তেমনি বাড়িয়া যায়। এ রকম ঘটনার ফল কি? ফল আর কি? মৃত্যু! রক্ত থেকে মূত তয়ের করাই মূত্রগ্রন্থির কাজ। এখন মূত্রগ্রন্থির নিজেরই যে দুর্দ্দশা, তাতে সে কাজ করে কে? কাজে কাজেই, রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়? রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলেই আর কি, সর্ব্বনাশ! মূতের সঙ্গে শরীরের যে বিষ বাহির হইয়া যায়, সে বিষ আর বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সে বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া রোগীর বিকার উপস্থিত করে। রোগী একবারে অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এ অবস্থা ঘটিলে

রোগী বেশী ক্ষণ বাঁচে না। মূতের সঙ্গে শরীরের যে বিষ বাহির হইয়া যায়, ডাক্তরেরা সে বিষকে ইয়ুরীয়া বলেন। সে বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিলে রোগীর যে বিকার উপস্থিত হয়, সে বিকারকে ডাক্তরেরা ইয়ুরীমিয়া বলেন। যে কারণেই হোক্, রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলেই রোগীর এই রকম বিকার (ইয়ুরীমিয়া) হয়। ওলা-উঠা-রোগীর এ রকম বিকার সচরাচরই হইয়া থাকে। ওলাউঠা রোগের কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। ওলাউঠা রোগের বৈ এক খানি আলাদা করিয়া লিখিব।

(খ) শির-দাঁড়ার ভিতরকার মাইজে বেশী রকম কোন ঘা ঘো লাগিলে, কি শির-দাঁড়ার মাইজের কোন ব্যামো স্যামো হইলে মূতের থলির সে বল থাকে না—সে বল নষ্ট হইয়া যায়। মাথার খোলের ভিতর মগজ থাকে। মগজকে ডাক্তরেরা ব্রেইন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মস্তিষ্ক বলে। মগজকে সোজা-সুজি মাথার ঘিলুও বলে। এ সব কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। শির-দাঁড়ার খোলের ভিতর এক রকম মাইজ থাকে। সে মাইজকে ডাক্তরেরা স্পাইনাল্ কর্ড্ বলেন। স্পাইনাল্ কর্ডকে স্পাইনাল্ ম্যারোও বলে।

স্পাইনাল্ কর্ডকে ভাল বাঙ্গালায় কাশেরুক মজ্জা বলে; সোজা-সুজি শির-দাঁড়ার মাইজ বলিতে পার। শির-দাঁড়ার ভাল কথা কশেরুকা; আর মাইজের ভাল কথা মজ্জা। মাথার ঘিলু আর শির-দাঁড়ার মাইজ এক-ন্যাতা। শির-দাঁড়ার মাইজ সুদ্ধ মাথার ঘিলু যদি দেখ, তবে শঙ্কর মাছের আকার প্রকারের কথা তোমার মনে পড়িবে। যাঁরা শঙ্কর মাছ দেখিয়াছেন, তাঁদের বুঝাইবার জন্যে আর বেশী কথা বলিবার দরকার নাই। যাঁরা শঙ্কর মাছ দেখেন নাই, শঙ্কর মাছের গড়ন তাঁদের যোড়তাড়ে বুঝাইয়া দিতে হবে। মনে কর গোখুরো সাপে কাছিমের শুঁড় কামড়াইয়া ধরিল। কাছিম সাপের মুখ সুদ্ধ শুঁড় টানিয়া ভিতরে লইল। খানিক পরে এই অবস্থায় কাছিমও মরিল, সাপও মরিল। এখন কোনও জায়গায় বাঁকা চোঁকা না থাকে, এ রকম ভাবে সাপটী সোজা করিয়া রাখ। কাছিম সুদ্ধ এই সাপের গড়ন যে রকম, মাথার ঘিলু সুদ্ধ শির-দাঁড়ার মাইজের গড়ন মোটামুটি সেই রকম, ভাবিয়া লও। পক্ষাঘাত রোগের কথা বলিবার সময়, মাথার মগজের কথা আর শির-দাঁড়ার মাইজের কথা ভাল করিয়া বলিব। শির-দাঁড়ার এই মাইজে বেশী

রকম কোন ঘা ঘো লাগিলে, কি শিরদাঁড়ার মাই-জের কোন রকম ব্যামো স্যামো হইলে মূতের থলির সে বল থাকে না—সে বল নষ্ট হইয়া যায়—জড়শড় হইয়া মুতের উপর মুতের থলির চাপ দিবার শক্তি থাকে না।

(গ) মাথার মগজের কোন রকম ব্যামো স্যামো হইয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে, মূতের থলির সে বল কাজে কাজেই আর থাকে না। এর আগেই বলিছি, শরীরের ভিতর এমনি সব কল বল আছে যে, মূতের থলিতে মুত জমিলেই প্রস্রাবের চেষ্টা হয়। প্রস্রাবের চেষ্টা হইলেই, মুতের থলি নিজের সেই বলে জড়-শড় হইয়া মুতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দেয়। রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে মূতের থলিতে মূত জমিয়াছে কি না, সে তা মোটে জানিতেই পারে না। কাজে কাজেই, প্রস্রাবেরও কোনও চেষ্টা হয় না—চেষ্টা হইতেই পারে না। প্রস্রাবের চেষ্টা না হইলে, মুতের থলি জড়-শড় হইয়া মূতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দিতে পারে না। কাজে কাজেই, প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। মাথার মগজের ব্যামোর কথা এর পর বলিব।

(ঘ) বাতশ্লেষ্ম-বিকারেও আর আর অনেক

রকম শক্ত জ্বরেও, রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ঠিক্ ঐ রকম করিয়া প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। সন্নি-পাত অবস্থায়ও এই রকম করিয়া রোগীর প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়।

জ্বর জাড়িতে রোগী অজ্ঞান হইয়া না গেলে যে প্রস্রাব আট্‌কায় না, তা নয়। অনেক জায়গায় রোগীর জ্ঞানের কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না; কিন্তু তার প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। এখানে প্রস্রাব আট্‌কানর কারণ কি? এখানে প্রস্রাব আট্‌কায় কেন? মূতের থলি নিজের যে বলে জড়শড় হইয়া মূতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দেয়, জ্বরের তাড়শে—জ্বরের ধমকে সে বল একবারে খাটো হইয়া যায়। কাজেই, প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) একটু শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে, অনেক জায়গায় এই রকম করিয়া রোগীর প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। তাতেই বলিছি যে, স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রস্রাব-বন্ধ একটী উপসর্গ।

(২) তার পর এখন প্রস্রাবের চুঙর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাঘাতের কথা বলি।

(ক) মূতের থলির মুখ খেঁচিয়া ধরিলে প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। খেঁচিয়া ধরাকে ডাক্তরেরা

স্প্যাজম্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় আক্ষেপ বলে! মূতের থলির মুখ যদি খেঁচিয়া ধরে, তবে হাজার চেষ্টা করিলেও মূতের থলি মুত বাহির করিয়া দিতে পারে না। মূতের থলি মুত কেমন করিয়া বাহির করিয়া দেয়? জড়-শড় হইয়া ভিতরকার মূতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দেয়। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। মেয়েদের মুর্চ্ছাগত বাইতে কখন কখন মূতের থলির মুখ এই রকম করিয়া খেঁচিয়া ধরে। খেঁচিয়া ধরিলে কাজে কাজেই প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। মেয়েদের মুর্চ্ছাগত বাইকে ডাক্তরেরা হিষ্টিরিয়া বলেন; বৈদ্যরা গুল্মবায়ু বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি।

(খ) ধাতের ব্যামো হইয়া ঝিল হইলে প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। ধাতের ব্যামোকে ডাক্তরেরা গনোরীয়া বলেন। ঝিল্‌কে তাঁরা ষ্ট্রিক্‌চর বলেন। ধাতের ব্যামোর কথা, আর ঝিল্ হইয়া প্রস্রাব আট্‌কানর কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। মূতের থলির মুত বাহির করিয়া দিবার বল নাই বলিয়া রোগীর প্রস্রাব আট্‌কাইয়া আছে? কি প্রস্রাবের দুওর দিয়া মুত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বলিয়া তার প্রস্রাব আট্‌কাইয়াছে। এ দু রকম প্রস্রাব-আট্‌কানর কোন্ রকম ঘটিয়াছে,

কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে? রোগীর লক্ষণে এর কোনও ইতর বিশেষ বুঝিতে পারা যায় কি না? বুঝিতে পারা যায়—বেশই বুঝিতে পারা যায়। মূতের থলির মূত বাহির করিয়া দিবার বল গেলে রোগীর যে প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়, সে প্রস্রাব-আট্‌কানয় রোগীর কষ্টের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; রোগী কোন কষ্ট প্রকাশও করে না। কিন্তু প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাঘাত ঘটিলে, রোগী খুবই যাতনা পায়। নিয়ত প্রস্রাব করিতে চায়, কিন্তু প্রস্রাব করিতে পারে না। কোঁত দেয়, বেগ দেয়, আর তার মুখে তার যাতনা যেন স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে। শিরদাঁড়ার মাইজে কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে, কি সেই মাইজের কোন রকম রোগ ঘোগ হইলে যে পক্ষাঘাত হয়, সেই পক্ষাঘাতে মূতের থলির মূত বাহির করিয়া দিবার শক্তি একবারে নষ্ট হইয়া যায়। এ রকম ঘটিলে মূতের থলিতে মূত ক্রমেই জমিতে থাকে; তার পর, মূতের থলি ছাপাইয়া প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত উপ্‌চে পড়িতে থাকে। এ ছাড়া, এ সব রোগীর মূতে শীঘ্রই ভারি দুর্গন্ধ হয়, আর ক্ষার ক্ষার ঝাঁজ হয়। পক্ষাঘাতের কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব।

এখন স্বল্পবিরাম-জ্বরের প্রস্রাব-বন্ধ উপসর্গের চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——শক্ত রকম জ্বর জাড়িতে রোগীর প্রস্রাব-বন্ধ হইলে—প্রস্রাব আট্‌কাইয়া গেলে, তার যে রকম চিকিৎসা করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

শক্ত রকম জ্বর জাড়িতে জ্বরের তাড়শে—জ্বরের ধমকে অনেক জায়গায় রোগীর মূতের থলির বল খুব খাটো হইয়া যায়। মূতের থলির বল খুব খাটো হইয়া গেলে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় —প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যায়। এ রকম ঘটিলে কি করিবে? এ অবস্থায় কি রকম চিকিৎসা করিবে? এ অবস্থায় রোগীর দু রকম চিকিৎসার দরকার। রোগী যে কয় দিন আপনি প্রস্রাব করিতে না পারিবে, সে কয় দিন শলা দিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিবে। আর, রোগী যাতে অপনি শীঘ্রই প্রস্রাব করিতে পারে, তারও উপায় করিয়া দিবে। শলা দিয়া প্রস্রাব করান শক্ত নয়, খুব সোজা। তবে জুত বরাত, কল কৌশল জানা না থাকিলে, আর অভ্যাস না থাকিলে, খুব সোজা কাজও শক্ত বলিয়া বোধ হয়। রোগী যাতে আপনি শীঘ্রই প্রস্রাব করিতে পারে, তার কোনও উপায় আছে, কি না?

আছে। ভাল উপায়ই আছে। সে উপায় আর কি? অর্গট অব্ রাই। মূতের থলির বল খাটো হওয়ার দরুণ রোগীর প্রস্রাব বন্ধের যেমন অসুদ অর্গট্ অব্ রাই, তেমন অসুদ আর নাই। অর্গট্ অব্ রাই গাছড়া অসুদ। অর্গট্ অব্ রাই আর আমাদের ধান, এক জাতি। অর্গট্ অব্ রাইয়ের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। ৫ গ্রেন্ করিয়া অর্গট্ অব্ রাইয়ের গুঁড়ো রোজ চারি বার খাইতে দিলে, রোগী ৩। ৪ দিনের মধ্যে আপনিই প্রাস্রব করিতে পারে। অর্গট্ অব্ রাই-য়ের গুঁড়ো খুব টাট্‌কা না হইলে, তাতে তেমন উপকার হয় না। এ ছাড়া, বেশী দিন ঘরে থাকি-লেও অর্গট্ অব্ রাই খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে, সাহেবদের ডিস্পেন্সেরি থেকে টাটকা অর্গট্ অব্ রাই আনিয়া তার গুঁড়ো সদ্য তয়ের করিয়া লইবে। অর্গট্ অব্ রাই রৌদ্রে শুকাইয়া হামাম দিস্তেতে গুঁড়ো করিতে হয়। বর্ষাকালে অর্গট্ অব্ রাইয়ের গুঁড়ো তয়ের করা বড় মস্কিল। এই জন্যে, বর্ষাকালে অর্গট অব্ রাইয়ের গুঁড়োর বদলে লিকুইড্ একৃষ্ট্রাক্ট অব্ অর্গট ব্যবহার করিবে। লিকুইড্ একৃষ্ট্রাক্ট অব্ অর্গটের মাত্রা বিশ (২০) মিনিম্। যে কয় দিন রোগী আপনি প্রস্রাব করিতে

না পারিবে, শলা দিয়া রোজ তিন বার করিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিবে। কেন না, মূতের থলিতে বেশী মূত জমিতে দিলে, মূতের থলির যে বল খাটো হইয়া গিয়াছে, সে বল শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারে না। সহজ শরীরেও মূতের থলিতে খুব বেশী মূত জমিতে দিলে যখন মূতের থলির বল থাকে না, তখন এ কথা কি আর বেশী করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হবে?

প্রস্রাব আট্কাইয়া গেলে প্রস্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ।

(১) ক্ষুদে সুনি শাক ... ... ১ ছটাক
সোরা ... ... ½ তোলা
একত্র বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়।

(২) তেলাকুচর শিকড়—
কাঁজিতে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়।

(৩) কর্পূরের গুঁড়ো প্রস্রাবের দুওরে দিলে প্রস্রাব হয়।

(৪) কর্পূরের গুঁড়ো খুব সরু ন্যাকড়ায় মাখাইয়া, তার বাতি তয়ের করিয়া, প্রস্রাবের দুওরের ভিতর চালাইয়া দিলে প্রস্রাব হয়।

বালকের পক্ষে।

(১) পিপুল। মরিচ। চিনি। মধু। ছোট এলাইচ। সৈন্ধব। এই সব জিনিষ সমান ভাগে একত্র মিশাইয়া তায় অবলেহ তয়ের করিয়া, ছেলেকে মাঝে মাঝে চাটিতে দিবে।

(২) শুদ্ধ ছোট এলাইচ, মধু দিয়া মাড়িয়া অবলেহ করিয়া দিলেও

হয়। চাটিবার অষুদকে বৈদ্যরা অবলেহ বলেন; ডাক্তরেরা ইলেকচুয়ারি বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি।

(৩) শসার বিচির শাঁস
ছোট এলাইচ্
কুমড়োর বিচির শাঁস

একত্র মিশাইয়া অবলেহ করিয়া দিবে।

এর আগেই বলিছি, রোগী যে কয় দিন আপনি প্রস্রাব করিতে না পারিবে, সে কয় দিন শলা দিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিবে। যাঁদের জন্যে এ বৈ লিখিতেছি, তাঁদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাই নয়, তা বলাই বাহুল্য। এই জন্যে, এখানে গুটি কতক মুষ্টিযোগ লিখিয়া দিলাম। এ মুষ্টিযোগ গুলির কেমন ফল পাওয়া যায়, আমি নিজে কোন খানে তা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। তবে আমার পরিচিত এক জন বৈদ্য (কবিরাজ) বলিয়া দিয়াছেন, এ মুষ্টিযোগ গুলিতে অনেক জায়গায় বেশ ফল পাওয়া যায়। তাতেই বলি, মুষ্টিযোগ গুলি জানিয়া রাখিলে অনেক জায়গায় কাজে লাগিতে পারে।

১১। বাহ্যে বন্ধ

——জ্বর-চিকিৎসার প্রথম ভাগে জোলাপ দেওয়ার কথা কিছুই বলি নাই। দ্বিতীয় ভাগেও জোলাপের কথা কিছু লেখা নাই। এতে পাঠকেরা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, বলিলেই হয়। পত্রে পত্রে তাঁরা আমার

ঘর ছাইয়া ফেলিয়াছেন। বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে এতে তাঁদের কোন দোষই নাই। তাঁদের এ রকম করিবারই কথা বটে। যাঁরা জোলাপ দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত—জোলাপ না দিয়া কোন রোগের চিকিৎসাই হয় না, যাঁরা জানিয়া বসিয়া আছেন—জ্বর-চিকিৎসার বৈতে জোলাপ দেওয়ার কোন কথাই লেখা নাই বলিয়া তাঁরা দ্বন্দ্ব মারি উপস্থিত করিবেন, আশ্চর্য্য কি? সুস্থ শরীরেও যখন প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের নিত্য দরকার;—প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘাম, এ তিনের কোনটীর ব্যতিক্রম ঘটিলেই যখন শরীর অসুস্থ হয়;—তখন রোগে প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের কত দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে। রোগ হইলেই প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের ব্যতিক্রম ঘটে। এই জন্যে, রোগিদের আমরা মূত্র-কারক অসুদ দিই—রেচক অসুদ দিই—ঘর্ম্মকারক অসুদ দিই। যে অসুদ খাইলে প্রস্রাব হয়, সে অসুদকে ডাক্তরেরা ডায়ুরেটিক্ বলেন;—ভাল বাঙ্গালায় মুত্রকারক অসুদ বলে। যে অসুদ খাইলে বাহ্যে হয়, ডাক্তরেরা সে অসুদকে পর্গেটিব্ বলেন;—ভাল বাঙ্গালায় রেচক অসুদ বলে। যে অসুদ খাইলে ঘাম হয়, সে অসুদকে ডাক্তরেরা ডায়াফোরেটিক বলেন;—ভাল বাঙ্গালায়

ঘর্ম্মকারক অষুদ বলে। প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘাম, এ তিনের কোনটীর ব্যতিক্রম ঘটিলেই শরীর অসুস্থ হয়; রোগের চিকিৎসা করিবার সময় এ কথাটা যেন মনে থাকে। যে রোগই কেন হোক্ না, আর যে উপসর্গই কেন উপস্থিত থাক না, প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের যত ব্যতিক্রম ঘটিবে, রোগীর অবস্থা তত মন্দ হইবে। এই জন্যে, রোগী দেখিতে গিয়া আগে তার প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। তার পর অষুদের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর জাড়িতে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্যে, জ্বর জাড়ির চিকিৎসায় রোগীকে জোলাপ দেওয়ার দরকার প্রায়ই হইয়া থাকে। তাই বলিয়া, জোলাপ দেওয়ার অনুরোধে রোগের প্রকৃতি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। তুমি গিয়া দেখিলে রোগীর জ্বর ছাড়িতেছে। এখন তাকে কুইনাইন্ দিবে—না, তার পেটটা অপরিষ্কার আছে, কোষ্ঠবদ্ধ আছে, বলিয়া জোলাপ দিবে? ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রকৃতি যদি তোমার বিশেষ রকম জানা না থাকে, তবে তুমি রোগীর পেটটা পরিষ্কার করিয়া দিবারই ব্যবস্থা আগে করিবে। পেটটা অপরিষ্কার থাকিতে কুইনাইন্ দেওয়া হবে না—এই বলিয়া তুমি জোলাপের ব্যবস্থা করিয়া

চলিয়া গেলে। রোগী জোলাপ আনাইয়া খাইল। দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই তার জোলাপ খুলিল। বাহ্যে হওয়ায় তার শরীর বেশ খোলসা হইয়া গেল। এদিকে তার পেট যেমন পরিষ্কার হইতে লাগিল—শরীর যেমন খোলসা হইতে লাগিল, ও দিকে জ্বর আসার পথও তেমনি পরিষ্কার হইতে লাগিল—তেমনি খোলসা হইতে লাগিল। তোমার দেখিয়া আসার পর ১২ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর ফের কম্প দিয়া জ্বর আসিল। ফের কম্প দিয়া জ্বর আসার খবর লইয়া রোগীর লোক তোমার কাছে দৌড়িল। তুমি দেরি না করিয়া সেই লোকেরই সঙ্গে রোগীর বাড়ীতে গেলে। গিয়া দেখিলে, রোগী জ্বরে এক বারে বেহুঁষ হইয়া পড়িয়া আছে। কুইনাইন খাওয়াইবার এমন জুত—এমন অবকাশ ছাড়িয়া দিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিছি! এখন দেখিতেছি, রোগীকে বাঁচানই ভার! চিকিৎসকের বুদ্ধির ভুল হওয়া—বিবেচনার ত্রুটি হওয়া সোজা নয়! সে ভুলে—সে ত্রুটিতে রোগীর জীবন নষ্ট হয়! এই রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি বিস্তর চেষ্টা চরিত্র করিলে, কিন্তু কিছুতেই রোগীটিকে বাঁচাইতে পারিলে না। রোগীর গায়ের তাতও কমিল না—তার আর জ্ঞানও হইল না। শেষে জ্বরও ছাড়িল—সেই সঙ্গে

সঙ্গে নাড়ীও ছাড়িল। তখন তুমি যার পর নাই অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইয়া বিদায় হইলে। অনেকে বলিবেন, এ রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। চিকিৎসককেও এ রকম অপ্রতিভ প্রায়ই হইতে হয় না। আমি তা বলি না—আমি বলি, ম্যালেরিয়া জ্বরে এ রকম দুর্ঘটনা খুবই ঘটে। যে ম্যালেরিয়া-জ্বরে যে দুর্ঘটনা একবার ঘটিয়াছে, সেই ম্যালেরিয়া-জ্বরে সে দুর্ঘটনা যে আর ঘটিবে না, তা কে ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে? ম্যালেরিয়া-জ্বরে অমুক রোগীর যে দুর্ঘটনা ঘটিছিল, এরও কি তাই ঘটিবে? না, তা বোধ হয় না। সে ভয় এখানে কিছুই দেখিতেছি না। ঠিক্ এই রকম ভাবিয়া অনেকে অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। প্রথম ভাগে ৬৭/০র পাতে বলিছি, আজ্ জ্বর হইয়াছে, আজ্ই কি কুইনাইন্ দেওয়া যায়? আর দুই একটা জ্বর না দেখে কুইনাইন্ দেওয়া হবে না। এ রকম বন্দোবস্ত কোনও রোগেরই সঙ্গে—বিশেষ ম্যালেরিয়া-জ্বরের সঙ্গে থাটে না। আজ্ যেমন জ্বর ছাড়িল, কাল্ তেমন ছাড়িবে কি না, তার ঠিক্ কি? কাল্ জ্বরে রোগীর কি অবস্থা ঘটিবে, কে বলিতে পারে? তাতেই বলিতেছি, ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত থেকে

রোগীর জীবন রক্ষা করিবার অবকাশ এক বার পাইলে, সে অবকাশ কিছুতেই ছাড়িবে না। সে অবকাশ ছাড়িয়া দিলে, আর তা ফিরে পাইবে কি না, কে বলিতে পারে? তাতেই মাথার দিব্যি দিয়া বলিতেছি, ম্যালেরিয়া-জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ পাইলে, সে অবকাশ কিছুতে ছাড়িবে না। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্ না, আর যে উপসর্গই কেন উপস্থিত থাক না, কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ পাইলেই কুইনাইন্ খাওয়াইবে। কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ কাকে বলে, এখানে তা কি আবার বলিতে হবে? সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবরে) ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই কুইনাইন্ খাওয়াইবে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) জ্বরের প্রকোপ—গায়ের তাত যে কমিতে আরম্ভ হইবে, সেই কুইনাইন্ খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে। রোগীর পেট পরিষ্কারই থাক, আর অপরিষ্কারই থাক—কোষ্ঠ পরিষ্কারই থাক, আর কোষ্ঠবদ্ধই থাক, জিব পরিষ্কারই থাক, আর অপরিষ্কারই থাক; পেটের কোনও দোষ থাক, আর নাই থাক; কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ ঘুচাইবে কেন? জ্বরের সঙ্গে যে কোন দোষই থাক আর উপসর্গই থাক, তার অমূদ

আলাদা দিবে। তার অসুদ আলাদাও দিতে পার, কুইনাইনের সঙ্গেও দিতে পার। (১২০ থেকে ১২২র পাত আর একবার ভাল করিয়া পড়)। সে সব অসুদ দিবার অনুরোধে, আসল অসুদ দিবার অবকাশ যেন ঘুচাইও না। ম্যালেরিয়া-জ্বরের আসল অসুদই কুইনাইন্। কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ হাতে পাইয়া, যিনি তা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসায় তাঁকে যেন কেউ ভুলেও না ডাকে। বেশী আর কি বলিব?

অনেকের বিশ্বাস, রোগীর পেট পরিষ্কার থাকিলে অসুদে শীঘ্র কাজ করে, আর অসুদের কাজও ভাল হয়। এ কথা খুব সত্য। কিন্তু ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর পেট পরিষ্কার করিতে গিয়া, পাছে জো হারাইয়া বসিয়া থাক, তাই ভাবি। রোগী ঘুমাইলে জাগাইয়া অসুদ খাওয়াইবার দরকার নাই—ম্যালেরিয়া-জ্বরের চিকিৎসার বেলায় এ কথা বলিবার জো নাই। কেন না, জ্বর আসিবার সময় হইলে, রোগী জাগিয়া থাকিলেও জ্বর আসে, ঘুমাইয়া থাকিলেও জ্বর আসে। তাতেই বলিতেছি, রোগী জাগিয়াই থাক, আর ঘুমাইয়াই থাক, কুইনাইন্ খাওয়াইবার সময় হইলেই, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে। ছোট ছেলেদের ম্যালে-

রিয়া-জ্বরের চিকিৎসার বেলায় এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। কেন না, সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবরে) যত ক্ষণ জ্বর থাকে, জ্বরের তাড়শে তারা একবারে ছট্-ফট্ করে। তার পর, জ্বর যে ছাড়িতে আরম্ভ করে, সেই একটু স্বস্তি পাইয়া তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। স্বল্পবিরাম-জ্বরেও (রিমিটেণ্ট ফীবরেও) ঠিক্ সেই রকম ঘটে। জ্বরের প্রকোপ—গায়ের তাত কমিতে আরম্ভ হইলে, ওরই মধ্যে একটু স্বস্তি পাইয়া তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। কুইনাইন্ খাওয়াইবার সময় এই বটে। কিন্তু কি করি? এখন্ ত জাগাইতে পারি না। অনেক কষ্টের পর একটু ঘুম আসিয়াছে। ছেলের উপর এ রকম মিছে মায়া মমতা করিয়া, কুইনাইন্ খাওয়াইবার সুযোগটা ঘুচাইয়া দেওয়া হবে না। কুইনাইন্ খাওয়াইবার সুযোগ ঘুচাইয়া দিলে, ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর কি বিপদ্ ঘটিতে পারে আর ঘটিয়া থাকে, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

বাহ্যে বন্ধ—কোষ্ঠবদ্ধ সহজ শরীরেও হয়—রোগেও হয়। সহজ শরীরে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ক্যাষ্টর্ অইল্ই খাওয়া সব চেয়ে ভাল। ক্যাষ্টর অইল খুব ঠাণ্ডা জোলাপ। ক্যাষ্টর অইলে কোনও

অগুণ করে না। আর আর জোলাপ লওয়ার পর দু এক দিন এক আধটু কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। ক্যাষ্টর অইল্ জোলাপের সে দোষ নাই বলিলেই হয়। সোণামুখী জোলাপেরও সে দোষ নাই। এ ছাড়া, আর আর জোলাপে বাহ্যে বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে, চাই কি, বাহ্যে নাও হইতে পারে। ক্যাষ্টর অইল জোলাপে সে রকম আশঙ্কা কিছুই নাই। আর আর জোলাপে পেট যে রকম গরম হয়, কাষ্টর অইলে সে রকম হয় না। তাতেই বলি, ক্যাষ্টর অইলের মত ভাল জোলাপ আর নাই। তবে ক্যাষ্টর অইল সহজে কেউ খাইতে চায় না। ক্যাষ্টর অইলের গন্ধেও ন্যাকার আসে, আস্বাদনেও ন্যাকার আসে, গিলিতে গেলেও ন্যাকার আসে। খুব গরম দুধের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইয়া খাইলে ক্যাষ্টর অইলের ও সব দোষ অনেক কাটিয়া যায়। গরম দুধের ভাবে ক্যাষ্টর্ অইলের দুর্গন্ধটা অনেক লুকোয়। খুব গরম দুধের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইলে, ক্যাষ্টর অইলের আটা আটা ভাবও অনেক কমিয়া যায়। ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আধ ছটাক। আধ ছটাক ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে ছটাক খানেক খুব গরম দুধ মিশাইয়া লইলেই হইতে পারে।

এমন কি কোনও অসুদ নাই, যার সঙ্গে মিশা-ইলে ক্যাষ্টর অইলের আটা আটা ভাবও কাটিয়া যায়—দুর্গন্ধও যায়? থাকিবে না কেন? আছে। ভাল অসুদই আছে। ক্যাষ্টর অইলের যদি বড়-মানুষি রকম জোলাপ তয়ের করিয়া দিতে চাও, তবে এমনি করিয়া তয়ের করিবে।

ক্যাষ্টর অইল	১ ঔন্স
লাইকর পোটাসি	৩০ মিনিম্
টিংচর কার্ডেমম্ কো	৩০ মিনিম্
টিংচর ল্যাবেণ্ডর কো	৩০ মিনিম
সিরপ জিঞ্জর	৪ ড্রাম
গোলাপ জল	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

এই যে অসুদ খানি তয়ের করিলে, এ একবার খাইবার মত, অর্থাৎ এক মাত্রা।

আর আর অসুদ মিশাইবার আগে, ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে লাইকর পোটাসি খুব করিয়া মিশাইয়া লইবে। তিন ঔন্স জল ধরে এমন একটা শিশিতে এক ঔন্স ক্যাষ্টর অইল লইয়া, তার উপর আধ ড্রাম লাইকর পোটাসি ঢালিয়া দিবে। তার পর, দুটো জিনিশ যতক্ষণ না বেশ মিশিয়া যায়, ততক্ষণ শিশিটা নিয়ত নাড়িতে থাকিবে—নিয়ত ঝাঁকা-ইতে থাকিবে। কাক্ দিয়া বেশ করিয়া মুখ আঁটিয়া

তবে শিশিটা ও রকম করিয়া ঝাঁকাইবে। শেষে ক্যাষ্টর্ অইল্ আর লাইকর পোটাসি, তুই একত্র মিশিয়া ঠিক্ দৈয়ের মত হইয়া গেলে, টিংচর কার্ডে-মম্ কো আর টিংচর ল্যাবেণ্ডর কো ঢালিয়া দিবে; ঢালিয়া দিয়া শিশিটে আবার ঐ রকম করিয়া ঝাঁকাইবে। তার পর, সিরপ্ জিঞ্জর্ ঢালিয়া দিবে; ঢালিয়া দিয়া শিশিটে ফের ঐ রকম করিয়া নাড়িয়া লইবে। সব শেষে গোলাপ জল ঢালিয়া দিবে; ঢালিয়া দিয়া শিশিটে অনেক ক্ষণ ধরিয়া খুব ঝাঁকা-ইবে। এই তোমার বড়-মানুষি জোলাপ তয়ের হইয়া গেল। খাইবার আগে শিশিটে আর এক-বার নাড়িয়া লইতে বলিবে। এই যে বড়-মানুষি জোলাপ তয়ের করিলে, এ এক রকম খোষবয় শর্ব্বত বলিলেই হয়।

ক্যাষ্টর অইল ছাড়া আরও অনেক জোলাপ আছে। সে সব জোলাপের কথা মেটিরিয়া মেডি-কায় বলিব।

ক্যাষ্টর্ অইল্ সহজ কোষ্ঠবদ্ধেরও যেমন অসুদ, কোষ্ঠশুদ্ধি না হওয়া যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদেরও সে রকম কোষ্ঠবদ্ধের তেমনি অসুদ। সহজ, শরীরে মাঝে মাঝে যে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই কোষ্ঠবদ্ধকেই সহজ কোষ্ঠবদ্ধ বলি-

তেছি। কোষ্ঠশুদ্ধি না হওয়া যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদের সে রকম কোষ্ঠবদ্ধ রোগকে আমাদের বৈদ্যরা কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু বলেন। ডাক্তরেরা সে রকম কোষ্ঠবদ্ধকে হেবিচুয়েল কনষ্টিপেশন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় আভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধ বলে। আভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধকে সোজাসুজি অভ্যাস-পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ বলিতে পার। অভ্যাস-পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধকে সোজা জ্ঞান করা হবে না। কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া হইয়া, শেষে অন্ত্রের ভিতর মল এত শক্ত আর এমন গুট্‌লে হইয়া জমিয়া যাইতে পারে যে, বাহ্যে হইবার পথই বন্ধ হইয়া যায়। বাহ্যে হইবার—মল বাহির হইয়া আসিবার পথ বন্ধ হইয়া গেলে কি সর্ব্বনাশ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। বাহ্যে হইবার পথ বন্ধ হইয়া গেলে তোমার জোলাপেই বা কি করিবে? পিচুকিরিতেই বা কি করিবে? অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, ডাক্তরেয়া তাকে ইণ্টেষ্টাইনেল্ অবষ্ট্রক্‌শন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ) বলে। অন্ত্রের ভিতর এই রকম করিয়া মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ যদি বন্ধ হইয়া যায়, আর চিকিৎসক যদি রোগীর বাহ্যে করাইয়া দিতে না পারেন, তবে তাঁকে তার মৃত্যু দাঁড়াইয়া দেখিতে

হয়। অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার চিকিৎসাও সোজা নয়। এ চিকিৎসার কথা এখনই বলিব। এখন অভ্যাস-পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধের চিকিৎসার কথা বলি।

অভ্যাস-পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধের আমি দুটী অসুদ জানি। সে দুটী অসুদ আর কি? ক্যাষ্টর্ অইল আর বেলাডনা। আগে ক্যাষ্টর অইলের কথা বলি। তার পর বেলাডনার কথা বলিব।

অভ্যাস-পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যখন এত বিপদ্ ঘটিতে পারে আর ঘটিয়াও থাকে, তখন যত শীঘ্র পার এ রকম কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইয়া দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, প্রথম দিন ছটাক খানেক গরম দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দেড় ঔন্স (১২ ড্রাম্) ক্যাষ্টর অইল তাকে খাওয়াইয়া দিবে। তার পর দিন সাড়ে এগার ড্রাম্ ক্যাষ্টর অইল্ খাওয়াইয়া দিবে। তিন দিনের দিন এগার ড্রাম্ ক্যাষ্টর আইল্ দিবে। চারি দিনের দিন সাড়ে দশ ড্রাম্ দিবে। পাঁচ দিনের দিন দশ ড্রাম্ দিবে। ছ দিনের দিন সাড়ে নয় ড্রাম্ দিবে। সাত দিনের দিন নয় ড্রাম্ দিবে। আট দিনের দিন সাড়ে আট ড্রাম্ দিবে। নয় দিনের দিন আট ড্রাম্ (এক ঔন্স) দিবে। এই রকম করিয়া রোজ ক্যাষ্টর

অইলের মাত্রা আধ ড্রাম্ করিয়া কমাইয়া কমাইয়া দিবে। এই রকম করিয়া মাত্রা কমাইতে কমাইতে যখন ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আধ ড্রামে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্যাষ্টর অইল না খাইলেও রোগীর বাহ্যে আপনিই হবে। কোষ্ঠ-শুদ্ধির জন্যে তার কোনও জোলাপ লইতে হবে না। যথার্থই ক্যাষ্টর অইলের এটী বড় আশ্চর্য্য গুণ। আর কোনও জোলাপের এ গুণ আছে কিনা, বলিতে পারি না। এর আগেই বলিছি, আর আর জোলাপ লওয়ার পর দু এক দিন কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কিন্তু ক্যাষ্টর অইল্ জোলাপ লইলে সে রকম কোষ্ঠবদ্ধ হয় না। সোণামুখী জোলাপেরও এ গুণ আছে। কোষ্ঠ-বদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তার যখন এই রকম করিয়া চিকিৎসা করিবে, তখন তাকে খুব লঘু আহার দিবে। কেন না, এ অবস্থায় রোগী যদি আহারের কোনও অত্যাচার করে, তবে তার পেটের ব্যামো হয়। লঘু আহার আর কি? সাগু, য়্যারারুট, এক বল্কা দুধ, সরু চাইলের ভাত আর মাছের ঝোল।

তার পরু এখন বেলাডনার কথা বলি।

বেলাডনা অভ্যাস পাওয়া কোষ্ট-বদ্ধের আর একটী খুব ভাল অষুদ। কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস

পাইয়া গিয়াছে, তাকে রোজ সকালে বেলাডনার বড়ি খাইতে দিবে। বেলাডনার বড়ি যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলাডনা	...	...	১ গ্রেন্‌
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্‌	...	....	৩ গ্রেন্‌

একত্র মিশাইয়া এতে ৬টা বড়ি তয়ের কর।

রোজ সকালে একটী করিয়া বড়ি খাইতে দিবে। একটী বড়িতেই বেশ কোষ্ঠ-শুদ্ধি হয়। একটা বড়িতে যার বাহ্যে পরিষ্কার না হবে, তাকে দুটো বড়ি একবারে দিবে। দুটো বড়িতে না হয় ত, তিনটে বড়ি একবারে দিবে। তিনটের বেশী দিবার দরকার হয় না। সচরাচর একটা বড়িতেই বেশ কাজ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, বেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তার অপাকের কিছু না কিছু পরিচয় পাইবেই পাইবে। আর বেশ করিয়া যদি ঠাউরে দেখ, তবে তার জিবের উপর খুব পাতলা আর শাদা এক রকম ছাতা দেখিতে পাইবে। এ ছাড়া, তার জিবের আগার ফুট্‌কি ফুট্‌কি গুলি উচু আর রাঙা মালুম হবে। হাত দিয়া উপর-পেট (বুকের কড়ার নীচেটা) চাপিলে, তার ব্যথা লাগে। সহজ শরীরে আহারের পর যে রকম

একটু স্বস্তি বোধ হইয়া থাকে, তার সে রকম স্বস্তি হয় না। স্বস্তি হওয়া দূরে থাক, আহারের পর তার বরং কষ্টই হয়। কষ্ট আর কোথায়? পেটে। আহারের পর পেট কেমন এক রকম ভার ভার বোধ হয়; আর কেমন এক রকম অসুখ অসুখ করে। এ ছাড়া, তার এক আধটু মাথা-ধরা প্রায় থাকেই। এ রকম রোগী যদি বেশ নিয়ম করিয়া বেলাডনার ঐ বড়ি খায়, তবে তার কোষ্ঠবদ্ধ নির্দ্দোষ সারিয়া যায়। বেলাডনার বড়ি ক দিন খাইতে হয়, তার কিছু নিয়ম এমন ধরা নাই। কারো কারো সাত দিনেই বেশ উপকার হয়। কারো কারো চৌদ্দ দিনের কমে তেমন উপকার হয় না। আবার কারো কারো কোষ্ঠবদ্ধ নির্দ্দোষ সারিয়া যাইতে একুশ দিনও লাগে। রোগী যে দিন সকালে বেলাডনার বড়ি খায়, সেই দিনই খাওয়া দাওয়ার পর তার বাহ্যে পরিষ্কার হয়—খানিক শক্ত মল নির্গত হইয়া যায়। যখন দেখিবে, বেলাডনা না খাইয়াও কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইতেছে, তখনই জানিবে যে, বেলাডনা ও রকম নিয়ম করিয়া খাওয়ার যে কাজ, তা হইয়াছে। সাত দিনই হোক্, চৌদ্দ দিনই হোক্, আর একুশ দিনই হোক্, নিয়ম করিয়া বেলা-ডনার বড়ি খাইলে, তার পর রোজ আপনিই কোষ্ঠ-

শুদ্ধি হইতে থাকে। বেলাডনা আর খাইতে হয় না। বেলাডনা না খাইয়াও যখন রোজ নিয়ম মত কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইতে থাকে, তখন আগেকার কোষ্ঠবদ্ধর দরুণ তার আর কোন কষ্টই থাকে না।

বিলেতে একটী মেমের এই রকম কোষ্ঠবদ্ধ হইছিল। মেমসাহেবের বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। তাঁর বয়স যখন একুশ বছর, তখন তাঁর কোষ্ঠবদ্ধ রোগ আরম্ভ হয়। তার পর ৪৭ বছর বয়স পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থেকে তিনি নানা রকম কষ্ট পান। কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে তিনি হপ্তায় এক বার করিয়া জোলাপ লইতেন। তার পর, এক ডাক্তর সাহেব তাঁর চিকিৎসা করেন। ডাক্তর সাহেবের পরামর্শে তিনি বেলাডনার ঐ বড়ি দু হপ্তা খান। চৌদ্দ দিন নিয়ম করিয়া বেলাডনা খাইয়া তাঁর অত প্রাচীন কোষ্ঠবদ্ধ রোগও বেশ সারিয়া গিয়াছিল। কোন কোন জায়গায় বেলাডনা বেশ নিয়ম করিয়া খাইয়াও রোগী কোষ্ঠবদ্ধের হাত একবারে এড়াইতে পারে না। এ রকম ঘটনা কিন্তু খুবই কম ঘটে। যাই হোক্, এ রকম ঘটিলে রোগী যদি এক দিন অন্তর, কি দু দিন অন্তর, বেলাডনার বড়ি খায়, তবে তাঁর কোষ্ঠবদ্ধ মোটে হইতেই পারে না। কেন না, সচরাচর

জোলাপ লওয়ার পর এক আধটু কোষ্ঠবদ্ধ যা হইয়া থাকে, বেলাডনা খাওয়ার পর তা হয় না। এ ছাড়া, বেলাডনার মাত্রা বাড়াইবার দরকার হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগ বেশী দিনের না হইলে, বেলাডনায় খুব শীঘ্র উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে এক জন পাঁচ হপ্তা ধরিয়া এক দিন অন্তর জোলাপ লইয়াছিল। উপ্‌রো উপ্‌রি এত বার জোলাপ লইয়া উপকারের চেয়ে তার অপকারই বেশী হইল। শুনিলে আশ্চর্য্য হবে, শেষে সেই রোগী বেলাডনার ঐ বড়ি নিয়ম করিয়া খাইয়া, ছ দিনে তেমন কোষ্ঠবদ্ধ রোগের হাত থেকে নিস্তার পাইল !

কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে যদি অপাক থাকে, কি অগ্নি-মন্দ থাকে, তবে বেলাডনা খাওয়াইবার আগে রোগীর যাতে বেশ পরিপাক হয়, অগ্নি বৃদ্ধি হয়, এমন অসুদ দিবে। খাওয়া দাওয়ার ধরাধর করিলে, আর নিয়ম করিয়া স্যালিসিনের পুরিয়া দিন কতক খাইলে, অপাক দোষ বেশ সারিয়া যায়। স্যালি-সিনের পুরিয়া ৫৯১র পাতে লেখা আছে।

এর আগেই বলিছি, কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে বেলাডনার ঐ বড়ি তিন হপ্তার বেশী খাইতে হয়

না। এ ছাড়া, কোষ্ঠবদ্ধ দূর করিবার ক্ষমতা বেলাডনার এতই আছে যে, বেলডনা খাইয়া আমার কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচিল না—রোগীকে এ কথা প্রায়ই বলিতে হয় না। অষুদের গুণ এর বাড়া আর কি হইতে পারে ?

সচরাচর আমরা যে সব জোলাপ ব্যবস্থা করিয়া থাকি, বেলাডনার সঙ্গে সে সব জোলাপের তুলনাই হইতে পারে না। কেন না,

(১) বেলাডনা খাইলে পেট কামড়ায় না; পেটের ভিতর কোন রকম অসুখই বোধ হয় না।

(২) বেলাডনা খাওয়ার পর একবার সহজ বাহ্যে হয়; বাহ্যে বেশ পরিষ্কার হয়। বেলডনা খাওয়ার পর বাহ্যে হইতে বেশী দেরিও হয় না।

(৩) বেলাডনা খাইয়া যে বাহ্যে হয়, তার পর কোষ্ঠবদ্ধ বাড়ে না।

(৪) বেলাডনা খাইলে অন্ত্রের দোষ সব ঘুচিয়া যায়; অন্ত্রের অবস্থা সহজ হয়; কাজেই কোন রকম জোলাপ লইবার দরকারই হয় না।

(৫) খুব কম মাত্রায় খাইলেও কাজ হয়। যে অষুদ খাইতে হবে, তার মাত্রা যত কম হয়, ততই ভাল। অষুদের আস্বাদন ভাল হওয়া রোগীর যেমন প্রার্থনা, অষুদের মাত্রা কম হওয়াও তার

তেমনি প্রার্থনা। যিনি রোগ ভোগ করিয়াছেন—যাঁকে অম্বুদ খাইতে হইয়াছে, তাঁকে এ সব কথা আর বেশী করিয়া বলিতে হবে না। অম্বুদের মাত্রা খুবই কম (নাই বলিলেও হয়), আর খাইতে কোন কষ্টই নাই বলিয়া, রোগিদের কাছে হোমিওপেথিক্ অম্বুদের এত আদর! যাই হোক্, অম্বুদের মাত্রা যত কম হয়, আর তার আস্বাদন যত ভাল হয়, রোগীর পক্ষে ততই ভাল; সব চিকিৎসকেরই যেন এ কথাটা মনে থাকে। চিকিৎসক অম্বুদের ব্যবস্থা করিয়া খালাস। এত খানি বিকট অম্বুদ কেমন করিয়া খাইব; এ চিন্তা চিকিৎসকের নয়—এ চিন্তা রোগীর। এ চিন্তার ভাগ চিকিৎসককেও কিছু কিছু লইতে হইলে ভাল হইত। তা হইলে অম্বুদের মাত্রা আর আস্বাদনের দিকে সব চিকিৎসকেরই নজর থাকিত। ছেলে-দের চিকিৎসার বেলায় অম্বুদের মাত্রা আর আস্বা-দনের দিকে চিকিৎসকের বিশেষ নজর রাখা চাই। নৈলে, তারা অম্বুদ কিছুতেই পেটে রাখিতে পারে না—বমি করিয়া ফেলে। এ সব কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব।

তার পর এখন খতিয়ে দেখ, বেলাডনার যে কয়টা গুণের কথা বলিলাম, আর কোনও জোলা-

পের সে কয়টা গুণ আছে কি না। সে কয়টা গুণ থাকা দূরে থাক্, আর কোনও জোলাপের তার একটা গুণও আছে কি না, সন্দেহ। তাতেই বলিতেছি, গুণে বেলাডনার কাছে আর কোনও জোলাপই নয়। জোলাপকে ডাক্তরেরা পর্গেটিব্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় রেচক বলে। যে অসুদে এক আধ বার অল্প স্বল্প বাহ্যে হয়, ডাক্তরেরা তাকে ল্যাক্সেটিব্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মৃদু-রেচক বলে।

তার পর এখন অন্ত্রাবরোধের চিকিৎসার কথা বলি।

এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, ডাক্তরেরা তাকে ইন্টেষ্টাইনেল্ অব্ষ্ট্রাক্শন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ) বলে। অভ্যাস-পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ থেকেই যে বাহ্যে হওয়ার পথ শেষে বন্ধ হইয়া যায়, এ কথাও এর আগে বলিছি। তার পর এখন কেমন করিয়া জানিবে, রোগীর অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া তার বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে? তা জানা শক্ত নয়। তা জানিবার বেশ উপায় আছে। সে উপায় আর কি? রোগের লক্ষণ। রোগীর অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া তার বাহ্যে হও-

য়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, লক্ষণ দেখিয়া তা জানা যায়—লক্ষণ দেখিয়া তা ঠিক্ করিতে পারা যায়। এখন সেই লক্ষণের কথা বলি।

এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, ভাল কথায় তাকে অন্ত্রাবরোধ বলে। এই জন্যে, বারে বারে অত গুলি কথা না বলিয়া, তার বদলে এখন থেকে অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ) বলিব। অন্ত্রাবরোধ কথাটা শক্ত বলিয়া যেন আসল রোগটার কথা বুঝিতে গোলমাল করিয়া ফেলিও না।

অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ——অন্ত্রাবরোধ অনেক রকম। অন্ত্রের ভিতর মল ক্রমে জমিয়া বাহ্যে হবার পথ বন্ধ হইয়া যায়; অন্ত্রের এই রকম অবরোধই সচরাচর ঘটে। এই রকম অন্ত্রাবরোধেরই রোগী আমাদের হাতে সচরাচর আসে। এই জন্যে, এখানে কেবল মল বদ্ধরই দরুণ অন্ত্রাবরোধের কথা বলিলাম। সুবিধা পাই ত আর কয় রকম অন্ত্রাবরোধের কথা এর পর বলিব। মল-বদ্ধর দরুণ অন্ত্রাবরোধ যে এক দিনেই ঘটে, তা নয়। অনেক দিনের কোষ্ঠবদ্ধ থেকে তবে এ রোগটা ঘটে। এক দিন মোটেই বাহ্যে হইল না, তার পর দিন নামে মাত্র বাহ্যে হইল। হয় ত দশ পোনর দিন, কি মাসেক

কারণ, এই রকম করিয়া নামে মাত্র রোজ বাহ্যে হইতে লাগিল। রোজ রোজ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইয়া অন্ত্রের ভিতর এই রকম করিয়া মল জমিতে লাগিল। এই বদ্ধ-মল ক্রমে গুট্‌লে বাঁধিতে লাগিল, আর শুকাইয়া শক্ত জমাট হইতে লাগিল। শেষে বাহ্যে হবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। বাহ্যে হইবে বলিয়া রোগী বাহ্যে যায়, কিন্তু মোটেই বাহ্যে হয় না। উপ্‌রো উপ্‌রি দু তিন দিন এই রকম হইল দেখিয়া সে জোলাপ লইল। জোলাপ মোটেই খুলিল না। খুলিবে কেমন করিয়া? বাহ্যে হবার পথই যে বন্ধ। রোগী তা জানে না। এ জোলাপে কোনও কায হইল না বলিয়া, একটা কড়া রকম জোলাপ লইল। এ বারেও জোলাপ খুলিল না। এ বারে, বাড়তির ভাগ, পেটের একটু ফাঁপ হইল, আর পেট-ব্যথা করিতে লাগিল। পেটের ফাঁপ, আর পেট-ব্যথা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। পেটের ফাঁপ আর পেট-ব্যথা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি আরম্ভ হইল। পেট ডাকিতে লাগিল, আর পেটের ভিতর থেকে আঁত গুলি যেন ঢেউ খেলিয়ে খেলিয়ে উঠিতে লাগিল। এই সব দেখিয়া গৃহস্থ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার আসিয়া আগা গোড়া সব্‌ বেশ করিয়া শুনি-

লেন। জোলাপ খোলে নাই শুনিয়া তিনি পিচ্‌কিরির ব্যবস্থা করিলেন। জুত বরাত করিয়া পিচ্‌কিরি দিলেন বটে ; কিন্তু পিচ্‌কিরির জল সব বাহির হইয়া আসিল। পিচ্‌কিরির জল সব ভিতরে গেলও না। যাবে কেমন করিয়া ? ভিতরকার পথ যে বন্ধ। বাহ্যে হবারও পথ বন্ধ; পিচ্‌কিরির জল যাবারও পথ বন্ধ। শক্ত গুট্‌লে মলে অন্ত্রের ভিতর যে বুজন। পিচ্‌কিরিতেও বাহ্যে হইল না; ডাক্তর মহাশয় বিষম মস্কিলে পড়িলেন; কি উপায়ে রোগীকে বাঁচাইবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। এখন দেখ, রোগীকে বাঁচাইবার সত্য সত্যই কোন উপায় আছে কি না ? আছে। ভাল উপায়ই আছে। সে উপায় আর কি ? বাহ্যে করাইবার উপায়। এ অবস্থায় যে অসুদ খাওয়াইলে রোগীর বাহ্যে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

সল্‌ফেট অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া	...	৪ ড্রাম্‌
ডাইলিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক্‌ য়্যাসিড্‌	...	৪০ মিনিম্‌
লাইকর য়্যাট্রোপীন্‌	... ...	২০ মিনিম্‌
টিংচর অরান্‌শিয়াই	... ...	৪ ড্রাম্‌
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	... ...	৩ ঔন্স ৩ ড্রাম্‌

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৪টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ তিন ঘণ্টা অন্তর খাইবে।

আমি অনেক জায়গায় এ অস্নুদটী ব্যবহার করিয়া হাতে হাতে ফল পাইয়াছি। ফল কথা, এই ভয়ানক রোগের এমন অস্নুদ আর আছে কি না, বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, এ রোগের এমন অস্নুদ আর নাই। আমি দেখিছি, অস্নুদটী একবার খাইলেই রোগীর যাতনা অনেক কম পড়ে। দু বার খাইলে পেট নরম হয়, আর বায়ু সরে। তিন বারের পর খুব শক্ত এক আধটা গুট্‌লে মল বাহির হইয়া আসে। চারি বার অস্নুদ খাওয়ার পর খানিকটে পাতলা মল বাহির হয়। পাঁচ বারের পর ঢের গুট্‌লে বাহির হইয়া আসে। এর পর থেকেই বিনা কষ্টে তার বাহ্যে হইতে থাকে। সব জায়গাতেই যে ঠিক্ এই নিয়মে এই রকম ঘটিতে চায় বা ঘটিয়া থাকে, তা নয়। তবে খতিয়ে দেখ ত, প্রায়ই এই রকম দেখিতে পাবে।

এই অস্নুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে যদি গরম জলের টপে বসান যায়, আর গরম জলের পিচ্‌কিরি দেওয়া যায়, তবে রোগীর বাহ্যে হইতে বেশী দেরি হয় না। এ ছাড়া, রোগীর পেটের চামড়ার নীচে ৫ মিনিম্ করিয়া লাইকর য়্যাট্রোপীন্ মাঝে মাঝে পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে পারিলে, রোগী আরও শীঘ্র ভাল হয়। চামড়ার নীচে কেমন

করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, ৯৩—৯৪র পাতে তা বলিছি।

অন্ত্রাবরোধ ভারি শক্ত রোগ। এ রোগ হইলে রোগীর জীবন লইয়া টানাটানি করিতে হয়। এ ছাড়া, এ রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসককে একবারে নাকানি চোকানি খাইতে হয়। এ রোগ একটু শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে চিকিৎসককে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয়। জোলাপ দিলে বমি হইয়া উঠিয়া যায়। পিচ্‌কিরি দিলে পিচ্‌কিরির জল বাহির হইয়া আসে। বিষম দায়। চিকিৎসক কিছুতেই রোগীর যাতনা কমাইতে পারেন না। অনেক জায়গায় চিকিৎসককে হারি মানিয়া চলিয়া আসিতে হয়। তাতেই বলি, কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যখন এমন ভয়ানক রোগ জন্মে, তখন কোষ্ঠবদ্ধকে কখনই সোজা ব্যাপার মনে করা হবে না। কোষ্ঠবদ্ধ রোগটা খুব সাধারণ। কোষ্ঠবদ্ধ সচরাচরই ঘটে। তাই বলিয়া, কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যে অমন ভয়ানক রোগ জন্মিতে পারে, আর জন্মিয়া থাকে, তা যেন ভুলিয়া যাইও না। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে তখনই তার প্রতিকার করিবে; কখনও অবহেলা করিয়া থাকিবে না।

বেলাডনা কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার খুব ভাল অষুদ।

এ কথা এর আগেই বলিছি। আবার য়্যাট্রোপীন্ অন্ত্রাবরোধের তেমনি ভাল অসুদ। এ কথাও এই মাত্র বলিলাম। কোষ্ঠবদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে। কোষ্ঠবদ্ধ নিজে সোজা রোগ। অন্ত্রাবরোধ ঢের শক্ত রোগ—শক্ত রোগ কেন? ভয়ানক রোগ। তেমনি আবার এ দিকে ধর। বেলাডনা আর য়্যাট্রোপীন্ একই জিনিষ। সিংকোনরে সঙ্গে কুই-নাইনের যে রকম সম্বন্ধ; আফিঙের সঙ্গে মর্ফিয়ার যে রকম সম্বন্ধ; বেলাডনার সঙ্গে য়্যাট্রোপীনের ঠিক্ সেই রকম সম্বন্ধ। বেলাডনা থেকে য়্যাট্রাপীন্ তয়ের হয়। বেলাডনার চেয়ে য়্যাট্রোপীন্ ঢের তেজাল বিষ—ভয়ানক বিষ। তবেই দেখ, কোষ্ঠ-বদ্ধ আর অন্ত্রাবরোধ, এ দুটী রোগের সঙ্গে, বেলাডনা আর য়্যাট্রোপীন্, এ দুটী অসুদের কেমন চমৎকার মিল! কোষ্ঠবদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে। বেলাডনা থেকে য়্যাট্রাপীন্ তয়ের হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ঢের সোজা রোগ; এর অসুদও (বেলাডনা) তেমনি ঢের নরম বিষ। অন্ত্রাবরোধ খুব ভয়ানক রোগ; এর অসুদও (য়্যাট্রাপীন্) তেমনি কড়া—তেমনি ভয়ানক বিষ।

য়্যাট্রোপিয়া, য়্যাট্রোপাইনা, য়্যাট্রোপীন্ঃ—য়্যাট্রোপীনের এই তিনটী নাম। য়্যাট্রোপীন্ নামটীই

বেশী চলিত। য়্যাট্রোপীন্ ঘটিত ও অসুদটী খাওয়া-ইবার সময় রোগীর চকের পুত্‌লো মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে দেখিবে, চকের পুত্‌লো বড় হইয়াছে, সেই অমনি য়াট্রোপীনের মাত্রা কমা-ইয়া দিবে। চকের পুত্‌লো বড় হওয়া; চকে ঝাপ্সা দেখা; মাথা-ঘোরা; ভুল-বকা, ঠোঁট, জিব, টাক্‌রা শুকাইয়া যাওয়া, আর সেই জন্যে গিলিবার কষ্ট; নাড়ীর বল কমা আর বেগ বাড়া;—এ সব লক্ষণ দেখা দিলে তখনই অসুদ বন্ধ করিয়া দিবে। এ সব লক্ষণ না মানিয়া যদি অসুদ খাওয়াইতে থাক, কি চামড়ার নীচে য়্যাট্রাপীন্ পিচকিরি করিতে থাক, তবে খেঁচুনি হইয়া রোগী শীঘ্রই মরিয়া যায়। তা হইলেই অন্ত্রাবরোধের চূড়ান্ত চিকিৎসা করিলে! খেঁচুনিও হয়, পক্ষাঘাতও হয়। ছোট ছেলেদের তড়কা হইলে যেমন খেঁচুনি হয়; জোওয়ান রোগি-দের মৃগি রোগে যেমন খেঁচুনি হইয়া থাকে, এখা-নেও সেই রকম খেঁচুনি হয়। বেলাডনা খাইয়া বিষাক্ত হইলেও রোগীর এই সব লক্ষণ ঘটে। এ সব কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব।

সহজ শরীরে বাহ্যে-বন্ধর কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। এখন জ্বর জাড়িতে বাহ্যে বন্ধ হওয়ার কথা বলিব।

কোষ্ঠবদ্ধ থাক বা না থাক, জ্বর হইলেই জোলাপ লইতে হয়—ছেলে বুড়ো জোওয়ানের এ ব্যবস্থা জানা আছে। এ ব্যবস্থা জানিবার জন্যে চিকিৎসকের দরকার হয় না। এ ব্যবস্থা গৃহস্থরা নিজেই করিয়া থাকেন। জ্বর হইলে আগে জোলাপের খোঁজ—তার পর অষুদ বিষুদের খোঁজ। ব্যবস্থা যা আছে, তা বেশই আছে। সে সম্বন্ধে আমি এখন আর কিছু বেশী বলিতে চাই না। এর আগে দু চারি কথা যা বলিছি, তাই যথেষ্ট। তবে মোটামুটি জানিয়া রাখ, জ্বর-গায়ে জোলাপ লওয়া ভাল নয়। অনেক জায়গায় তাতে অনিষ্ট হয়। গায়ের তাত যত বেশী, জ্বরের তাড়না যত বেশী, জোলাপ লওয়ায় তত দোষ। ছেলেদের বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে, তেমন আর কারু বেলায় নয়। জ্বরে ছেলেদের জোলাপ দেওয়া, আর তাদের তড়কা ডাকিয়া আনা—দুই-ই সমান। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল, মাঝারি রকম শহরের চাপরাশ-ওয়ালা এক জন ভাল ডাক্তর, পাঁচ বছরের এ[illegible]টি ছেলেকে খুব জ্বরের উপর জোলাপ দিয়া [illegible] সাংঘাতিক তড়কা আনিয়া উপস্থিত করিছি[illegible]ন। সেই তড়কাতেই ছেলেটী মারা যায়। [illegible]টীকে বাঁচাইবার জন্যে

শেষে আমরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হইছিল। তড়কার সূত্রপাতেই বিশেষ তদ্বির হইলে কি রকম ফল হইত, বলিতে পারি না। তড়কার ভয়ে ছেলেদের জ্বর জাড়িতে জোলাপ দেওয়া ত উচিত নয়, জানিয়া রাখিলাম। তাদের কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার তবে উপায় কি? কেন? পিচ্কিরি দিলে তখনই তাদের বাহ্যে হইয়া যায়। পিচ্কিরি দেওয়ার মত সোজা কাজ আর নাই। পিচ্কিরি দেওয়া ব্যপারও খুব সোজা—পিচ্কিরি দেওয়ায় কোন ভয়ও নাই—পিচ্কিরি দেওয়ায় কোন কষ্টও নাই। খানিক্‌টে গরম জলে সাবান গুলিয়া, তাতে একটু ক্যাষ্টর অইল আর একটু তার্পিণ দিয়া, তাই পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। ছেলের বয়স বুঝিয়া সাবান-গোলা জলের, ক্যাষ্টর অইলের, আর তার্পিণের মাত্রার ইতর বিশেষ করিবে। ৮১২—৮১৩র পাতে এ সব বেশ করিয়া বলিছি। ছেলেদের গায়ের তাত খুব বেশী হইলে তাদের তড়কা হইবারই কথা— অনেক জায়গায় তড়কা হইয়াও থাকে। এ অব-স্থায় তাদের জোলাপ দেওয়া আর "ঘুমন্ত বাঘ চিওন", দুই-ই সমান—এ কথাটা যেন সকলেরই মনে থাকে। পিচ্কিরি দিলে দুই উপকার এক-

বারে হয়। বাহ্যে ত তখনই হয়—তড়্কা হইবার ভয়ও অনেক কমিয়া যায়।

জ্বরের উপর জোওয়ান রোগিদেরও জোলাপ দেওয়া পরামর্শ নয়। জ্বরের প্রকোপের সময় জোলাপ দিলে তাদের আমাশাও হইতে পারে—রক্ত-আমাশাও হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ বেশী রকম থাকিলে, পিচ্কিরি দিয়া তাদের বাহ্যে করাইয়া দিতে পার। ৬২র পাতে যে ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড মিক্শ্চর লেখা আছে, সে মিক্শ্চরেও বাহ্যে হয়। যে সব অষুদে সহজ বাহ্যে হয়, ভাল কথায় তাদের মৃদু-রেচক বলে। ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড একটী মৃদু-রেচক। এই জন্যে, জ্বরে যারা ও মিক্শ্চর খায়, তাদের আর কোনও জোলাপ দিবার বড় একটা দরকার হয় না। ও মিক্শ্চরে যদিই বাহ্যে না হয়, তবে পিচ্কিরি দিয়া বাহ্যে করাইয়া দিবে। কি কি জিনিশ দিয়া, কি রকম জুত বরাত করিয়া পিচ্কিরি দিতে হয়, এর আগে তা অনেক বার বলিছি।

পেট-ফাঁপার কথা বলিবার সময় পিচ্কিরি দিবার কথা ঢেরই বলিছি। সে সব কথা যদি মনে করিয়া রাখ, আর জায়গা বিশেষে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া সে সব খাটাইয়া লও; তবে পিচ্কিরি

দিবার কথা তোমাকে আমার আর বেশী কিছু বলিতে হবে না। বাতশ্লেষ্ম-বিকারেই হোক্, আর অন্য কোন রকম শক্ত জ্বর জাড়িতেই হোক্, জোলাপ দিয়া কখনও বাহ্যে করাইবে না—পিচ্-কিরি দিয়া রোগীর বাহ্যে করাইয়া দিবে। এ একটা নিয়ম জানিয়া রাখ। ভুলেও কখনও এ নিয়মের এ দিক্ ও দিক্ করিও না। বাতশ্লেষ্ম-বিকার কাকে বলে, এর আগে তা অনেক বার বলিছি।

অনেক জায়গায় স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) শেষে পেটের-ব্যামো (ডায়ারীয়া) আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। জোলাপ দিলে সে সব জায়গায় "ঘুমন্ত বাঘ চিওন" হয় মাত্র। তাতেই বলি, জ্বরে জোলাপ টোলাপ দেওয়া ভাল নয়। তবে সোজাসুজি জ্বরে, জ্বর ছাড়িয়া গেলে বেশ সবল রোগীকে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিয়া তার কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইতে পার। কিন্তু জোলাপের অনু-রোধে কুইনাইন্ খাওয়াইবাব সুযোগ যেন হারাইও না। এ কথা এর আগেই বলিছি। দরকার হয় ত, কুইনাইন্ আর জোলাপ এক সঙ্গেই দিতে পার। কুইনাইনের সঙ্গে জোলেফা (জ্যালপ পাউডর) বেশ দেওয়া যায়। এ কথাও এর আগে বলিছি।

বাহ্যে-বন্ধের কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম।

এখন আর একটা মোটা কথা বলিয়া বাহ্যে-বন্ধের কথা শেষ করিব। এ মোটা কথাটা বড় কাজের। এ কথাটায় রোগীরও যেমন দরকার, সহজ মানুষেরও তেমনি দরকার।

বেশ খিদে হওয়া, বেশ হজম হওয়া, বেশ ঘুম হওয়া, আর রোজ নিয়ম মত সহজ বাহ্যে হওয়া, (বাহ্যে পরিষ্কার হওয়া) সুস্থ শরীরের চিহ্ন। এ সব, সুস্থ শরীরেই হইয়া থাকে। এ চারিটীর এক-টীর তফাত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। শরীর যাদের ভারি অসুস্থ, এ চারিটীর একটীও তাদের নিয়ম মত হয় না। ডাক্তরেরা বলেন, তুমি যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখ, পা গরম রাখ, আর কোষ্ঠ পরি-ষ্কার রাখ, তবে তোমার ডাক্তরের তক্কা রাখিবার দরকার নাই। এখন এই তিনটী কথার মানে এক বার বেশ তলিয়ে বুঝ দেখি। তাঁরা (ডাক্তরেরা) ওডিকলোঁ, ল্যাবেণ্ডর মাথায় দিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে বলেন নাই। রোজ নিয়ম মত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। তাঁরা গরম মোজা পায়ে দিয়া পা গরম রাখিতে বলেন নাই। পথ চলিয়া—বেড়াইয়া পা গরম রাখিতে হয়। তাঁরা জোলাপ লইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে, বলেন নাই। খাওয়া দাওয়ার ধরাধর করিয়া—খাওয়া

দাওয়ার তদ্বির করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হয়। যদি বল, খাওয়া দাওয়ার ধরাধরই বা কি রকম? খাওয়া দাওয়ার তদ্বিরই বা কি রকম? কি রকম তা বলি। খিদে রাখিয়া খাইতে হয়। খিদে না রাখিয়া খাইলে অগ্নিমন্দ হয়। অগ্নিমন্দ হইলে ভাল পরিপাক হয় না। ভাল পরিপাক না হইলে, রোজ নিয়ম মত সহজ বাহ্যে হওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। তার পর ধর। যে সব জিনিশ সহজে পরিপাক হয়, কেবল সেই সব জিনিশই খাইলে অগ্নি ঠিক্ থাকে—অগ্নিমন্দ হইতে পারে না—পরিপাকেরও কোনও ব্যাঘাত হয় না—রোজ নিয়ম মত সহজ বাহ্যে হইবারও কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। তার পর ধর। বাহ্যে যে হয়, সেটা কি? যা খাওয়া যায়, তারই অবশিষ্ট অসার ভাগ মল হইয়া নামিয়া যায়। তবেই দেখ, যা খাওয়া যায়, তা যদি সবই পরিপাক হইয়া যায়, তবে তার অবশিষ্টই বা কি থাকিবে? মল হইয়াই বা কি নামিয়া যাবে? তাতেই বলি, পরিপাক হবে না বলিয়া, সন্দেশের খোসা ছাড়িয়া খাওয়ার গোচ নিতান্ত বাছিয়া গুছিয়াও খাওয়া ভাল নয়। যাঁরা এ রকম করিয়া নিতান্ত বাছিয়া গুছিয়া খান, তাঁরা কোষ্ঠ-বদ্ধর হাত কখনও এড়াইতে পারেন না। যুক্তি

সব-তাতেই চাই। আহারের ত্রুটিতে তাঁদের কোষ্ঠবদ্ধ হইতেছে; তাঁরা তা না বুঝিয়া কোষ্ঠ-বদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে জোলাপ লইয়া লইয়া সারা হন। আপনারাও সারা হন; কোষ্ঠবদ্ধ ঘোচে না কেন বলিয়া চিকিৎসককেও তিত বিরক্ত করেন। তাতেই বলি, আমাদের দেশে আহারাদির যে ব্যবস্থা আছে, তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। ডাইল আর তরকারি দিয়া যাঁরা রোজ নিয়ম মত জুত বরাত করিয়া ভাত খান; তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া যাঁরা দিন কাটান না; কোষ্ঠবদ্ধ কি, তাঁদের তা জানিতে হয় না। বসিয়া থাকিলে—শ্রম না করিলে—শরীরকে না খাটাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়; যাঁদের খাওয়া পরার কষ্ট নাই, তাঁদের সেটা জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। ঘরে ভাত কাপড়ের অভাব না থাকে—খাটিবার দরকার না থাকে—রোজ দু বেলা আধ কোশ করিয়া এক কোশ পথ হাঁটিয়া আসিবে—বেড়াইয়া আসিবে—তাতে ত আর কোনও দোষ নাই।

এখানে সহজ শরীরে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার কারণও এক রকম মোটামুটি বলিলাম। গৃহস্থও সাবধান হইতে পারিবেন; চিকিৎসকও তাঁর রোগীকে পরামর্শ দিতে পারিবেন।

তার পর এখন পক্ষাঘাতের কথা বলি।

১২। পক্ষাঘাত——ম্যালেরিয়া-বিষে না ঘটাইতে পারে, এমন রোগই নাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। তাতেই বলি, ম্যালেরিয়া-জ্বরেরও উপসর্গ না হইতে পারে, এমন রোগই নাই। আর তাতেই বলিতেছি, ম্যালেরিয়া-জ্বরের সব রকম রোগী যদি বাঁচাইতে চাও, তবে তোমাকে অনেক রকম রোগের চিকিৎসা বেশ করিয়া জানিয়া রাখিতে হবে। তার পর বলি।

যদি ধর ত পক্ষাঘাত, রোগের একটী লক্ষণ বৈ আর কিছুই নয়। উদরী যেমন রোগের একটী লক্ষণ, পক্ষাঘাতও তেমনি রোগের একটী লক্ষণ জানিবে। পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা প্যারালিসিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে পল্‌জি বলে। মগজের (মাথার ঘিলুর) অনেক রকম ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মগজে বেশী রকম ঘা ঘো লাগিলেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। শির-দাঁড়ার মাইজের অনেক রকম ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। শির-দাঁড়ার মাইজে বেশী রকম ঘা ঘো লাগিলেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মগজ-ঢাকা পর্দ্দারও ব্যামো স্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। শির দাঁড়ার মাইজ-ঢাকা

পর্দ্দারও ব্যামো স্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মগজের কথা আর শির-দাঁড়ার মাইজের কথা ৮৪০—৮৪১র পাতে বলিছি। মগজ-ঢাকা পর্দ্দার কথা ৪৯০র পাতে বলিছি। মগজ থেকে আর শির দাঁড়ার মাইজ থেকে যে সব শির বাহির হইয়াছে, সে সব শিরকে ডাক্তরেরা নর্ব্ব্ বলেন। নর্ব্ব্কে ভাল বাঙ্গালায় স্নায়ু বলে। স্নায়ুর সোজা কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। এই জন্যে, স্নায়ু কথাই ব্যবহার করিতে হইল। রাঙা রক্তের শির, কাল রক্তের শির, আর রসের শির—এ সব শির ফাঁপা; স্নায়ু ফাঁপা নয়—নিরেট। স্নায়ুর কথা ৭০৬র পাতে বলিছি। এই স্নায়ুর ব্যামো স্যামো থেকেও কখন কখনও পক্ষা-ঘাত হয়। তবে, স্নায়ুর ব্যামো স্যামো হইয়া, কি স্নায়ুতে ঘা ঘো লাগিয়া পক্ষাঘাত সচরাচর হয় না। ডিফ্থীরিয়া রোগ থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। ডিফ্থীরিয়া, টাক্‌রার এক রকম ছোঁওয়াচে রোগ। এ রোগের কথা এর পর বলিব। বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হই-য়াও থাকে। বাতকে ডাক্তরেরা রিয়ুম্যাটিজ্‌ম্ বলেন। গুল্মবায়ু থেকেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। গুল্মবায়ুকে ডাক্তরেরা হিষ্টিরিয়া

বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। সীসে (ধাতু), কি পারা শরীরে প্রবেশ করিলে তা থেকেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কড়ি বরগায় আর সাসি খড়্খড়েতে লাগাইবার জন্যে যারা রং তয়ের করে, আর যারা ঐ সব জিনিশে রং লাগায়, তাদের শরীরে সীসে প্রবেশ করে। সেই রঙে সীসে আছে। সর্ব্বদা সেই রং নাড়াচাড়া করিলে, ক্রমে শরীরের মধ্যে সীসে প্রবেশ করে। পারা অনেক রকমে শরীরে প্রবেশ করে। গর্ম্মির ব্যামোতে রোগীরা ত কত রকম করিয়াই পারা ব্যবহার করে। মার্কুলি খায়, বাতি লয়, গুল টানে। পারাকে ইংরিজিতে মর্করি বলে। "মর্করি" কথাটা বাঙ্গালায় "মার্কুলি" বলিয়া চলিত হইয়া গিয়াছে। সীসে আর পারা শরীরে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুর বল আর মাংসের বল ক্রমে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্নায়ুর বল আর মাংসের বল গেলেই, আর কি, পক্ষাঘাত হইল। মাংসকে ডাক্তরেরা মস্‌ল্‌ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় পেশী বলে। তার পর বলি।

পক্ষাঘাত কি? পক্ষাঘাত কাকে বলে? কোন অঙ্গের শান না থাকিলে, সে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, বলিতে পার। কোন অঙ্গ নাড়িবার চাড়ি-

বার শক্তি না থাকিলে, সে অঙ্গেরও পক্ষাঘাত হই-য়াছে বলিতে পার। তবেই ধর, কোন অঙ্গের শান গেলেও পক্ষাঘাত বলে; কোন অঙ্গ নাড়িবার চাড়িবার শক্তি গেলেও পক্ষাঘাত বলে। শরীরের কোন জায়গা ছুঁইলে যে জানিতে পারা যায়, ভাল কথায় তাকে স্পর্শজ্ঞান বলে। ছোঁওয়ার ভাল কথা স্পর্শ। স্পর্শজ্ঞানকে সোজা কথায় শান বলে। শরীরের কোন জায়গা ছুঁইলে যদি জানিতে না পারা যায়, তবে সোজা কথায় সে জায়গার শান নাই বলিয়া থাকি। তবেই জানিয়া রাখ, কোন অঙ্গের শুদ্ধু শান গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে; কোন অঙ্গ নাড়িবার চাড়িবার শক্তি গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে; আবার শান আর নাড়িবার চাড়ি-বার শক্তি, দুই-ই একবারে গেলে তাকেও পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শান আর নাড়িবার চাড়িবার শক্তি, দুই-ই একবারে যায়, সে পক্ষাঘাতকে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শুদ্ধু শান যায়, সে পক্ষাঘাতকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শুদ্ধু নাড়িবার চাড়িবার শক্তি যায়, সে পক্ষাঘাতকেও অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। "সম্পূর্ণ"র সোজা কথা পূর; আর "অসম্পূর্ণ"র সোজা কথা পূর নয়। সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত আর অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত,

এই দু জাতি পক্ষাঘাতের কথা মনে করিয়া রাখা চাই। কেন না, যত রকম পক্ষাঘাত আছে, সে সব রকই এই দু জাতির ভিতর;—এমন কোন রকম পক্ষাঘাত নাই, যা এ দু জাতির ভিতর নয়। তার পর বলি।

পক্ষাঘাত ১৩ রকম।

১। সব শরীরের পক্ষাঘাত—সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাত। ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে জেনরল্ প্যারালিসিস্ বলেন। এ পক্ষাঘাত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কেন না, সব শরীরের পক্ষাঘাত হইলে রোগী জীয়ন্ত থাকিতে পারে না। সব শরীরের সম্পূর্ণ (পূর) পক্ষাঘাত যে হয়, রোগী সেই মরে।

২। শরীরের ডাইন্ আধ-খানার (ডাইন্ অঙ্গের), কি বাঁ আধ-খানার (বাঁ অঙ্গের) পক্ষাঘাত। ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে হেমিপ্লীজিয়া বলেন। আর আর যত রকম পক্ষাঘাত আছে, সব চেয়ে এইটীই সাধারণ। ডাইন্ অঙ্গের চেয়ে, বাঁ অঙ্গেরই পক্ষাঘাত বেশী ঘটে। পায়ের গোছের পক্ষাঘাতের চেয়ে, হাতের বাউর পক্ষাঘাত বেশী পূর রকম হয়। কখন কখন যে দিকের হাতের আর পায়ের পক্ষাঘাত হয়, তার বিপরীত দিকের মুখের আর জিবের পক্ষাঘাত হয়। মগজের ব্যামো থেকে এ

পক্ষাঘাত হয়। মগজে কোন রকম ঘা ঘো লাগিলেও এ পক্ষাঘাত হয়।

৩। শরীরের নীচের আধখানা অঙ্গের পক্ষাঘাত। ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে প্যারাপ্লীজিয়া বলেন।। কোমোর থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত অঙ্গ খানির পক্ষাঘাত হয়—শানও থাকে না, নড়িবার চড়িবার শক্তিও থাকে না। শির-দাঁড়ার মাইজের ব্যামো থেকেই এ পক্ষাঘাত হয়। শির-দাঁড়ার মাইজ-ঢাকা পর্দ্দারও ব্যামো থেকে এ পক্ষাঘাত হয়। শির-দাঁড়ার মাইজে কোন রকম ঘা ঘো লাগিলেও এ পক্ষাঘাত হয়।

৪। মুখের পক্ষাঘাত—ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে ফেশিয়েল্ প্যারালিসিস্ বলেন। সচরাচর মুখের কেবল এক দিকেরই পক্ষাঘাত হয়। এ পক্ষাঘাতে রোগীর জীবনের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়।

৫। শরীরের নীচেকার আধখানা অঙ্গের অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত—এও এক রকম প্যারাপ্লীজিয়া বলিলেই হয়। এ পক্ষাঘাতে রোগীর চলন দেখিলে হাসি পায়। রোগী যখন চলে, তখন বোধ হয়, সে যেন আর কারু বিশ্রী চলনের নকল করিয়া দেখাইতেছে। রোগীর বিশ্রী চলনেই এ পক্ষা-

ঘাতের পরিচয়। এ পক্ষাঘতেকে ডাক্তরেরা লকো-মোটর এটাক্সি বলেন।

৬। ছেলেদের পক্ষাঘাত—ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে ইন্‌ফ্যান্টাইল্ প্যারালিসিস্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় শৈশব পক্ষাঘাত বলে। শৈশব মানে শিশুদের; শিশু বয়সের; শিশু বেলার। দুধে দাঁত পড়িয়া ফের দাঁত বঠিবার সময় এ পক্ষাঘাত হয়; তার আগেও হয়। মোটামুটি জানিয়া রাখ, পাঁচ মাস বয়সের আগে, আর চারি বছর বয়সের পর এ পক্ষাঘাত প্রায় হয় না। প্রায়ই সুস্থ আর সবল ছেলেদেরই এ পক্ষাঘাত হয়। রোগা আর দুর্ব্বল ছেলেদের এ পক্ষাঘাত না হয়, এমন নয়। এ পক্ষাঘাত এত শীঘ্র হয় যে, কখন্ কি রকম করিয়া হইল, তা মোটে বুঝিয়া উঠিতেই পারা যায় না। সচরাচর জ্বর হইয়াই এ পক্ষাঘাত হয়। তড়কা হইয়াও এ পক্ষাঘাত হয়। তড়কাকে ডাক্তরেরা (কন্‌বল্‌শন্স) বলেন। জ্বরের সময়ই হোক্, আর জ্বরের পরই হোক্, ছেলের পক্ষাঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অঙ্গের পক্ষাঘাত হয়, সে অঙ্গটী একবারে অকেজো হইয়া যায়; কখন কখন অঙ্গটী হঠাৎই অকেজো হইয়া যায়। এক দিকেরই হোক্, আর দু দিকের হোক্, কুচ্‌কি থেকে পায়ের তলা

পর্য্যন্ত সব অঙ্গখানির পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে ; কিম্বা হাতের বাউর আর পায়ের গোছের পক্ষাঘাত হইতে পারে। কিন্তু এ পক্ষাঘাতে সেই এক দিকের হাতের বাউর আর পায়ের গোছের পক্ষাঘাত কখনও হয় না। এ পক্ষাঘাত আপনা হইতেই ভাল হইয়া যাইতে পারে; কি বরাবরি থাকিয়া যাইতেও পারে। এ পক্ষাঘাতে ছেলের প্রস্রাব বাহ্যের কোনও ব্যাতিক্রম ঘটে না। পক্ষাঘাত যদি থাকিয়া যায়, তবে সে অঙ্গ একবারে শুকিয়ে যায়, আর জড়-শড় হইয়া কেমন এক রকম বিশ্রী হইয়া যায়। কেবল সেই অঙ্গেরই যা কিছু দুর্দ্দশা ঘটে, নৈলে ছেলে বেশ সবল আর সুস্থ দেখা যায়। সে অঙ্গের দিকে নজর না পড়িলে, ছেলের কোনও রোগ আছে এমন বোধই হয় না।

চিকিৎসা——পক্ষাঘাতের সূত্রপাতেই ছেলের মাড়ি চিরিয়া দাঁত বাহির করিয়া দিবে। অনেক জায়গায় শুদ্ধু মাড়ি চিরিয়া দেওয়াতেই কাজ হয়; আর কিছুই করিতে হয় না। আমি এ হাতে কলমে করিয়া দেখিছি। নীচে মালিষের যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, ছেলের পিঠের দাঁড়ায় আর যে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, সেই অঙ্গে মালিশ করিলে খুব উপকার হয়।

য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (বলেণ্টাইন্ লিনিমেণ্ট)			১ ঔন্স
ক্যাজুপ্ট্ অইল	...	...	১ ঔন্স
তার্পিণ ...	...	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

মাঝে মাঝে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিবে। যে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে অঙ্গ খুব গরমে রাখিবে; আর রোজ নিয়ম করিয়া ঐ অসুদ সে অঙ্গে বেশ করিয়া মালিশ করিবে। তার পর তাতে বিদ্যুতের কল লাগাইবে। বিদ্যুতের কলের কথা এর পর বলিব। এ ছাড়া, ভাল আহার আর বলকারক অসুদ দিয়া ছেলের শরীর খুব সবল রাখিবে। বলকারক অসুদকে ডাক্তরেরা টনিক্ বলেন। এখানে কড্লিবর্ অইল আর সিরপ্ ফেরি আয়োডাইডে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কোনও অসুদে নয়। ছেলের আর জ্বর না হইতে পারে, তার উপায় বিধিমতে করিবে। শরীর যত দিন বেশ সবল আর সুস্থ না হবে, রোজ নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাইতে দিবে।

এ পক্ষাঘাত সচরাচরই ঘটে। এই জন্যে, এখানে এ পক্ষাঘাতের কথা একটু বিশেষ করিয়া লিখিলাম। বাকী আর কয় রকম পক্ষাঘাতের কেবল নাম করিলাম মাত্র।

৭। গুল্মবায়ু (মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাই) থেকে

পক্ষাঘাত, আর বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত। গুল্মবায়ু থেকে যে পক্ষাঘাত হয়, সে পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা হিষ্টেরিক্যাল্ প্যারালিসিস্ বলেন। বাতের ব্যামো থেকে যে পক্ষাঘাত হয়, সে পক্ষাঘাতকে তাঁরা রিয়ুম্যাটিক্ প্যারালিসিস্ বলেন।

৮। যে পক্ষাঘাতে, শরীরের জায়গার জায়গার মাংস শুকাইয়া যায়—ক্ষয় পাইয়া যায়—এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা ওয়েষ্টিং পল্‌জি বলেন।

৯। পারা থেকে পক্ষাঘাত—এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা মর্কুরিয়্যাল্ পল্‌জি বলেন। পারাকে ইংরিজিতে মর্করি বলে। এ কথা এর আগেই বলিছি।

১০। সীসে থেকে পক্ষাঘাত—এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা লেড্ পল্‌জি বলেন। সীসেকে ইংরিজিতে লেড্ বলে।

১১। যে পক্ষাঘাতে দু খানি হাত আর বাউ নিয়ত কাঁপে—এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা প্যারালিসিস্ য়্যাজিট্যান্স বলেন।

১২। ছেলেদের আর এক রকম পক্ষাঘাত আছে। সে পক্ষাঘাতে পায়ের ডিম্ব আর পাছা খুব ডাগর হয়। কিন্তু পায়ের জোর কিছুই থাকে না। চলিতে চলিতে ছেলে নিয়ত আছাড় খায়; পড়িয়া গেলে আবার শীঘ্র উঠিতে পারে না।

এ বার (১২) রকম ছাড়া ছোট খাটো অনেক রকম পক্ষাঘাত আছে। পক্ষাঘাত রোগের কথা যখন ভাল করিয়া লিখিব, তখন সে সব রকম পক্ষাঘাতেরই কথা বিশেষ করিয়া বলিব। এ বৈতে এত রকম পক্ষাতের কথা বিশেষ করিয়া লিখিলে, বৈ খানি ঢের বড় হইয়া যাইত। এই জন্যে, এ বৈতে পক্ষাঘাতের কথা এই পর্য্যন্ত লিখিলাম।

১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা

——ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথাকে ডাক্তরেরা টন্সিলাইটিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে সোর্-থ্রোট বলে। আল্জিবের দু পাশে মাংসের দুটী গুল্লি আছে। সেই গুল্লি দুটীর এক একটীকে ডাক্তরেরা টন্সিল্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় টন্সিল্কে তালুমূল-গ্রন্থি বলে। গুল্লির ভাল কথা গ্রন্থি; (৬২৭র পাত দেখ) আর টাক্রার ভাল কথা তালু। এই জন্যে, টন্সিল্কে সোজা বাঙ্গালায় টাক্রার গুল্লি বলিতে পার। টন্সিলাইটিস্ ডাক্তরি কথা। টন্সিলাইটিসের অর্থ টন্সিলের ইন্ফ্ল্যামেশন্। ২৪৮র পাতে বলিছি, শরীরের কোনও জায়গায় খুব রক্ত জম্মিলে, ফুলিলে, আর ব্যথা হইলে, সেই জায়গার সে রকম অবস্থাকে ইন্ফ্ল্যামেশন্ বলে। ইন্ফ্ল্যামেশন্ ইংরিজি কথা। ভাল বঙ্গালায় একে

প্রদাহও বলে, সন্তাপও বলে। এই জন্যে, টন্‌সিলাই-টিস্‌কে সোজা বাঙ্গালায় টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহ বলিতে পার। টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহের ভাল কথা তালুমূলগ্রন্থি-প্রদাহ। বায়ুনলিভুজ-প্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস্‌ কথা যেমন ঢের সোজা; তালুমূলগ্রন্থি-প্রদাহ আর টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহ, এ দুয়ের চেয়ে টন্‌সিলাইটিস্‌ কথা তেমনি ঢের সোজা। এই জন্যে, ব্রংকাইটিস্‌ কথাটী এ বৈতে যেমন চলিত কথার মত ব্যবহার করিছি, টন্‌সিলাইটিস্‌ কথাটীও জায়গায় জায়-গায় তেমনি চলিত কথার মত ব্যবহার করিলাম। দেখিও টন্‌সিলাইটিস্‌ বলিলে ওর অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। টাক্‌রার গুল্লিতে (টন্‌সিলে) রক্ত জমিলে, ব্যথা হইলে, আর তা ফুলিলে ডাক্তরেরা তাকে টন্‌সিলাইটিস্‌ বলেন। দুটী গুল্লিরই যে এক বারে প্রদাহ হইয়া থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। প্রদাহ একটী গুল্লিরও হইতে পারে; দুটী গুল্লিরও হইতে পারে। "প্রদাহ" কথারও অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। প্রদাহ বলিলে কি বুঝায়, ২৪৮'র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি; ২৪৮'র পাত ছাড়া আরো অনেক জায়গায় বলিছি।

এর আগেই বলিছি, ডাক্তরি টন্‌সিলাইটিস্‌ কথার সোজা ইংরিজি সোর্‌-থ্রোট্‌। আবার সোর্‌-

থ্রোটের সোজা বাঙ্গালা ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা। তাতেই বলিতেছি, শুদ্ধ ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলেই সব চুকিয়া যায়। টন্‌সিলাইটিস্‌ও বলিতে হয় না; সোর্‌-থ্রোটও বলিতে হয় না। তবে, টন্সিলাইটিস্ বলিলে, কি সোর্‌-থ্রোট বলিলে, আল্ টাক্‌রার গুল্লির যেমন প্রদাহ বুঝায়; ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলেও ঠিক্ তাই বুঝিয়া লইবে। তার যেন কোনও গোলমাল করিও না। ঢোক্ গিলিতে গলায় ব্যথা আরও কোন কোন রোগে হয় বটে। কিন্তু টন্‌সিনাইটিস্ রোগে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ছাড়া যেমন আর কোনও বিশেষ লক্ষণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমন আর কোনও রোগেই নয়। এই জন্যে, সোর্‌-থ্রোট বলিলে যেমন টন্‌সিলাইটিস্ ছাড়া আর কোনও রোগ বুঝায় না, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলে তেমনি কেবল টন্‌সিলাইটিস্ রোগটাই বুঝিয়া লইতে হবে। তবু গোলের কথা একবারে দূর করিবার জন্যে "ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার" কাছে দু দিকে এলেক দিয়া "টন্‌সিলাইটিস্" কথা লিখিয়া দিব। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা, এই কথাই বারে বারে বলিছি। কেউ কেউ বলিতে পারেন, তবে কি কেবল ঢোক গিলিতেই গলায়

ব্যথা? আর কিছু গিলিতে গলায় ব্যথা লাগে না? এ কথার উত্তর এই। চকের পল্লব যেমন না ফেলিয়া থাকা যায় না—চকের পল্লব যেমন আপনিই পড়ে—ঢোক না গিলিয়া তেমনি থাকা যায় না—ঢোকও তেমনি আপনিই গিলিতে হয়। ঢোক গেলার মত এমন সোজা অভ্যাসের কাজেও যখন ব্যথা লাগে, তখন আর যাই কেন হোক্ না, গিলিতে গেলেই যে ব্যথা লাগিবে, তা ত বেশ বুঝাই যাইতেছে। আর কোন্ কোন্ রোগে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা লাগে, এর পর তা বলিব।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন্সিলাইটিস্) রোগটী বড়ই সাধারণ। এর মত সাধারণ রোগ আর নাই বলিলেও বলা যায়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সচরাচরই ঘটে। কারো কারো ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ছুতোয় নতায় হয়। একটু হিম লাগিলেই তাদের ঢোক গিলিতে লাগায় ব্যথা হয়। শর্দ্দি হইলে ত তাদের শর্দ্দি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়। এ রোগ-টীর এমনি প্রকৃতি যে, একবার হইলে ফিরে আবার হইবার গোড়া পত্তন যেন করিয়া যায়। একটু অছিলে পাইলেই ফের হয়। বিশেষ, একবারকার

ব্যামোর দরুণ টাক্‌রার গুল্লি যদি জখম থাকিয়া যায়, তবে ফিরে সে গুল্লির প্রদাহ হইতে বড় বেশী অছিলের দরকার হয় না; নামে মাত্র ছুতো পাই-লেই অমনি ও গুল্লির প্রদাহ ঘটে। কারো কারো ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা পুরাণ পড়িয়া যায়; পুরাণ পড়িয়া গেলে তারা সহজে এ অস্বস্তির হাত এড়াইতে পারে না।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা যদি সহজ রকমের হয়, তবে ঢোক গিলিতে কষ্ট ছাড়া রোগীর আর কোনও কষ্ট বা যাতনার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। সহজ রকমের এ অস্বস্থি সামান্য অত্যা-চারেই ঘটে। অত্যাচার আর কি? শীত বাত ভোগ—ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা—বা বৃষ্টিতে ভেজা। দুর্ব্বল শরীরে এ রকম অত্যাচার ঘটিলে এ অস্বস্তির হাত কখনও এড়ান যায় না।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন্সিলাইটিস্) রোগটী যেমন সাধারণ, আবার তেমনি কষ্টদায়ক। এ রোগে সকলে সমান কষ্ট পায় না। এর কারণ আর কিছুই না। প্রদাহের কমি বেশীই এ রকম ইতর বিশেষের কারণ। যার কেবল একটী গুল্লির সামান্য রকম প্রদাহ হয়, ঢোক গিলিতে একটু কষ্ট ছাড়া তার আর কোনও রকম যাতনা বা

ক্লেশ হয় না। কিন্তু যার দুটী গুল্লিরই খুব ভারি রকম প্রদাহ হয়, আর সেই প্রদাহ ছাড়াইয়া পড়ে, তার ক্লেশের, তার কষ্টের, তার যাতনার পরিসীমা থাকে না। প্রদাহ ছড়াইয়া পড়ে যে বলিলে—প্রদাহ ছড়াইয়া কোথায় যায়। প্রদাহ ছড়াইয়া টাক্‌রায় যায়, আল্-জিবে যায়, গলার ভিতর পর্য্যন্ত যায়। এ সব জায়গার প্রদাহ হইলে রোগীর কি বিষম কষ্ট হয়, তা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এ সব কথা এর পরই বলিব।

এ রোগ সচরাচর আমরা যা দেখিতে পাই, তার লক্ষণ এই——প্রথমে ঢোক গিলিতে সামান্য একটু কষ্ট বোধ হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই আল্-টাক্‌রার ভিতর শুরু শুরু, আর যেন কষিয়া ধরার মত বোধ হয়। এ রকম বোধ যে মাঝে মাঝে হয়, তা নয়। সর্ব্বদাই এ রকম বোধ হয়। এ ছাড়া, আল্-টাক্‌রার ভিতর যেন কিছু আট্‌কাইয়া রহিয়াছে, এমনি বোধ হয়। এ রোগের প্রথম লক্ষণই এই। তার পর, বাইরের আলোতে রোগীর আল্-টাক্‌রার ভিতর বেশ ঠাউরে দেখিলে, তার একটী গুল্লি (টন্সিল্) কি দুটী গুল্লিই রাঙা হইয়াছে আর ফুলিয়াছে, দেখিতে পাইবে। কখন কখন দুটী গুল্লি-রই প্রদাহ এক বারে হয়। কিন্তু সচরাচর তা হয় না।

প্রথমে কেবল একটী গুল্লিরই প্রদাহ হয়; তার পর সেটীর ফুলো যেমন কমে, আর একটীর ফুলো তেমনি আরম্ভ হয়। কর্ণমূল-ফোলা রোগেও অনেক জায়গায় ঠিক্ এই রকম ঘটে। এক দিকের কর্ণ-মূল-ফোলা যে একটু কমে, সেই অমনি আর এক দিকের কর্ণমূল ফুলিতে আরম্ভ হয়। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। তার পর বলি। আল্-জিব ডাগর হয়, লম্বা হয়, আর খুব রাঙা হয়। এ অস্বস্তিতে আল্-জিবের এ রকম ভাব সচরাচরই হয়। আল্-জিব প্রায়ই জিবের উপর ঠেকিয়া থাকে। জিবের উপর আল্ জিব এই রকম করিয়া ঠেকিয়া থাকে বলিয়াই, রোগীকে অত কষ্ট করিয়া বারে বারে ঢোক গিলিতে হয়। এ রোগে ঢোক গেলা কত কষ্ট, এ অস্বস্তি যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন, তিনিই তা জানেন। আল্-জিব জিবের উপর ঐ রকম করিয়া ঠেকিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়, সেই জায়গায় যেন কিছু আট্কাইয়া রহিয়াছে। তাতেই, বারে বারে অত কষ্ট করিয়া ঢোক গিলিতে হয়। আল্-টাক্রার যে গুল্লিটী (টন্সিল) খুব বেশী ফোলে, আল্-জিবটে প্রায়ই সেই গুল্লির গায়ে লাগিয়া থাকে। আল্-টাক্রার শুরু ভাব শীঘ্রই ঘুচিয়া যায়; তার বদলে শ্লেষ্মা আসিয়া জমে। সে

শ্লেষ্মা সহজ শ্লেষ্মার মত নয়। সে শ্লেষ্মা ফেণা ফেণা, আর চট-চটে আটা। সেই চট-চটে আটা শ্লেষ্মা, গুল্লির (টন্‌সিলের) গায়ে আর তার চারি পাশে জড়াইয়া লাগিলা থাকে। সেই চট-চটে আটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার জন্যে রোগী নিয়ত গলা-খাঁকা দিতে থাকে। আবার সেই চট-চটে আটা শ্লেষ্মা গিলিয়া ফেলিবারও জন্যে সে নিয়ত চেষ্টা করে। নিয়ত এ রকম গলা-খাঁকা দেওয়াতে, আর শ্লেষ্মা গিলিয়া ফেলিবার জন্যে নিয়ত এ রকম চেষ্টা করাতে, তার যে কি কষ্ট, তা সেই-ই জানে। শ্লেষ্মাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

আল্ টাকরার গুল্লির প্রদাহ (টন্সিলাইটিস্) খুব ভারি রকম হইলে, কখন কখন কর্ণমূলের গুল্লি আর চোয়ালের নীচেকার গুল্লি ফোলে আর তাতে ব্যথা হয়; আবার কখন কমন রোগীর মুখ দিয়া নিয়ত লাল গড়াইতে থাকে। আল্-টাকরার গুল্লির (টন্-সিলের) প্রদাহ ছড়াইয়া লালের গুল্লিতে গেলে রোগীর এই দশা ঘটে। কর্ণমূলের গুল্লিকেও লালের গুল্লি বলে; চোয়ালের গুল্লিকেও লালের গুল্লি বলে। লালের গুল্লিকে ডাক্তরেরা স্যালিবারি গ্ল্যাণ্ড বলেন; ভাল বাঙ্গালায় লালাগ্রন্থি বলে। লালের ভাল

কথা লালা; আর গুল্লির ভাল কথা গ্রন্থি। এই সব গুল্লি থেকে লাল বাহির হয়। এই সব গুল্লিতে লাল তয়ের হয়। লাল তয়ের করাই এই সব গুল্লির কাজ। এই জন্যে, তাদের লালের গুল্লি বলে। লাল ভারি দরকারী জিনিষ। হজমের জন্যে—পরিপাকের জন্যে লালের ভারি দরকার। কর্ণমূল-ফোলার কথা বলিবার সময় এ সব ভাল করিয়া বলিব।

কখন কখন দেখা যায়, রোগী ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলে; কিন্তু যে অস্বস্তিতে ঢোক গিলিতে গলা ব্যথা হয়, ঠাউরে দেখিলে তার আল্-টাক্‌রার ভিতর তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তার আল্‌-টাক্‌রার গুল্লির (টন্‌সিলের) প্রদাহের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তবে রোগী ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলে কেন? এখানে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার কারণ কি? কারণ সেই এক—প্রদাহ। এখানে আল্-টাক্‌রার গুল্লির আরও নীচের দিকে—গলার ভিতরে প্রদাহ হয়। সে প্রদাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে জায়গার প্রদাহ যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়। সে জায়গার প্রদাহকে ডাক্তরেরা ফ্যারিঞ্জাইটিস্ বলেন; সোজা বাঙ্গালায় গলার নলির উপরকার থলির

প্রদাহ বলে। গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহ সচরাচর ঘটে না। গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহের কথা এর পর বলিব।

এই অস্বস্তিতে কেবল গিলিবারই সময় গলায় ব্যথা লাগে। গলার ভিতর ব্যথা আছে কি না, আর কোনও সময় তা বোধই হয় না, বলিলে হয়। আল্‌টাকরার গুল্লিতে ব্যথা হয় বলিয়াই গিলিবার সময় ব্যথা লাগে আর অত কষ্ট হয়। তা ছাড়া, আল্‌টাকরার গুল্লি ডাগর হয় বলিয়া গিলিবার পথ আঁটো হইয়া যায়; কাজেই গিলিবার সময় ব্যথার জায়গায় আরও বেশী চাপ পায়, আর সেই জন্যে গিলিতে আরও বেশী কষ্ট হয়। দুটী গুল্লিরই প্রদাহ যদি একবারে হয়, আর দুটী গুল্লিই যদি একবারে খুব ফুলিয়া যায়, তবে মাংসের ডেলার মত গুল্লি দুটী সুমুখের দিকে ঠেলিয়া আসে। কখন কখন গুল্লি দুটী ফুলিয়া এত বড় হয় যে, তাদের গায়ে গায়ে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়। গায়ে গায়ে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি আর ঘেঁষা-ঘেঁষি হইলে চাপ পাইয়া দুই গুল্লিতেই ঘা হয়। চুমুক দিয়া খাইবার জিনিষ গিলিবার চেষ্টা করিলে নাক দিয়া তা বাহির হইয়া আসে। এ অস্বস্তির এ একটী সাধারণ লক্ষণ। ব্যথা একটু বেশী হইলে এ রকম প্রায়ই ঘটে। খুব নরম জিনি-

শও রোগী গিলিতে পারে না। নরম গরমের কথা দূরে থাক; গিলিবার নামে রোগী ডরায়। খিদেতে জ্বলিয়া মরে, তবু খাবার জিনিশের দিকে চায় না। ব্যামো একটু শক্ত রকম হইলে, গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়। এ লক্ষণটী ভাল নয়। যে সব রোগীর গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়, তাদের মধ্যে অনেকের আণ্টাকৃরার গুল্লি পাকে—আণ্টাকৃরার গুল্লিতে পূয হয়। গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হইলেই যে, আণ্টাকৃরার গুল্লি পাকিয়া থাকে বা পাকিতে চায়, তা নয়। তবে আণ্টাক্‌রার গুল্লিতে পূয হওয়ার আগে, গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়। এ কথাটা মনে করিয়া রাখা খুব দরকার বটে। কখন কখন কানের ভিতর কেমন এক রকম শব্দ হয়, আর রোগী কানে কম শুনে।

আণ্টাকৃরার গুল্লির (টন্‌সিলের) প্রদাহ যদি খুব বেশী রকম হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া জিবের গোড়া পর্য্যন্ত যায়, তবে রোগী বেশ হা করিতে পারে না। কাজেই, তার আণ্টাকৃরার ভিতরকার অবস্থা দেখা মস্কিল হইয়া পড়ে। এ রকম ঘটিলে, আঙুল দিয়া আস্তে আস্তে বেশ করিয়া ঠাউরে দেখা

ছাড়া, আণ্টাক্‌রার ভিতরকার অবস্থা জানিবার আর কোনও উপায় নাই। কখন কখন রোগী মোটেই হা করিতে পারে না। তার মুখের ভিতর আঙুলটী পর্য্যন্ত দিতে পারা যায় না। এ ছাড়া, সে মোটেই জিব নাড়িতে পারে না।

এ অস্বস্তিতে নিশ্বাস লইতে বা নিশ্বাস ফেলিতে রোগীর কোনও রকম কষ্ট দেখা যায় না। ফল কথা, নিশ্বাস লইতে বা নিশ্বাস ফেলিতে তার কোনও রকম কষ্ট হয়ও না। ব্যামোর বাড়াবাড়ি হইলেও তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও রকম কষ্ট হয় না। এ কথাটী মনে করিয়া রাখা বড় দরকার। আর যে যে রোগে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়, সে সব রোগ থেকে এ রোগটী (আণ্টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহ—টন্সিলাইটিস্) চিনিয়া লইবার সময়, এ কথাটী বড় কাজে লাগিবে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। আণ্টাকরার গুল্লি ফুলিয়া ডাগর হয় বলিয়া, গলার ছাঁদা তাতে এক রকম বুজিয়া যায বলিলেই হয়। এই জন্যে, রোগীর স্বরও বদ্‌লে যায়, কথাও বদ্‌ল্যে যায়। রোগীর গলার স্বর শুনিলে বোধ হয়, তার গলার ভিতর যেন কিছু আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। ফল কথা, সে রকম স্বর যিনি এক বার শুনিয়া বেশ করিয়া

ঠাউরে রাখিয়াছেন, তাঁর আর কখনও ভুল হয় না। সে রকম স্বর শুনিলেই তিনি রোগ ধরিয়া দিতে পারেন। আন্টাক্‌রার ভিতরকার অবস্থা তাঁকে দেখিতেও হয় না। গলার ব্যথা বেশী রকম হইলে রোগীর কথা এত অস্পষ্ট হয় যে, মোটে তা বুঝিতেই পারা যায় না।

এর আগেই বলিছি, এ রোগে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু আন্টাক্‌রার গুল্লি দুটী খুব বেশী রকম ফুলিলে, কখন কখন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। ভাগ্য ক্রমে এ রকম প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু যখন এ রকম ঘটে, তখন রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয়।

এ রোগে জ্বর-ভাব সর্ব্বদাই থাকে। বগলে তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিলে পারা ১০০র দাগ ছাড়াইয়া উঠে। কারো কারো জ্বর খুব বেশী রকমই হয়। তাদের বগলে তাপনান-যন্ত্র দিলে পারা ১০৪র দাগে উঠে। জ্বর হইবার আগে কারো বা কেবল একটু শীত বোধ হয়; কারো বা স্পষ্ট কম্প হয়। কম্প যে বেশী হয়, তা নয়। কম্প সামান্য রকই হয়। শীত বা কম্পের পর জ্বর ফোটে। পিপাসা হয়, আর খিদে মোটেই থাকে না। জিব ভারি নোংরা হয়; মুখে দুর্গন্ধ হয়; আর কোষ্ঠবদ্ধ হয়।

মাথা-ধরার জন্যে রোগী প্রায়ই খুব কষ্ট পায়। ধর ত, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন্‌সিলাইটিস্) যে রকম রোগ, রোগীর জ্বর জ্বালা যাতনা তার চেয়ে ঢের বেশী।

আণ্টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ শেষে প্রায়ই আপনা হইতেই কমিতে আরম্ভ হয়; তার পর, কমিতে কমিতে আপনিই বেশ সারিয়া যায়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা যদি কমিয়া যায়; জ্বর জ্বালা ক্রমে কমিয়া আসে, শ্লেষ্মা বেশী বেশী নির্গত হয়; আর শ্লেষ্মার আটা কমিয়া যায়; তবে আণ্টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ কমিয়া আসিতেছে, আর শীঘ্রই প্রদাহ সারিয়া যাবে, ঠিক্ করিবে। আণ্টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ সারিয়া যাইবার আগে এই সব লক্ষণ দেখা দেয়। ফল কথা, আণ্টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ সারি-বার লক্ষণই এই। তার পর, আণ্টাকৃরার গুল্লিতে পূয হইবার আগে—আণ্টাকৃরার গুল্লি পাকিবার আগে যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, এখন সেই সব লক্ষণের কথা বলি। আণ্টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ খুবই বেশী হয়—খুবই বাড়িয়া যায়। গুল্লি দুটী এত বেশী ফোলে যে, গলার ছাঁদা প্রায় বুজিয়া যাইবার মত হয়; কাজেই, রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের বেশ ব্যাঘাত ঘটে। গুল্লি দুটিতে এমনি ব্যথা হয় যে,

তার ভিতর যেন তুলো ফুঁড়িতে থাকে। সেই ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়। রোগী মোটেই হা করিতে পারে না। সে জিব বাহির করিতেও পারে না; নাড়িতেও পারে না। এ রোগে বাইরের ফুলো সংরাচর বড় একটা মালুম হয় না। কিন্তু গুল্লিতে পূয হইবার আগে—গুল্লি পাকিবার আগে গাল গলা বেশই ফোলে। পাঁচ ছ দিনের পর যদি ব্যামো বাড়ে, কি ব্যামো নরম না পড়ে, তবে গুল্লি পাকিবে, ঠিক্ করিবে। কখন কখন গুল্লিতে পূয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কম্প হয়। রোগীর এ রকম অবস্থায় কম্প হওয়া, গুল্লিতে পূয হওয়ার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে। সব জায়গাতেই যে কম্প হইয়া থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। গুল্লিতে পূয হইলে তার উপরকার পর্দ্দার ভিতর দিয়া পূয বেশ দেখা যায়। কিন্তু অনেক জায়গায় পূয এত নীচে থাকে যে, খুব ঠাউরে দেখিলেও তা মালুম করিতে পারা যায় না। শেষে গুল্লির কোড়া ফাটিয়া পূয বাহির হইয়া যায়। পূয যে বাহির হইয়া যায়, অমনি অগুনে যেন জল পড়ে। রোগীর যে তেমন যাতনা, তা তখনই ঘুচিয়া যায়। যাতনাও থামিয়া যায়, গিলিবারও কষ্ট যায়। মোটামুটি ধরিতে গেলে, রোগী এক রকম ভাল হইয়াই যায়। পূয যা বাহির হয়,

তার ভারি দুর্গন্ধ। পূযের তার (আস্বাদন) আরও বিশ্রী; জিবে লাগিলে গা-ন্যাকার ন্যাকার করিয়া উঠে। পূযের এই বিশ্রী তার আর দুর্গন্ধেই ত জানা যায় যে, ফোড়া ফাটিয়া গিয়াছে। নৈলে, অনেক জায়গায় তা জানিতে পারা যায় না। কেন না, পূয যা বাহির হয়, তা এত কম যে, তা টেরই পাওয়া যায় না। টের পাবে কি? রোগী তা প্রায় গিলিয়াই ফেলে। কখন কখন গুল্লিতে পূয না হইয়া, গলার বাইরে চামড়া মাংসর ভিতর পূয হয়। এ রকম ঘটনা কিন্তু খুবই কম ঘটে।

আল্টাকৃরার গুল্লি পচিয়া যাইবার কথা অনেকে বলেন বটে; কিন্তু তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না।

আল্টাকৃরার গুল্লির (টন্‌সিলের) প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুল্লির এ ভাব আর সারেও না, সারিতে চায়ও না। এ ছাড়া, গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, সামান্য একটু হিম বাত ভোগ করিলেই গুল্লির আবার নূতন করিয়া প্রদাহ হয়। এখানে গুল্লি যত ফোলে, তত রাঙা হয় না। গুল্লির উপরটা চট চটে আটা শ্লেষ্মা দিয়া ঢাকা থাকে। সহজ শরীরে আল্টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ এমন বারে বারেও হয় না; বারে বারে

প্রদাহ হইয়া গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়াও যায় না। ছেলেই হোক্, আর জোওয়ানই হোক্; যাদের ধাত (ধাতু) খুব খারাপ, আর যারা খুব রোগা আর দুর্ব্বল, তাদেরই এ দশা ঘটে। গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া যাওয়ার দূর কারণের কথা বলিবার সময়, এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। গুল্লি দুটী এত ডাগর হয় যে, আল্টাক্রার ভিতরটা যেন একবারে বুজিয়া যায়। কাজেই, রোগীর কথাও অস্পষ্ট হয়; কানেও সে কম শুনে, আর তার গিলিবারও কিছু কষ্ট হয়। এ ছাড়া, গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে, এমনি বোধ হয়। গুল্লি ডাগর হইয়া আল্টাক্রার ভিতরটা বুজিয়া যাইবার মত হইলে, রোগী কানে কম শুনে কেন? গলার নলির উপরকার থলির সঙ্গে আর কানের ভিতরকার পর্দ্দার সঙ্গে যে যোগ আছে। গলার নলির উপরকার থলিকে ডাক্তরেরা ফ্যারিংস বলেন; আর কানের ভিতরকার সে পর্দ্দাকে তাঁরা টিম্পেনম্ বলেন। সুবিধা পাই ত, এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। আল্টাক্রার গুল্লি দুটী ও রকম ডাগর হওয়ার দরুণ কখন কখন এমন ঘটে যে, রোগী পূরে দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে পারে না। রোগী প্রায়ই মুখ একটু খুলিয়া রাখে।

সিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় কেমন এক রকম শব্দ হয়। আর কথা কহিবার সময় তার গলার ভিতর থেকে যেন কেমন এক রকম ফোঁস ফোঁস, বা শিশ দেওয়ার মত শব্দ বাহির হয়। আল্‌টাক্‌রার গুল্লি দুটী এ রকম ডাগর হইলে, তাদের গা উব্‌ড়ো খাব্‌ড়ো আর খাঁচ-কাথা হয়। ঠাউরে দেখিলে, এই খাঁচ-কাথা জায়গার শাদা কি জর্দ্দা রঙের এক রকম রস দেখিতে পাওয়া যায়। আল্‌টাক্‌রার গুল্লির এ রকম অবস্থা হয়, জানা শুনা না থাকিলে, আল্‌টাকৃরার গুল্লিতে ঘা হইয়াছে বলিয়া সহজেই ভুল হইতে পারে।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন্‌সিলাইটিস্‌) সচরাচর পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকে না।

আল্‌টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ আপনিই সারিয়া যাইতে পারে। ভাগ্য ক্রমে সচরাচর এইটীই ঘটে। প্রদাহ খুব বাড়িয়া গুল্লি পাকিতে পারে—গুল্লিতে পূয হইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লিতে ঘা হইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যাইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লির আর যে যে অবস্থা হয়, এর আগেই তা বলিছি। গুল্লিতে ঘা হওয়ার কথা এর পরই বলিব।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা, (টন্‌সিলাইটিস)

আর কোন রোগের সঙ্গে গোলমাল হইয়া যাওয়া বড় একটা সম্ভব নয়! কেন না, রোগীকে হা করাইয়া বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিলে, আল্‌টাক্‌রার থলির প্রদাহ সহজেই ঠিক্ করিতে পারা যায়। আল্‌টাক্‌রার ভিতর ঠাউরে দেখিতে হইলে, রোগীর জিব চাপিয়া ধরিতে হয়। চামচের গোড়া দিয়া জিব বেশ চাপিয়া ধরা যায়। স্প্যাচুলা দিয়াও চাপিতে পারা যায়। অস্যুদ বিস্যুদ নাড়িবার জন্যে, আর মলম টলম তয়ের করিবার জন্যে, ডিস্পেন্সরিতে যে ছুরি থাকে, ডাক্তরেরা সে ছুরিকে স্প্যাচুলা বলেন। চামচ বা স্প্যাচুলার অভাবে বাঁশের চেয়াড়ি ব্যবহার করিতে পার। বাঁশের চেঁচাড়ি নয়—বাঁশের চেয়াড়ি। প্রতিমা গড়িবার সময় কর্ম্মিরা যে চেয়াড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে, এখানে সেই চেয়াড়িরই কথা বলিতেছি। চেয়াড়ি যখন তখন, যে সে তয়ের করিয়া লইতে পারে। তার পর বলি। স্কার্ল্যাটীনা আর ডিফ্‌থীরিয়া, এই দুটী রোগে আল্‌টাকৃরার গুল্লির প্রদাহ হয়। এখন কেমন করিয়া জানিবে, আণ্টাকৃরার গুল্লির এ প্রদাহ আসল রোগ, না স্কার্ল্যাটীনা বা ডিফ্‌থীরিয়া রোগের অঙ্গ? রোগীর ঠাঁই তার রোগের পরিচয় বেশ করিয়া লইলে, আর তার রোগের লক্ষণ গুলি বেশ

করিয়া ঠাউরে দেখিলে, তা জানিতে বাকী থাকে না। স্কার্ল্যাটীনা এক রকম ছোঁওয়াচে জ্বর। জ্বরে রোগীর গায়ে মিল্‌মিলের মত কতক গুল কি বাহির হইয়া সব গা এক বারে রাঙা হইয়া যায়। স্কার্ল্যাটীনাকে স্কার্লেট ফীবরও বলে। ডিফ্‌থিরীয়া টাক্‌রার এক রকম ছোঁওয়াচে রোগ। ডিফ্‌থিরীয়া ভারি ভয়ানক রোগ। এ রোগের হাতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। স্কার্ল্যাটীনা আর ডিফ্‌থীরিযার কথা এর পর বলিব। ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ রোগেও ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়। কিন্তু ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার চেয়ে, নিশ্বাস প্রশ্বাসেরই কষ্ট ঢের বেশী হয়। ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ ডাক্তরি কথা, ল্যারিঞ্জাইটিস্‌কে বাঙ্গালায় গলার চুঙির প্রদাহ বলে। গলার চুঙিকে স্বর-যন্ত্রও বলে। গলার স্বরের যন্ত্রই গলার চুঙি। ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ রোগেরও কথা এর পর বলিব।

কারণ——দূর কারণ আর নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা ২৯৯—৩০১র পাতে বলিছি। জোওয়ান বয়সেই এ রোগ বেশী হয়; এই জন্যে, জোওয়ান বয়স এ রোগের একটী দূর কারণ। রোগা দুর্ব্বল শরীরে এ রোগ বেশী হয়; এই জন্যে, রোগা দুর্ব্বল শরীর এ রোগের একটী দূর কারণ। গর্ম্মির ব্যামো হইলে এ রোগ

বেশী হয়; এই জন্যে, গর্ম্মির ব্যামো এ রোগের একটী দূর কারণ। গর্ম্মির ব্যামোকে ডাক্তরেরা সিফিলিস্ বলেন; ভাল কথায় উপদংশ বলে। সিফিলিস্কে শ্যাঙ্কার্ও বলে। এ রোগ যার এক বার হইয়াছে, তারই এ রোগ বেশী হয়; এই জন্যে, এ রোগ একবার হওয়া এর আর একটী দূর কারণ।

তার পর এখন এ রোগের নিকট কারণ বলি। হিম বাত ভোগ করা—বৃষ্টিতে ভেজা—ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা, এ রোগের নিকট কারণ। খুব শ্রম করার পর বিশ্রাম না করিয়া ঠাণ্ডা জল খাওয়া এ রোগের একটী নিকট কারণ। শুদু ঠাণ্ডা জল বলিয়া কেন? চুমুদ দিয়া খাইবার জিনিশ মাত্রেই।

এর আগেই বলিছি, আল্টাকরার গুল্লির (টন্সিলের) প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুল্লির এ ভাব আর সারেও না, সারিতে চায়ও না। গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া যাওয়ারও দূর কারণ আর নিকট কারণ আছে। গর্ম্মির ব্যামো হইলে গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে; এই জন্যে, গর্ম্মির ব্যামো গুল্লির এ অবস্থার একটী দূর কারণ। যাদের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু), তাদেরই গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে।

এই জন্যে, গণ্ডমালা ধাত (ধাতু), গুল্লির এ অবস্থার একটী দূর কারণ। গণ্ডমালা ধাত (ধাতু) কাকে বলে? গণ্ডমালা ধাত (ধাতু) কি রকম? ক্ষয়-কাশের ধাত (ধাতু) আর গণ্ডমালা ধাত এক—এখন মোটামুটি এইটী জানিয়া রাখ। যে ধাতে (ধাতুতে) ক্ষয়কাশ হয়, সেই ধাতকে (ধাতুকে) ক্ষয়কাশের ধাত (ধাতু) বলিতেছি। ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে কন্‌জম্‌শন্ বলে। ক্ষয়কাশের কথা আর ক্ষয়কাশের ধাতের (ধাতুর) কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। গাল গলা বেড়িয়া গুল্লি হওয়া গণ্ডমালা ধাতের (ধাতুর) একটী চিহ্ন। যাদের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু), তাদের গাল গলায় হাত দিয়া বেশ করিয়া টিপিয়া টিপিয়া দেখিলে, ছোট বড় সুপুরির মত গুল্লি হাতে মালুম হয়। গুল্লিগুলির ভাব সব সময় এক রকম থাকে না; কখনও ফোলে, কখনও তাতে ব্যথা হয়, কখনও পাকে, কখনও বা তাতে ঘা হয়। এ সব কথাও এর পর ভাল করিয়া বলিব। তার পর বলি। অনেক দিন থেকে যারা অপাক অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতেছে, তাদেরই আল্‌টাক্‌রার গুল্লির ও রকম অবস্থা (ডাগর আর শক্ত হইয়া যাওয়া) বেশী ঘটে; এই জন্যে, অনেক দিনের অপাক অজীর্ণ রোগ

গুল্লির ও রকম অবস্থার একটী দূর কারণ। গুল্লির ও রকম অবস্থার নিকট কারণ কেবল সেই একটী। সে নিকট কারণ আর কি? গুল্লির প্রদাহ। গুল্লির প্রদাহ বারে বারে হইলেই না গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ কথা এর আগেই বলিছি।

অনেক জায়গায় দেখা যায়, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন্‌সিলাইটিস্ রোগ) একবারে অনেক লোকের হয়। এক বাড়ীতে অনেকের একবারে এ রোগ হইতে দেখা যায়। এই সব দেখিয়া কেউ কেউ মনে করেন, এ রোগটী ছোঁওয়াচে। ফল কিন্তু তা নয়। এ রোগের সে দোষ নাই। তবে এ রোগের কারণ—হিম বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা—যে রকম সাধারণ, তাতে এক সময় অনেকের এ রোগ হওয়া একটুও আশ্চর্য্য নয়। এক বাড়ীতে এক সময় অনেকের এ রোগ হওয়া আরও সম্ভব। কেন না, এ রোগের কারণ ত সে রকম সাধারণ আছেই, তা ছাড়া, এক বাড়ীতে অনেকের ধাতও (ধাতুও) এক রকম মিলিয়া যায়। এক বাড়ীতে অনেকের যে এক রকম ধাত (ধাতু) হইতে পারে, আর হইয়াও থাকে তা বেশ বুঝাই যাইতেছে। এক বংশ, তা ধাত (ধাতু) এক রকম হবে না?

এ রোগে রোগীর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। এ রোগে রোগী প্রায়ই মারা যায় না। তবে প্রদাহ খুব ভয়ানক রকম হইলে, আর প্রদাহ বেশী ছড়াইয়া পড়িলে, রোগী মারা পড়ে। আল্‌টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহ খুব ভয়ানক রকম হইলে যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, এর আগেই তা বলিছি। আল্‌টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহ ছড়াইয়া গলার চুঙিতে গেলেই আর কি, সর্ব্বনাশ। নিশ্বাস লইতে না পারিয়াই রোগী মারা পড়ে। এই জন্যে, এ রোগে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের সামান্য একটু কষ্ট হইলেও ও আশঙ্কা করিবে; আর খুব সাবধান হইয়া সব বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিবে। আল্‌টাক্‌রার গুল্লি বেশী রকম ফুলিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের এক আধটু ব্যাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কিন্তু এ রকম হইতে পারে আর হইয়াও থাকে বলিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিবে না। খুব সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কখনও ভুলিবে না। গলার চুঙির প্রদাহ (ল্যারিঞ্জাইটিস্) কি ভয়ানক ব্যাপার, ল্যারিঞ্জাইটিস্ রোগের কথা বলিবার সময় তা বলিব।

এখন আল্‌টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহের (টন্‌সিলাই-টিস্ রোগের) চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা—ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলেই আমি রোগীকে পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিই। নিজেরও বেলায় আমি ঠিক্ এই রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকি। সব দিকেই সুবিধা বলিয়া কুইনাইনের বড়িই ব্যবস্থা করি। এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শনেরই সঙ্গে কুইনাইনের বড়ি তয়ের করা সব চেয়ে ভাল। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। এ রোগের গোড়ায় কুইনাইন্ খাইলে আর কিছুই করিতে হয় না—আর কোনও রকম চিকিৎসার দরকারই হয় না। ছেলেরা পর্য্যন্ত কুইনাইনের এ গুণটী ভুলিতে চায় না। ভুলিতে চায় না কেন, তা বলি—এখানে তার একটা গল্পও বলি। বছর তিনেক হইল এক দিন সন্ধ্যা বেলা বসিয়া আছি, আমার একটী মেয়ে (এখন তার রয়স এগার বছর) আসিয়া বলিল, "বাবা আমার গলায় ব্যথা হইয়াছে —ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা লাগে। আমি কিন্তু গলার ভিতর অসুদ লাগাইতে পারিব না—বড়ি খাব"। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আপনিই আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে এর আগে কাষ্টকির জল (কষ্টিক্ লোশন) তার আল্‌টাক্‌রায় দুঁ এক বার লাগান হইছিল। সে কষ্ট তার বেশ মনে

ছিল। শুদ্ধু বড়ি খাইলেই গলার ব্যথা সারিয়া যায় —গলার ভিতর অসুদ লাগাইতে হয় না; দু এক বার কুইনাইনের বড়ি খাওয়াইয়া তাকে তাও জানাইয়া দেওয়া হইছিল। এই জন্যে, এ বারে সে আপনিই বড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে, ছেলেদের জন্যে এখন আর আমাকে কোনও ব্যবস্থা করিতে হয় না। তারা আপনারাই কুইনাইনের বড়ি চাহিয়া খায়। বছর দুই হইল, এক দিন সকাল বেলা একটী ভদ্র লোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিইছিলাম। কথায় কথায় তিনি বলিলেন, আজ্ আমার গলায় ব্যথা হইয়াছে—ঢোক গিলিতে ব্যথা করিতেছে। এখন ত আফিসে যাই; তার পর দেখি, অসুখ যদি বাড়ে, তখন তার একটা উপায় করা যাবে। তাঁর এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, অসুখ বাড়ে কি না, দেখিবার জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না— অপেক্ষা করা উচিতও না। আপনি এখনই ৫গ্রেন্ কুইনান্ খান্, আর আজ, কাল, পরস্ব, তিন দিন স্নান করিবেন না; একটু গরমে থাকিবেন—আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। পাঁচ সাত দিন পরে ফের দেখা হইলে বলিলেন, কুইনাইন্ খাইয়া সত্য সত্যই আমাকে আর কিছুই করিতে

হয় নাই। কুইনাইন্ খাইলে গলার ব্যথা সারে, এ ত আমি কখনও শুনি নাই। আমি জানিতাম, গলায় কাষ্টকির জল (কষ্টিক্ লোশন্) লাগান ছাড়া, সোর্-থ্রোটের অসুদ আপনাদের আর নাই। তবে হোমীওপ্যাথির দু একটা অসুদে গলার ব্যথায় খুব চটক দেখায়। এখন দেখিতেছি, কুইনাইনের কাছে কেউ না। যাই হোক্, এ রোগের একটা খুব ভাল অসুদই জানা থাকিল। ৩২৪র পাতে—২০র ছত্রে "ছেলে দুটীর মাতামহ" বলিয়া যাঁর উল্লেখ করিছি, এখানেও তাঁরই কথা বলিলাম। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে কি রকম নিয়মে থাকিতে হয়—অসুদ বিসুদই বা তার কি করিতে হয়, এখন তাই বলি। অনেক জায়গায় কুইনাইন্ এক বার খাইলেই কাজ হয়—আর খাইতে হয় না, খাইবার দরকারও হয় না। আবার কোন কোন জায়গায়, কুইনাইন্ দু তিন বারও খাইতে হয়। ফল কথা, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বেশ সারিয়া না গেলে কুইনাইন্ খাওয়া বন্ধ করা উচিত নয়। কুইনাইনের বড়িই ভাল ; খাইতে কোন কষ্টই নাই। কুইনাইনের বড়ি দু বেলা দুটো খাওয়া ভাল। গলার ব্যথা দিনের বেলায় একটু কম থাকে; সন্ধ্যার আগে বাড়ে—রাত্রে বড় কষ্ট দেয়—এ অস্বস্তির

গতিকই এই। এই জন্যে, সকালে আর বৈকালে দু বেলা দুটো বড়ি খাইলে অসুখ সদ্যই সারিয়া যায়। আজ্ সকালে উঠিয়া ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা জানিতে পারিলে; জানিতে পারিয়াই পাঁচ গ্রেঁন্ কুইনাইন্ খাইলে; স্নান বন্ধ করিলে; কাপড় চোপড় গায়ে দিয়া সারা দিন খুব গরমে থাকিলে; বৈকালে ফের পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইলে; রাত্রে আহার না করিয়া একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া শুইয়া থাকিলে। পর দিন সকালে উঠিয়া গলার ব্যথা কমা বুঝিতে পারিলে না। ঢোক গিলিয়া দেখিলে, ব্যথা প্রায় তেমনিই আছে। এখন কি করিবে? কাল্ যে রকম নিয়মে ছিলে, আজ্ও কি ঠিক্ সেই রকম নিয়মে থাকিবে, না, আর কিছু নূতন রকম তদ্বির করিবে? নূতন রকম তদ্বির আর কি? কাল্ সকালে পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খইয়াছিলে, আজ্ও সকালে পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইবে। কাল্ স্নান কর নাই, আজও স্নান করিবে না। কাপড় চোপড় গায়ে দিয়া কাল্ যে রকম গরমে ছিলে, আজ্ও সেই রকম গরমে থাকিবে। কাল্ দিনমানে আহার করিছিলে, আজ্ দিনমানে আহার করিবে না, একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাবে। আর গরম দুধ আর গরম জল সমান ভাগে মিশাইয়া, সারা দিনই

তার কুলি করিবে। সচরাচর যে রকম করিয়া কুলি করিতে হয়, এখানে সে রকম করিয়া কুলি করিলে হবে না। এখানে কুলি একটু আলাদা রকম করিয়া করা চাই। গরম জল মিশন গরম দুধ মুখে লইয়া, মুখ খুব উচু করিয়া, সেই দুধ জিবের গোড়ার দিকে, আল্‌টাকৃরার ব্যথার জায়গায় লইয়া আসিবে। তার পর কাশ বা শ্লেষ্মা তুলিবার সময় গলার ভিতর যে রকম শব্দ করিতে হয়, ইচ্ছা করিয়া খুব সহজে —খুব আস্তে সেই রকম শব্দ নিয়ত করিতে থাকিবে; তা হইলে সেই দুধ যেন গড়্‌-বড়্ করিয়া ফুটিবার মত হইয়া সব আল্‌টাকৃরায় লাগিতে থাকিবে। এ রকম করিয়া কুলি করাকে "গলায় কুলি করা" বলিতে পার। আর সচরাচর যে রকম করিয়া কুলি করে, তাকে "গালে কুলি করা" বলিতে পার। গালের ভিতরকার দুধ জুড়াইয়া গেলে, সে দুধ ফেলিয়া দিয়া আর খানিক গরম দুধ মুখের মধ্যে লইবে, আর সেই রকম করিয়া গলায় কুলি করিবে। নিয়ত এই রকম করিতে থাকিবে—সারা দিনই এই রকম করিবে। এ রকম করিয়া কুলি করিতে বিরক্ত হইবে না—বিরক্ত হইলে চলিবে না। গরম দুধের কুলি ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার বড় অসুদ্। আজ্ আহার কর নাই, বৈকালে আর খানিক

গরম দুধ চুমুক দিয়া খাবে। কাল্ সন্ধ্যার আগে পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াছিলে, আজ্‌ও সন্ধ্যার আগে পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাবে। কাল্ রাত্রে শুদু একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া শুই-ছিলে, আজও রাত্রে শুদু একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া শোবে। শুইবার আগে গরম দুধের কুলি অনেক বার করিবে। এই রকম নিয়মে থাকিলে, আর এই রকম তদ্বির করিলে ১০০র মধ্যে ৯৯ জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সারিয়া যায়। এখানে সোজা-সুজি রকম অস্বস্তিরই কথা বলিতেছি। দু দিনেই অসুখ সারিয়া গেল বলিয়া, দিন কতক খুব সাবধানে থাকিতে কখনও ভুলিবে না। বিশেষ, এ অস্বস্তি একবার হইলে ছুতোয় নতায় ফের হয়—এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ অস্বস্তির দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা বলিবার সময় যা যা বলিছি, তা যদি মনে করিয়া রাখ, তবে কি রকম সাবধানে চলিতে হবে, কারো কাছে তা তোমাকে সুধাইতে হবে না।

হুঁকোয় নল লাগাইয়া যেমন করিয়া তামাক খায়, ফুটন্ত গরম জলের ভাব সেই রকম করিয়া টানিয়া আল্‌টাক্‌রার ব্যথার জায়গায় তার সেক লাগাইলে যেমন আরাম বোধ হয়, তেমনি উপকার

হয়। ঐ রকম করিয়া গরম জলের ভাবের সেক লাগাইলে তখনই তখনই উপকার হয়। গলার ব্যথার জন্যে আগে যে ভারি কষ্টে ঢোক গিলিতেছিল, ফুটন্ত গরম জলের ভাব ঐ রকম করিয়া চারি পাঁচবার টানিলে, সে ঢের সহজে ঢোক গিলিতে পারে। গরম জলের ভাবের এমনি গুণ! এতে ব্যথা এত শীঘ্র নরম পড়ে! ঐ রকম করিয়া গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবার সময় তোমার বোধ হবে, গলার ব্যথা যেন সারিয়া গিয়াছে। সেক বন্ধ করিলে খানিক পরে যে ব্যথা, সেই ব্যথাই জানিতে পারা যায়। তাতেই বলি, অনেক ক্ষণ ধরিয়া সেক লাগাইলে, আর বারে বারে সেক লাগাইলে গলার ব্যথা সদ্যই নরম পড়ে—আর দু দিনেই সারিয়া যায়। গরম দুধের কুলির চেয়েও এতে বেশী উপকার হয়। এই জন্যে, গরম দুধের কুলিতে তেমন উপকার না হইলে, ঐ রকম করিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবে। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেকে যদি বেশী উপকার হয়, তবে আগে গরম দুধের কুলি করিয়া দেখিবার দরকার কি? ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক ত আগেই দিলে হয়। তা না হয়, এমন নয়। তবে সহজ উপায়টাই আগে করিয়া দেখিতে হয়। গরম

দুধের কুলি করিবার জন্যে কোন রকম উদ্যোগ আয়োজনের দরকার নাই। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন এক আধটু চাই। কেট্‌লিতে করিয়া জল ফুটাও। তার পর, ফুটন্ত গরম জলের সেই কেট্‌লির নলের মুখে যে সে একটা নল জুত বরাত করিয়া লাগাও। তার পর, সেই নলে মুখ দিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাব এমনি জুত বরাত করিয়া টান যে, সেই ভাব যেন আল্‌টাক্‌রার ব্যথার জায়গায় ঠিক্‌ লাগে। কেট্‌লিটে গন্‌-গনে আগুনের উপর বসান থাকিলে গরম জলের ভাবের সেক অনেক ক্ষণ ধরিয়া লাগাইতে পারা যায়। কেট্‌লির নলের মুখে যে সে একটা নল যে জুত বরাত করিয়া লাগাইতে বলিলাম —কিসের নল লাগাইবে? পেঁপের নল লাগাইতে পার—তল্‌দা বাঁশের নল লাগাইতে পার—হরেক রকম পাতার নল তয়ের করিয়া লাগাইতে পার—মোটা কাগজেরও নল তয়ের করিয়া লাগাইতে পার। পাড়াগাঁয়ে হুঁকোয় যাঁরা বড় বড় নল লাগাইয়া তামাক খাইতে ভাল বাসেন; কোন্‌ পাতার ভাল নল হয়, তাঁরা তা বেশই জানেন। কেটলির অভাবে হাঁড়িতে করিয়া জল গরম করিবে। জল সিদ্ধ করিবার সময়, হাঁড়ির মুখ শরা দিয়া

ঢাকিয়া দিবে। হাঁড়ির মুখ ঢাকা থাকিলে ভাব বাহির হইয়া যাইতে পারে না; জল খুব শীঘ্র গরম হয়। জল গরম করিবার আগে শরার এক পাশে একটা ছাঁদা করিয়া লইবে। ছাঁদাটী এমন ভাবে করিবে যে, তাতে যেন জুত বরাত করিয়া নল লাগাইতে পারা যায়। তার পর, ছাঁদাটীতে ন্যাক্ড়ার বুজ্‌লো দিয়া শরা খানি উপুড় করিয়া হাঁড়ির মুখে দিবে। জল ফুটিয়া উঠিলে, হাঁড়ি নামাইয়া একটা উচু জায়গায় জুত বরাত করিয়া বসাইবে। তার পর, ন্যাক্ড়ার বুজ্‌লো খুলিয়া শরার ছাঁদায় নল লাগাইয়া গরম জলের ভাব ঐ রকম করিয়া টানিবে।

মুখের মধ্যে খয়ের রাখা আর সেই খয়েরের ঢোক গেলা, এ অস্বস্তির আর একটী ভাল অসুদ। আর আর রকম খয়েরের চেয়ে পাঁপ্ড়ি খয়েরই রাখা ভাল। খয়ের মুখের মধ্যে সর্ব্বদাই রাখা চাই। মুখের লালে খয়ের গুলিবে, আর তুমি তার ঢোক গিলিবে। খয়ের ফুরাইয়া গেলে মুখের মধ্যে আবার খয়ের লইবে। রাত্রে যখন শোবে, একটু খয়ের মুখে করিয়া শোবে। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সোজাসুজি রকমের হইলে, শুদু এই মুষ্টি-যোগেই সারিয়া যায়—আর কিছু অসুদ বিসুদ

করিতে হয় না। ঠুকো ঠাকা অস্থুদকে ভাল কথায় মুষ্টিযোগ বলে।

নিয়ত বরফ চুষিয়া খাওয়া, এ অস্বস্তির আর একটী খুব ভাল মুষ্টিযোগ। জাঁতি দিয়া বরফ টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া কাটিয়া একটা পাত্রে করিয়া রাখ। তার পর, বরফের সেই টুক্‌রো এক এক খানি করিয়া মুখে দেও আর নিয়ত চুষিতে থাক। বরফের টুক্‌রো ফুরাইয়া গেলে জাঁতি দিয়া আবার সেই রকম করিয়া কাটিয়া লইবে। ফল কথা, বরফ চোষা যেন কামাই না যায়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বেশ সারিয়া না গেলে আর বরফ চোষা বন্ধ করিবে না। বরফের টুক্‌রো ঐ রকম করিয়া চুষিয়া, বরফ-গলা ঠাণ্ডা জল টুকু গিলিবার সময় কি আরামই বোধ হয়—কি স্বস্তিই বোধ হয়! এ অস্বস্তিতে যিনি বরফের টুক্‌রো চুষিয়া খাইয়া দেখিয়াছেন, সে আরামের কথা—সে স্বস্তির কথা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। বরফ-গলা ঠাণ্ডা জল টুকু গিলিবার সময় বোধ হয়, গলার ব্যথা শূলো যন্ত্রণা সব যেন ধুয়ে নামাইয়া দিল। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যাথার যেমন অস্থুদ বরফ চোষা, তেমন অস্থুদ আর আর নাই বলিলেও হয়। এ অস্বস্তিতে গলার ভিতর শ্লেষ্মা জমে বলিয়াই, রোগীকে অত কষ্ট করিয়া

নিয়ত গলা-খাঁকা দিতে হয়, আর ঢোক গিলিতে হয়। ঐ রকম করিয়া নিয়ত বরফ চুষিয়া খাইলে, গলার ভিতর শ্লেষ্মা আর জমিতে পায় না—শ্লেষ্মা জমা বারণ হয়। তবেই দেখ, বরফ চুষিয়া খাওয়ায় কত উপকার! গলার ব্যথা খুব বেশী রকম হইলেও এ মুষ্টিযোগে বিশেষ উপকার হয়। মুষ্টিযোগ বলিলে কি বুঝায়, এর আগেই তা বলিছি।

পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়া যায় না। কাজেই, বরফের এমন গুণ আছে জানিয়াও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা কিছুই করিতে পারেন না। কি বলিব যে, বরফ এখানে পাওয়া যায় না! নৈলে, তোমার গলার ব্যথা সদ্যই ভাল করিয়া দিতে পারিতাম! এ অস্বস্তির চিকিৎসায় রোগীর কাছে তাঁদের কেবল এই রকম করিয়া আক্ষেপ করিতে হয়। তবে, আজ্ কাল্ কলের বরফ হইয়া বরফ খুব শস্তা হইয়াছে। বরফ অনেক জায়গায় পাওয়াও যায়। আগে মার্কিন্ দেশ থেকে জাহাজে করিয়া বরফ কলিকাতায় আসিত। কাজেই, কলিকাতা ছাড়া আর কোনও জায়গায় বরফ পাওয়া যাইত না। এখন বরফ কলে তয়ের হইতেছে। পাড়াগাঁয়েও অনেক বড় মানুষে বরফ তয়েরি করার কল লইয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া, রেলের গাড়ির প্রসাদে কলিকাতার সঙ্গে আজ্ কাল্

অনেক জায়গার খুব নিকট সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যে, পাড়াগাঁয়ে পয়সা-ওয়ালা লোকে মনে করিলে ডাক্তর মহাশয়দের ও রকম আক্ষেপ সহজেই ঘুচাইয়া দিতে পারেন। বরফের শেষ কথা— বরফ নৈলে যে এ অস্বস্তির চিকিৎসা হয় না, তা যেন কেউ মনে করেন না; তবে বরফ মিলাইতে পারিলে রোগীর বড়ই সুবিধা হয়।

কাষ্টকি এ রোগের আর একটী খুব ভাল অসুদ। তুলি করিয়া কাষ্টকির জল আণ্টাকৃরার গুল্লিতে আর তার চারি পাশে লাগাইয়া দিলে, অনেক জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সদ্য ভাল হয়। অনেক জায়গায় কাষ্টকির জল এক বারের বেশী লাগাইতে হয় না। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা একটু বেশী রকম হইলে, কাষ্টকির জলও বেশী বার লাগাইতে হয়। ফল কথা, গলার ব্যথা নির্দ্দোষ সারিয়া না গেলে কাষ্টকির জল লাগান বন্ধ করা হবে না। এর আগেই বলিছি, এ অস্বস্তি দিনের বেলায় একটু কম থাকে—সন্ধ্যার আগে বাড়ে— রাত্রে বড়ই কষ্ট দেয়। এই জন্যে, গলার ব্যথা একটু বেশী রকম হইলে, কাষ্টকির জল সকালে বিকালে, দু বার লাগাইবে। তুলি করিয়া কাষ্টকির জল আণ্টাকৃরায় লাগাইবার সময় রোগীর বড় কষ্ট

হয়। কাষ্টকির জল লাগান হইয়া গেলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট থাকে। কষ্ট আর কিছুই নয়; মুখের ভিতর, আল্টাকৃরায়, গলায়, কেমন এক রকম কলঙ্কা কলঙ্কা স্বাদ পাওয়া যায়, আর লাল কাটিতে থাকে—শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে। এ ছাড়া, আল্টাকৃরায় কাষ্টকির জল লাগাইবার জন্যে যে উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়, তাতেও রোগীর মন্দ কষ্ট হয় না। চামচের গোড়া দিয়াই হোক্, স্প্যাচুলা দিয়াই হোক্, আর চেয়াড়ি দিয়াই হোক্, জিবের গোড়া পর্য্যন্ত বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তবে কাষ্টকির জল লাগাইতে হয়। জিবের গোড়া পর্য্যন্ত ঐ রকম করিয়া চাপিয়া ধরিবার সময় রোগীর ওয়াক্ আসে—আল্টাকৃরায় তুলি করিয়া কাষ্টকির জল লাগাইবার সময় তার আরও ওয়াক্ উঠে। এই রকম করিয়া ওয়াক আসে আর ওয়াক্ উঠে বলিয়াই, রোগীর আল্টাকরার সব জায়গায় কাষ্টকির জল বেশ করিয়া লাগাইবার বড়ই সুবিধা হয়; আল্টাকৃরার ভিতরকার সব বেশ করিয়া দেখিবারও খুব সুবিধা হয়। এই রকম কষ্ট হয় বলিয়া, রোগিরা আল্টাকৃরায় কাষ্টকির জল লাগা-ইতে সহজে স্বীকার হয় না। কষ্টই হোক্, আর যাই হোক্, তুলি করিয়া কাষ্টকির জল আল্টাক্-

রার গুল্লিতে আর তার চারি পাশে লাগান, এ অস্বস্তির যেমন তেমন অসুদ নয়—একটী খুব ভাল অসুদ; এ কথাটা যেন মনে থাকে। কাষ্টকির জলের এমনি গুণ যে, আণ্টাকৃরার গুল্লিতে একবার ভাল রকম করিয়া লাগাইতে পারিলে, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা নরম পড়িতে চায়ই। কাষ্টকির জল লাগাইলে আণ্টাক্‌রার সব জায়গা যেন কষিয়া ধরে। সেই কষিয়া ধরাতেই কাজ হয়। সেখানে আর তেমন রক্ত জমিয়া থাকিতে পারে না—শ্লেষ্মাও আর তেমন জমিতে পারে না। কাজেই, আণ্টাকৃরার গুল্লির ব্যথা আর ফুলো কমিয়া যায়। শ্লেষ্মা আর তেমন জমিতে পারে না বলিয়া, রোগীকে অত কষ্ট করিয়া নিয়ত গলা-খাঁকাও দিতে হয় না—নিয়ত ঢোক গিলিতেও হয় না। তবেই দেখ, কাষ্টকির জল একবার লাগাইলেও কত উপকার হয়! যে রোগের যে অসুদই হোক্, অসুদ যতই ভাল হোক্, রোগের গোড়ায়—রোগ শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার আগে, সে অসুদ ব্যবহার না করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না—শীঘ্র ফল পাইবার কথাও নয়। অন্য অন্য অসুদের বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে, কাষ্টকির জলের বেলায় তার চেয়ে হাজার গুণ খাটে—হাজার গুণেরও বেশী খাটে। কেন, তা

বলি। ৯০৪—৯০৫র পাতে বলিছি, আণ্টাক্‌রার গুল্লির (টন্‌সিলের) প্রদাহ যদি খুব বেশী রকম হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া জিবের গোড়া পর্য্যন্ত যায়, তবে রোগী বেশ হা করিতে পারে না। কাজেই, তার আণ্টাকরার ভিতরকার অবস্থা দেখা মস্কিল্ হইয়া পড়ে। এ রকম ঘটিলে, আণ্টাকরায় কাষ্ট-কির জল লাগাইবার কথা ত ছাড়িয়াই দিতে হয়। রোগী হা করিতে না পারিলে তার আণ্টাক্‌রার ভিতরকার অবস্থাই বা কেমন করিয়া দেখিবে? তুলি করিয়া কাষ্টকির জলই বা কেমন করিয়া লাগাইবে? তাতেই বলিতেছি, এ রোগ শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার আগে কাষ্টকির জল না লাগাইলে শীঘ্র ফলত পাওয়া যায়ই না—আণ্টাক্‌রায় কাষ্টকির জল লাগানই মস্কিল হইয়া পড়ে। কাষ্টকির জলকে ডাক্তরেরা কষ্টিক্ লোশন্ বলেন। প্রেস্ক্রিপ্‌শনে কাষ্টকি লেখে না—নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌বর্ লেখে। ব্রাণ্ডির ডাক্তরি কথা যেমন বাইনম্ গ্যালিসাই, কাষ্টকির ডাক্তরি কথা তেমনি নাইট্রেট অব্ সিল্-বর। কাষ্টকির জল যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

নাইট্রেট অব্ সিল্‌বর্ (কাষ্টকি)	...	৩০ গ্রেন্
ডিষ্টিল্‌ড্ ওয়াটর (চোঁওয়ান জল)	...	৪ ড্রাম্

নীল কি সবুজ কাগজে মোড়া একটা শিশিতে ৪ ড্রাম্ ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটর (চোওয়ান জল) ঢালিয়া দেও; তার পর ৩০ গ্রেন্ (আধ ড্রাম্) কাষ্টকি ওজন করিয়া শিশির জলে ফেল। কাক্ আঁটিয়া শিশিটে বার কতক নাড়িলেই কাষ্টকি গুলিয়া যায়। কাষ্টকি যে সে জলে গোলে না। ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটর (চোওয়ান জল), বৃষ্টির জল, আর গোলাপ-জল ছাড়া আর কোনও জলে কাষ্টকি গোলে না। আর কোনও জলে কাষ্টকি ফেলিয়া দিবা মাত্রই সব জল একবারে শাদা হইয়া যায়। কাষ্টকির জল (কষ্টিক্ লোশন্) তয়ের করিবার সময়, কি ব্যবস্থা করিবার সময়, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ ছাড়া, আলো লাগিলে কাষ্টকির জল খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে, নীল কি সবুজ কাগজ দিয়া শিশি বেশ করিয়া মুড়িয়া, তবে তাতে ঐ রকম করিয়া কাষ্টকির জল তয়ের করিবে। আলোতে কাষ্টকিও ভাল থাকে না। এই জন্যে, কাল কাগজে কাষ্টকির বাতি মোড়া থাকে। কাষ্টকির জল তয়ের করিবার সময়, কি ব্যবস্থা করিবার সময়, এ কথাটাও যেন মনে থাকে। ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটর (চোওয়ান জল) ডিস্পেন্সারিতে কিনিতে পাওয়া যায়। এ জলের দাম বেশী নয়—চারি গণ্ডা পয়সায় এক

বোতল জল পাওয়া যায়। আণ্টাক্রায় কাষ্টকির জল লাগাইবার জন্যে ফি বারে নূতন তুলি ব্যবহার করিবে। যে তুলি একবার ব্যবহার করিয়াছ, কাষ্টকির জলে সে তুলি ডুবাইলে কাষ্টকির জলটি তখনই খারাপ হইয়া যায়—শাদা হইয়া যায়; সে জলে আর তেমন গুণ করে না। এ ছাড়া, একবার যে তুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, সে তুলি নোংরা হইয়া যাওয়ার ত কথাই নাই।

এ অস্বস্তির আর একটী অসুদ আছে। সে অসুদটী খুব ভাল। সে অসুদটীর কথা এখনও বলি নাই। জ্বর না থাকিলে রোগীকে সে অসুদ দেয় না—সে অসুদ দেওয়া ব্যবস্থা নয়। সে অসুদ আর কি? য়্যাকোনাইট। কাঠবিষকে ইংরিজিতে য়্যাকোনাইট বলে। ১২৩র পাতে এ কথা বলিছি। জ্বর না থাকিলে রোগীকে যখন এ অসুদ দেওয়া নিষেধ, তখন এ অসুদ ব্যবহার করিবার আগে তাপ-মান-যন্ত্রের (থর্ম্মমিটরের) যে ভারি দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে। রোগীর বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া জ্বর ঠিক্ করিয়া তবে য়্যাকোনাইট্ দিবে। দু ঔন্স (এক ছটাক) ঠাণ্ডা জলে ৮ ফোটা টিংচর য়্যাকো-নাইট দিয়া, চা চামচের এক চামচ (ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক—এক ড্রাম্) করিয়া সেই জল ১৫

মিনিট অন্তর উপ্রো-উপ্রি ৮ বার খাওয়াইবে; তার পর ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে। অসুদ ফুরাইয়া গেলে, আবার ঐ রকম করিয়া তয়ের করিয়া লইবে। রোগীকে যদি ভারি কাবু দেখ, আর তার নাড়ী খুব দুর্ব্বল বোধ হয়, তবে টিংচর য়্যাকোনাইট্ আরও কম মাত্রায় দিবে। এক এক মাত্রায় এক ফোটার ৬ ভাগের এক ভাগের বেশী দিবে না। যদি বল, এক ফোটাকে আবার কেমন করিয়া ৬ ভাগ করিব? দু ঔন্স (১৬ ড্রাম্) জলে ৮ ফোটা মিশাইয়া, এক ড্রাম্ করিয়া সেই জল এক এক বারে খাইতে দিয়া, এক ফোটাকে যখন দু ভাগ করিতে পারিয়াছ, তখন এক ফোটাকে ৬ ভাগ করা আর শক্তটা কি? তিন ঔন্স (২৪ ড্রাম্) জলে ৪ ফোটা মিশাইয়া, এক ড্রাম্ করিয়া সেই জল এক এক বারে খাইতে দিলে, ফি বারে এক ফোটার ৬ ভাগের এক ভাগ খাওয়ান হয়। টিংচর য়্যাকোনাইট্ এই নিয়মে খাওয়াইলে, রোগীর তেমন শুক্ন খশ্-খশে্ গরম গা ঘামে বেশ ভিজে-ভিজে আর নরম হয়। তার পর ঘাম এত হয় যে, গা দিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকে। ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ীর বেগ কমিয়া যায়; আর দু এক দিনের মধ্যেই নাড়ী ও গায়ের তাত সহজ হয়।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার সূত্রপাতেই যদি

টিংচর য়্যাকোনাইট ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে পার, তবে রোগীকে ভাল করিতে তোমার দু দিনও লাগে না—অনেক জায়গায় সদ্যই ভাল করিতে পার। জ্বর না থাকিলে য়্যাকোনাইট দেয় না—দিলে কোনও ফল হয় না—এ কথাটা যেন মনে থাকে। টিংচর য়্যাকোনাইট খাইয়া এ দিকে রোগীর গায়ের তাত আর নাড়ী যেমন সহজ হইয়া আসে, ও দিকে তার আল্টাক্‌বার গুল্লির (টন্সিলের) অবস্থাও তেমনি ফিরিয়া যায়। আল্টাক্‌রার গুল্লি আর তেমন ডাগর, রাঙা, চক্‌চকে, আর শুক্ন থাকে না; গুল্লির ফুলো আর রাঙা প্রায় থাকে না; গুল্লি দুটী বেশ ভিজে-ভিজে হয়; যে গুল্লি একবারে চক্‌চকে শুক্ন ছিল, সেই গুল্লি শ্লেষ্মায় ঢাকিয়া যায় —কখন পূযেও ঢাকিয়া যায়। শ্লেষ্মাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ বলেন—এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। গুল্লি দুটী শ্লেষ্মায় কি পূযে ঢাকিয়া গিয়াছে দেখিয়াই যদি তাতে কাষ্টকির জল ঐ রকম করিয়া লাইয়া দেও, তবে ব্যামোর কসুর এক আধটু যা থাকে, তা মিটিয়া যায়। এখানে ব্যামো আর কি, প্রদাহ। টিংচর য়্যাকোনাইট খাইয়া, গুল্লির ফুলো, রাঙা, ব্যথা, যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাকেই এখানে ব্যামোর কসুর বলিতেছি।

এখানে আমার একটী রোগীর কথা বলি।

বছর পাঁচ ছয় হইল একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম। রোগী নয় রোগিণী—মেয়ে মানুষ। রোগিণীর বয়স ত্রিশ বছরের বেশী নয়। শর্দ্দি লাগিয়া ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (সোর্-থ্রোট—টন্সিলাইটিস্) হয়। এর আগেই বলিছি "ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা" রোগটী এমনি সাধারণ যে, এর জন্যে কোনও অসুদ বিসুদ করা বা কোনও তদ্বির করা লোকে দরকারই মনে করে না। এই জন্যে, এ রোগ একটু শক্ত হইয়া না দাঁড়াইলে আর ডাক্তর বৈদ্যের খোঁজ হয় না। এখানেও ঠিক্ তাই ঘটিছিল। বাড়ীর লোক যখন দেখিলেন যে, রোগিণীর আহার বন্ধ হইল—কথা বন্ধ হইল, তখন তাঁরা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। আমার আগে তাঁরা আর কোনও ডাক্তর ডাকিয়াছিলেন কি না, জানি না। আমি গিয়া দেখিলাম, রোগিণীর গাল গলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া গিয়াছে। গায়ের বেশ তাত; তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলে বোধ হয় পারা ১০২র দাগ ছাড়াইয়া উঠিত। অনেক কষ্টে দুটী আঙুল তার মুখের মধ্যে দিতে পারিলাম। এ অবস্থায় তার আল্টাক্রায় তুলি করিয়া কাষ্টকির জল লাগান সম্ভবই নয় মনে করিয়া, টিংচর য়্যাকোনাইট

ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম। রোগীণীকে তেমন কাবু আর তার নাড়ী তত দুর্ব্বল দেখিলাম না বলিয়া, এক এক মাত্রায় আধ ফোটা করিয়া টিংচর য়্যাকোনাইট দিলাম। এ ছাড়া, বরফের টুক্‌রো জুত বরাত করিয়া চুষাইতে বলিলাম। (রোগিণীর বাড়ী কলিকাতায়; কাজেই বরফ ব্যবস্থা করিবার কোন আপত্তিই ছিল না)। জাঁতি দিয়া বরফ খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া একটা পাত্রে রাখিবে। তার পর এক এক খানি সেই টুক্‌রো বরফ আঙুল দিয়া জুত বরাত করিয়া তার জিবের উপর চালাইয়া দিবে। বরফের টুক্‌রো চুষিতে, আর বরফ-গলা হিম জল টুকু গিলিতে প্রথম প্রথম তার যত কষ্ট হবে, পাঁচ সাত বারের পর আর তত কষ্ট হবে না। মাঝে মাঝে একটু একটু গরম গরম দুধ খাওয়াইবে। এই বলিয়া আমি বিদায় হইলাম। তার পর দিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগিণীর অবস্থা অনেক ভাল; ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ঢের কম; গায়ের তাতও অনেক কম। যার মুখের মধ্যে দুটী আঙুলও সহজে দিতে পারা যাইতেছিল না, সে অল্প হা করিতে পারিল। বাইরের ফুলোও অনেক কম দেখিলাম। কাল্‌ সন্ধ্যার আগে অসুদ বিসুদের ব্যবস্থা করিয়া গিইছি; আজ্‌ বেলা ৮

টার সময় আসিয়া রোগিণীকে যখন এত ভাল দেখি-তেছি, তখন কাল্ বেলা ৮টা পর্য্যন্ত সেই নিয়মে অসুদ খাওয়াইলে আর সেই রকম করিয়া বরফ চুষাইলে ব্যামো নিশ্চয়ই দশ আনা ছ আনা তফাত পড়িবে। পূর ছ আনা কসুর থাকে কি না, তাও সন্দেহ। এই বলিয়া অসুদ বিসুদের ব্যবস্থা ঠিক্ সেই রকম রাখিয়া আমি চলিয়া গেলাম। তার পর দিন সকালে একবারে কাষ্টকির জল তয়ের করিয়া লইয়া গেলাম। যা ভাবিয়া গেলাম, গিয়াও তাই দেখিলাম। রোগিণী হা করিতে পারিল। তাকে হা করাইয়া, চামচের গোড়া দিয়া জিব চাপিয়া ধরিয়া তার আল্টাক্রার গুল্লিতে আর তার চারি পাশে কাষ্টকির জল বেশ করিয়া লাগাইয়া দিলাম। বাই-রের ফুলো বড় একটা মালুম করিতে পারিলাম না। গায়ের তাত আর নাড়ী প্রায় সহজ দেখিলাম। উপ্রো উপ্রি তিন চারি দিন সকালে আর বিকালে রোগিণীর আল্টাক্রায় কাষ্টকির জল (কষ্টিক্ লোশন্) ঐ রকম করিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। টিংচর য়্যাকোনাইট্ ঘণ্টায় ঘণ্টায় না দিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর দিবে। বরফের টুক্রো তেমনি করিয়া চুষিয়া খাইতে বলিবে। রোজ সকালে পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে। উপ্রো উপ্রি

আট দিন কুইনাইন্ দিবে। ব্যামোটী নির্দ্দোষ সারিয়া না গেলে অন্ন পথ্য দিবে না। হিম বাত ভোগ একবারে নিষেধ করিয়া দিবে। এক মাসের এ দিকে স্নান করিতে দিবে না। রোগিণীর আত্মীয় স্বজনকে এই সব কথা বলিয়া আমি বিদায় হইলাম।

৯০৯র পাতে বলিছি, আল্টাক্রার গুল্লির (টন্‌সিলের) প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুল্লির এ ভাব আর সারেও না, সারিতে চায়ও না। গণ্ডমালা ধাতেই গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে। গর্ম্মির ব্যামো হইলেও গুল্লির এ রকম অবস্থা হয়। বছর দশেক হইল এক জন ভদ্র লোক একটী ছেলে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে আসিয়াছিলেন। ছেলেটীর বয়স ১২। ১৩ বছরের বেশী নয়। তার শরীরে বিশেষ কোন রোগ আছে, বাইরে থেকে তার কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না। তবে তার শরীর দেখিয়া তার গণ্ডমালা ধাতের (ধাতুর) পরিচয় পাইলাম। তার অসুখ কি, জিজ্ঞাসা করিলে তার বাপ উত্তর করিলেন, অসুখ ছোট খাটো নয়। চুমুক দিয়া কিছু খাইবার জো নাই; খাইলে নাক দিয়া বাহির হইয়া আসে। যে জিনিষই হোক্,

গিলিতে খুব কষ্ট হয়। যখন ঘুমোয়, তখন নিশ্বাস ভারি জোরে পড়ে, আর নিশ্বাসের কেমন এক রকম বিশ্রী শব্দ হয়। এ ছাড়া, ঘুমুতে ঘুমুতে মাঝে মাঝে যেন একবারে হাঁপাইয়া উঠে। কথা কহিলে বোধ হয়, ওর গলার ভিতর যেন কিছু আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। গলার স্বরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। শুনিতেও খুব কম পায়। অনেক ডাক্তর দেখাইয়াছি; অসুদ বিসুদও অনেক করিছি। কিন্তু রোগের কিছুই হয় নাই; রোগ যেমন তেমনিই আছে। ডাক্তর মহাশয়রা দেখিয়া বলিয়াছেন, এর গলার ভিতরকার মাংস বাড়িয়াছে। সে মাংস কাটিয়া দিতে হবে; সে মাংস কাটিয়া না ফেলিলে আর উপায় নাই। বাপের মুখে ছেলের রোগের এই রকম পরিচয় পাইয়া রোগীর আল্‌টাক্‌রা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম আল্‌টাক্‌রার গুল্লি দুটী এত ডাগর হইয়াছে যে, তাতেই গলার ছাঁদা প্রায় বুজিয়া গিয়াছে; গুল্লি দুটী একবারে গায়ে গায়ে লাগিয়াছে। আপনি অনেক ডাক্তর দেখাইয়াছেন; অসুদ বিসুদও অনেক করিয়াছেন। আমি আজ্ এক খানি ব্যবস্থা লিখিয়া দিই। এই ব্যবস্থা মতে কাজ করিয়া পোনর দিনের মধ্যে যদি কোনও উপকার না দেখেন, তবে কাটা-কোটাই স্থির করি-

বেন। ছেলের বাপকে এই কথা বলিয়া আমি অসুদের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলাম।

অসুদের ব্যবস্থা। আন্টাক্রার গুল্লিতে লাগাইবার অসুদ।

আয়োডাইড্ অব্ য়্যামোনিয়ম্	...	৩০ গ্রেন্
গ্লিসেরীন	... ...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

বড় একটা তুলি করিয়া রোজ রাত্রে এই অসুদ আন্টাক্রার গুল্লি দুটীতে লাগাইয়া দিবে।

খাবার অসুদ।

আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম	...	২০ গ্রেন
লাইকর পেটাসি	... ...	১ ড্রাম্
কডলিবর অইল	... ...	৩ ড্রাম
টিংচর সিংকোনি কো	...	৩ ড্রাম
টিংচর কার্ডেমম কো	... ...	৩ ড্রাম
ক্লবেট অব্ পটাশ	... ...	১ ড্রাম্
ডিককশন্ সিংকোনা	... ...	৬ ঔন্স পূরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। রোজ ৩ বেলা ৩ দাগ খাবে। শিশি থেকে অসুদ ঢালিবার আগে, শিশি খুব করিয়া নাড়িয়া লইবে।

এ অসুদটী তয়ের করা একটু শক্ত। কেন না, লাইকর পোটাসির সঙ্গে আগে খুব ভাল করিয়া

মিশাইয়া লইতে না পারিলে, কড্লিবর্ অইল উপরে ভাসিতে থাকিবে।

দিন পোনর এই নিয়মে অসুদ বিসুদ ব্যবহার করিলে ছেলেটীর ব্যামো অনেক নরম পড়িল। গিলিবার কষ্ট অনেক গেল; ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁপাইয়া উঠাও ঢের কমিল; আগের চেয়ে বেশী শুনিতে পাইতে লাগিল; গলার স্বরও তত খারাপ রহিল না। দু হপ্তার মধ্যে এত উপকার হইল দেখিয়া, এই সুসংবাদ লইয়া বাপ ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে আবার উপস্থিত হইলেন। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অসুদে যথার্থই ভারি উপকার হইয়াছে। ব্যামোটী নির্দ্দোষ সারিতে বোধ হয় মাস দুই লাগিবে। আপনি এই নিয়মে ছেলেটীকে আর মাস দুই রাখুন; তা হইলে ছেলের ব্যামোর জন্যে আপনাকে আর কোন চিন্তাই করিতে হইবে না। ফল কথা, দু মাসের মধ্যেই ছেলেটী বেশ ভাল হইয়া গেল।

আল্টাক্রার গুল্লিতে ঘা—সহজ শরীরে আল্টাক্রার গুল্লিতে ঘা হয় না। যারা খুব রোগা আর দুর্ব্বল—যাদের শরীর খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাদের আল্টাক্রার গুল্লিতে ঘা হইতে পারে। কিন্তু যাদের গর্ম্মির ধাত (ধাতু), তাদেরই এ ঘা

বেশী হয়। গর্ম্মির ভাল কথা উপদংশ—এ কথা এর আগেই বলিছি। এ ঘা দেখিলেই চেনা যায়। ঘায়ের উপরটা উবড়ো খাবড়ো আর যেন কেমন ছাই-পড়া ছাই পড়া। এ ঘা শীঘ্র সারিতে চায় না। ঘা খুব আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকে। ঘা ভাল করিবার কোনও চেষ্টা না করিলে, ঘা বাড়িয়া নাকের ভিতর পর্য্যন্ত আসে; গলার ভিতরেও ঘা হয়; স্বর যন্ত্রেও ঘা হয়। স্বর-যন্ত্রকে ডাক্তরেরা লেরিংস্ বলেন। এ ঘায়ের চিকিৎসা শক্ত নয়। ৯৫২র পাতের কড্‌লিবর্ অইল্ মিক্‌শ্চর নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়া রোগীর ধাত (ধাতু) শুধ্‌রে দিবে। আর ৯৩২—৯৩৩র পাতের কাষ্টকির জল রোজ সকালে বিকালে আল্টাকরার গুল্লিতে লাগাইয়া ঘা শুকাইয়া দিবে। এ ছাড়া, গায়ে বল হয় রোগীকে এমন আহার দিবে। ৯৫২র পাতে কড্‌লিবর অইল মিক্‌শ্চর অর্দ্ধেক মাত্রায় লেখা আছে। রোগীর বয়স বুঝিয়া অষুদের মাত্রা তা থেকেই ঠিক্ করিয়া লইবে।

গর্ম্মির ধাত (ধাতু) নৈলে আল্টাকরার গুল্লিতে ঘা হয় না—এ এক রকম মোটামুটি জানিয়া রাখ। যার গর্ম্মির ব্যামো হয়, কেবল তারই যে গর্ম্মির ধাত (ধাতু) হয়, তা নয়। তার ছেলে মেয়েরাও

তার সেই গর্ম্মির ধাত (ধাতু) পায়। এই জন্যে, ছেঁলেদের আল্টাক্রার গুল্লিতে ঘা হইলে, মা বাপের কাছে তারা গর্ম্মির ধাত (ধাতু) পাইয়াছে, ঠিক্ করিবে। তবেই জানিয়া রাখ, রোগীর নিজের গর্ম্মির ব্যামো না হইলেও তার গর্ম্মির ধাত (ধাতু) হইতে পারে। গর্ম্মির ধাত (ধাতু) চৌদ্দ পুরুষেও ঘোচে কি না, সন্দেহ।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার আর একটা কথা বলিতে বাকী আছে। আল্টাক্রার গুল্লি পাকিলে অস্ত্র করা হবে না। অনেকে অস্ত্র করিতে পরামর্শ দেন বটে, কিন্তু অস্ত্র করায় ঢের বিপদ্। অস্ত্র করিবার সময় খুব সাবধান না হইলে শির কাটিয়া যায়। যে শিরটী কাটিয়া যায় বলিতেছি, সে শিরটী রাঙা রক্তের শির। রাঙা রক্তের শিরকে ডাক্তরেরা আর্টেরি বলেন—ভাল বাঙ্গালায় ধমনী বলে—এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। সে শিরটী আল্-টাকরার গুল্লির ঠিক্ কাছেই আছে। সে শির কাটিয়া গেলে রক্ত ছুটে রোগী তখনই মারা যায়। অনেক ভাল ভাল ডাক্তরের হাতে এ দুর্ঘটনা ঘটি-য়াছে। তাতেই বলিতেছি, আল্টাকরার গুল্লি পাকিলে অস্ত্র করিবারই দরকার নাই। আপনিই ফাটিয়া যাইতে দেওয়া ভাল।

১৪। ঠোঁটে আর জিবে ঘা—

বাতশ্লেষ্ম বিকারে ছেলেদেরই এ রকম ঘা বেশী দেখা যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে আমরা তাকে বাতশ্লেষ্ম বিকার বলিয়া থাকি। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। পেটের দোষ এ রকম ঘায়ের আসল কারণ। পেটের দোষ কাকে বলে? পেটের দোষ বলিলে কি বুঝায়? ৮১৭র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে জোওয়ান রোগিদের ঠোঁটে আর জিবে এ রকম ঘা হয় না, তা নয়। পেটের দোষ বেশী রকম হইলে তাদেরও এ রকম ঘা হয়। তবে ছেলেদের এ রকম ঘায়ের যত বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে, জোওয়ান রোগিদের তত হয় না। ঠোঁটে আর জিবে এ রকম ঘা হইলে রোগীকে আহার অষুদ দেওয়া মস্কিল হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, রোগীর কষ্টের ত কথাই নাই। এই জন্যে, যত শীঘ্র পার এ উপসর্গ সারিয়া দিবে। এ উপসর্গের চিকিৎসা শক্ত নয়। রোগীর পেটের দোষটী ভাল করিয়া দেও আর ঘায়ের উপর সোহাগার খৈ আর মধু (একত্র মিশাইয়া) নিয়ত লাগাও। শুদ্ধু এতেই ঘা সারিয়া যাবে। কি উপায় করিলে পেটের দোষ সারে, পেট-ফাঁপার কথা বলিবার সময় তা বলিছি।

ক্লরেট অব পটাশ এ ঘায়ের আর একটী খুব ভাল অসুদ। ক্লরেট অব পটাশ মাঝে মাঝে খাইতে দিলে ঘা আরও শীঘ্র সারিয়া যায়।

এক বছরের ছেলেকে এক গ্রেন্ করিয়া ক্লরেট অব পটাশ দু তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে পার। রোগীর বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া ক্লরেট অব পটাশের মাত্রা ঠিক্ করিবে। ছেলেদের অসুদ একটু মিষ্টি করিয়া দিলে ভাল হয়। এই জন্যে, এক ঝিনুক জলে এক গ্রেন্ ক্লরেট অব পটাশ দিয়া, তাতে একটু সিরপ্ কি মধু দিয়া মিষ্টি করিয়া দিবে। বারে বারে এই রকম করিয়া তয়ের না করিয়া, সুবিধার জন্যে একবারে ১২ বারের অসুদ তয়ের করিয়া লইবে। ১২ বারের অসুদ নীচে লিখিয়া দিলাম ঃ—

ক্লরেট অব পটাশ্	...	...	১২ গ্রেন্
সিরপ্ জিঞ্জর	...	...	২ ড্রাম্
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	...	...	২ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

ক্লরেট অব পটাশ খাওয়াইলে ত উপকার হয়ই —তা ছাড়া, ঘায়ে লাগাইলেও উপকার হয়। বিশ ঔন্স (এক পাইণ্ট—আড়াই পোওয়া) জলে ২ ড্রাম্

ক্লরেট অব পটাশ গুলিয়া, সেই জল ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে লাগাইলে ঘা খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ৫২র পাতে পিপাসার যে অস্থদ লিখিয়া দিইছি, তা থেকে সিট্রিক য়্যাসিড বাদ দিয়া ঘায়ে সেই জল লাগাইয়া দিলেও হয়। ক্লরেট অব পটাশের জল খুব ফর্শা সরু ন্যাকড়ায় করিয়া ঘায়ে বারে বারে লাগাইবে। তবেই ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে লাগাইবার তোমার দুটী অস্থদ জানা থাকিল। একটী অস্থদ সোহাগা, আর একটী অস্থদ ক্লরেট অব পটাশ। সোহাগাকে ডাক্তরেরা বাইবোরেট অব সোডা বলেন; সোজা ইংরিজিতে বোরাক্স বলে। সোহাগার চেয়ে সোহাগার খৈ মধুর সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া ঢের সোজা। সোহাগা তত সহজে গুঁড়ো করিতে পারা যায় না। সোহাগা আগুণে দিলেই তার খৈ তয়ের হয়। সোহাগা গুঁড়ো করিয়া মধুর সঙ্গে মিশাইয়া ডাক্তরেরা যে অস্থদ তয়ের করিয়া থাকেন, সে অস্থদকে তাঁরা মেল্ বোরেসিস্ বলেন। মেল্ বোরেসিস্ লিখিয়া ডিস্পেন্সরিতে প্রেস্কৃপ্শন (ব্যবস্থা পত্র) পাঠাইয়া দিলে কম্পাউণ্ডরেরা তখনই তা তয়ের করিয়া দেয়। মেল্ বোরেসিস্ যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলামঃ—

সোহাগার খুব মিহি গুঁড়ো	...	৬৪ গ্রেন্ (১ ড্রাম্ ৪ গ্রেন্)
ছাঁকিয়া লওয়া পরিষ্কার মধু	...	১ ঔন্স

একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির মুখ কাক দিয়া আঁটিয়া রাখ। আঙুলে করিয়াই হোক, আর তুলি করিয়াই হোক্, ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে বারে বারে লাগাইয়া দিবে।

এখানে একটা কথা বলিবার সুবিধা পাইলাম বলিয়াই বলিলাম। ৫২র পাতে পিপাসার যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, সে যে কেবল পিপাসারই অসুদ, তা নয়। তাতে মুখ-শোষ আর পিপাসা ত শান্তি হয়ই—ছাতা-পড়া, নোংরা, অপরিষ্কার, কটা, শুক্‌ন জিবও পরিষ্কার আর সরস হয়। ক্লরেট অব পটাশে যে কেবল এই উপকারই হয়, তা নয়। তা ছাড়া, আরও ঢের উপকার হয়। ক্লরেট অব পটাশে জ্বরের বাগ ফিরাইয়া দেয়—বাঁকা, শক্ত জ্বর সোজা করিয়া দেয়; রোগ সারিবার পথে লইয়া আসে। এক অসুদে আর কত উপকার করিবে? একটা অসুদের কাছে আর কত উপকার চাও? তার পর ধর। ক্লরেট অব পটাশ খাওয়াইলে ঠোঁটের আর জিবের ও রকম ঘা সারিয়া যায়। ক্লরেট অব পটাশের জল, ন্যাক-ড়ায় করিয়া বা তুলি করিয়া বারে বারে লাগাইলেও

ঘা সারিয়া যায়। তবেই জানিয়া রাখ, ক্লরেট অব পটাশ শুদ্ধু পিপাসার অসুদ নয়—জ্বরেরও (তা যে রকম জ্বরই হোক্) একটী খুব ভাল অসুদ। এ কথাটা কখনও ভুলিও না—জ্বরের রোগীকে ক্লরেট অব পটাশের জল—৫২র পাতের পিপাসার জল—নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে কখনও ভুলিও না।

ঠোঁটের আর জিবের এ ঘাকে ডাক্তরেরা য়্যাফ্‌থি বলেন; সচরাচর লোকে শ্লেষ্মার ঘা বলে। শ্লেষ্মার ঘা কথাটীর বেশ মানে আছে। পেটের (পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা থেকেই এ ঘা হয়। এই জন্যে, এ ঘাকে শ্লেষ্মার ঘা বলা বেশ যুক্তি। এ ছাড়া, এ ঘা হইলে মুখ দিয়া বেশী লালও পড়ে। লাল আর শ্লেষ্মা একই কথা। এই জন্যে, এ ঘাকে শ্লেষ্মার ঘা বলা আরও মানায়। লালের ভাল কথা লালা। সোজাসুজি লাল বলাই ভাল। বৈদ্যরা বলেন শ্লেষ্মার কোপ না হইলে বিকার হয় না। গৃহস্থেরাও এ কথাটী বেশ করিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন—বেশ করিয়া শিখিয়া রাখিয়াছেন। রোগীর অবস্থা যত খারাপ হয়, তাঁরা বলেন শ্লেষ্মার কোপ তত বেশী হইয়াছে। আবার এ দিকে রোগীর অবস্থা এই রকম খারাপ হইলেই ও রকম ঘা ফোটে; ঘা ফুটিলেই তাঁরা বলেন

শ্লেষ্মার ঘা ফুটিয়াছে। এই জন্যে ডাক্তরি, কবিরাজি দু মতেই এ ঘাকে শ্লেষ্মার ঘা বলিতে পারা যায়। এ ঘা যে কেবল ঠোঁটে আর জিবেই হয়, তা নয়; মুখের ভিতর সব জায়গাতেই হয়। জিবে, ঠোঁটে, আর কল্‌শায়—এই তিন জায়গায় এ ঘা বেশী হয়। এ ঘা যখন প্রথম হয়, তখন ঠিক্ ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখায়; কিন্তু ফোস্কা ফাঁপা, এ ঘা ফাঁপা নয়—নিরেট। আমের আটা লাগিয়া ছেলেদের ঠোঁটে, গালে যে রকম ঘা হইয়া থাকে, এ ঘায়েরও আকার প্রকার প্রায় সেই রকম। আমের আটার ঘায়ের মত এ ঘাও দু পাঁচ খান একত্র মিলে যায়। জ্বলন্ত বাতি কাইত করিয়া ধরিলে মোম কি চর্ব্বি গলিয়া টোপে টোপে পড়ে। মোমের কি চর্ব্বির ছোট ছোট সেই টোপ গুলি দেখিতে যে রকম, এ ঘাও দেখিতে সেই রকম। বাতি মোমেরও হয়, চর্ব্বিরও হয়; এই জন্যে, মোমের কি চর্ব্বির টোপ বলিলাম।

কচি ছেলে পিলের এ রকম ঘাকে ডাক্তরেরা থ্রশ্ বলেন; মেয়েরা দয়ে-খয়ে বলে। দয়ে-খয়ে ঠোঁটে হয়, কল্‌শায় হয়, জিবে হয়, গালের ভিতর-পিঠে হয়, টাক্‌রায় হয়। দয়ে-খয়ে ঘা আঁতুড়ে ছেলেদেরই বেশী হয়—দাঁত উঠিবার

সময়ও ছেলেদের এ ঘা হইয়া থাকে। খাওয়াইবার দোষেই ছেলেদের এ ঘা বেশী হয়। ঝিনুকে করিয়া আঁতুড়ে ছেলেদের দুধ খাওয়াইলে, এ রকম ঘা তাদের হইতেই চায়। এ ছাড়া, পেটের দোষে ত ছেলেদের এ রকম ঘা হইয়াই থাকে। দয়ে-খয়ে ঘায়ে ছেলেদের কষ্ট নিতান্ত কম হয় না। ব্যথার জন্যে বেশ জুত বরাত করিয়া মাই তেমন টানিয়া খাইতে পারে না। সহজ বেলার মত টানিয়া খাইতে গেলেই তাদের ব্যথা লাগে। ঘায়ের ব্যথা—ঘায়ের কষ্ট ছাড়া, তাদের আর কোনও অসুখ হয় কি না? হয়। গা গরম হয়, বারে বারে ওয়াক তোলে, দুধ তোলে, পাতলা বাহ্যে যায়; আর যেন ঝিমুতে থাকে। এ ছাড়া, তাদের মুখে দুর্গন্ধও হয়।

ছেলেদের দয়ে-খয়ে ঘা হইলেই ঠিক্ করিবে, তাদের পেটে অম্বল হইয়াছে। পেটে অম্বল হইলে ছেলেরা দুধও তোলে, পাতলা পাতলা বাহ্যেও যায়। চূণের জল ছেলেদের এ রকম হাগা, দুধ-তোলার খুব ভাল অসুদ। চূণের জল ছেলেদের কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, ৭৩৯র পাতে তা বলিছি। বিস্মথ্‌ও ছেলেদের হাগা, দুধ-তোলার খুব ভাল অসুদ। বিস্মথের কথা ৫৭০—৫৭১র পাতে বলিছি। বিস্মথেও পেটের অম্বল নষ্ট করে।

এ ছাড়া, দয়ে-খয়ের সঙ্গে পেটের-ব্যামো থাকিলে ৬৭৪র পাতের (১)র দাগের পুরিয়া অসুদ ছেলেকে নিয়ম করিয়া খাওয়াইলে, পেটের দোষ আরও শীঘ্র শুধ্‌রে যায়। সেখানে পুরিয়া অসুদের যে মাত্রা লিখিয়া দিইছি, সে মাত্রা তিন বছরের ছেলের পক্ষে। ছেলের বয়স বুঝিয়া তা থেকেই মাত্রা ঠিক্ করিয়া লইবে। ৬৭৫র পাতে বলিছি, খুব কম মাত্রায় হাইড্রার্জ্জ কম্ ক্রীটা, ইপেকা, আর পেপ্‌সিন্, ছোট ছেলেদের পেট-নাবার আর রক্ত-আমাশার যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর নাই। এ সব কথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

দয়ে-খয়ে ঘায়ে লাগাইবার অসুদ আর কি? সেই সোহাগার খৈ আর মধু। ৯৫৯র পাতের মেল্ বোরেসিস্ তয়ের করিয়া তুলি করিয়া ঘায়ে লাগাইতে পার।

পুরাণ রোগে বুড়োদের এ ঘা হইলে, তাদের জীবনের আশা ভরসা ছাড়িয়া দিবে। এ ঘা ফোটার পর তারা আর বেশী দিন বাঁচে না। মোটামুটি জানিয়া রাখ, এ ঘা বুড়োদের পুরাণ রোগের একবারে শেষ লক্ষণ। এ লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর আর বড় বেশী অপেক্ষা নাই, ঠিক্

করিবে। রোগী অনেক দিন ধরিয়া যে রোগে ভোগে, সেই রোগকেই পুরাণ রোগ বলিতেছি।

এর আগেই বলিছি, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে জোওয়ান রোগিদের এ ঘা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্) শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে, তাকে আমরা বাতশ্লেষ্ম-বিকার বলিয়া থাকি। আমাদের ডাক্তরেরা তাকে টাইফয়িড্ ফীবর্ বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

তার পর এখন উর্দ্ধাণের কথা বলি।

১৫। **উর্দ্ধাণ**——জ্বর-বিকারে রোগী ক্ষেপিলে—তেড়ে ফুঁড়ে উঠিলে—বেশী রকম জোর জবর করিলে—চীৎকার করিলে—চেঁচাইলে—বৈদ্যরা বলেন তার উর্দ্ধাণ হইয়াছে। উর্দ্ধাণকে ডাক্তরেরা ফিয়ুরিয়স্ ডিলীরিয়ম্ বলেন; বায়োলেণ্ট ডিলীরিয়ম্ও বলেন। প্রলাপকে ইংরিজিতে ডিলীরিয়ম্ বলে। "ফিয়ুরিয়স্" আর "বায়োলেণ্ট"—এ দুটীই ইংরিজি কথা। এ দুটী কথারই মানে প্রচণ্ড। "প্রচণ্ড" কথার মানে ভয়ানক। এই জন্যে, উর্দ্ধাণের বদলে প্রচণ্ড প্রলাপও বলিতে পার; উগ্র প্রলাপও বলিতে পার; ভয়ানক প্রলাপও বলিতে পার। ভুল-বকার ভাল কথা প্রলাপ। প্রলাপ বলিলে যে শুধু ভুল-বকাই বুঝায় তা নয়;

জ্বর-বিকারের রোগীর ভুল-কাজও বুঝায়। কেন না, রোগী বিছানা বালিশ হাতড়ায়; হাত বাড়াইয়া কি যেন ধরিতে যায়; বিছানা টানে; বালিশ টানে; আপনার গায়ের কি পরণের কাপড় ধরিয়া টানে; কাছে যে বসিয়া থাকে, তার হাত ধরিয়া টানে, তার কাপড় ধরিয়া টানে; আরও কত রকম কি করে। এ সব ত ভুল-বকা নয়; এ সব ভুল-কাজ। বিকারের ঝোঁকে যেমন ভুল বকে; বিকারের ঝোঁকে তেমনি ভুল-কাজও করে। তাতেই বলিতেছি, এ সব ভুল-কাজও প্রলাপের অঙ্গ। তার পর বলি। জ্বর-বিকারে রোগীর দু রকম প্রলাপ দেখা যায়। মৃদু প্রলাপ আর উগ্র প্রলাপ। জ্বরে একবারে অবসন্ন হইয়া, নেতিয়ে পড়ে রোগী যে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে, তাকেই মৃদু প্রলাপ বলে। ২১৬র পাতে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকার কথা বলিছি। কি রকম রোগী মালা-জপার মত বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, ২১১—২১৬র পাত আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে, বেশ বুঝিতে পারিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় মৃদু প্রলাপ হয় না। জ্বর খুব বাড়িয়া না গেলে—রোগীর বল একবারে খাটো হইয়া না গেলে মৃদু প্রলাপ হয় না। মৃদু প্রলাপ সন্নিপাত-বিকারেরই অঙ্গ। যে অবস্থা

দেখিয়া আমাদের ডাক্তরেরা বলেন, রোগীর টাই-ফয়িড্ ফীবর্ হইয়াছে; বৈদ্যরা বলেন, আমরাও বলি, রোগীর বাতশ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছে—রোগীর ঘোর সন্নিপাত উপস্থিত, সেই অবস্থাতেই রোগীর মৃদু প্রলাপ হইয়া থাকে। মৃদু প্রলাপের রোগীর গায়ে হাত দিয়া চেঁচিয়ে ডাকিলে তার চৈতন্য হয়; খানিক ক্ষণের জন্যে বিড়্-বিড়্ করিয়া বকা থামিয়া যায়; জিজ্ঞাসা করিলে দু একটা উত্তরও পাওয়া যায়; বলিলে জিব বাহির করিয়াও দেখায়। কিন্তু এ অবস্থা বিস্তর ক্ষণ থাকে না; তার পরই আবার সেই রকম বিড়্-বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে। অনেক জায়গায় রোগীর কাছের লোক বেশ বুঝিতে পারে, রোগী ঠিক্ যেন স্বপন দেখিতেছে—স্বপনে কথা বার্ত্তা কহিতেছে; এ সব জায়গায় রোগী প্রলাপে সত্য সত্যই জানা শুনা লোকের সঙ্গে যেন কথা বার্ত্তা কহিতে থাকে। কোন কোন জায়গায় দেখা যায়, ব্যামোর আগে রোগী যে কাজ করিতেছিল—যে কাজে ব্যস্ত ছিল, প্রলাপে সেই কাজেরই কথা বার্ত্তা কয়। তার পর বলি। মোটা-মুটি জানিয়া রাখ, জ্বরের প্রথম অবস্থায়—রোগী সবল থাকিতে মৃদু প্রলাপ হয় না; মৃদু প্রলাপ সন্নিপাত-বিকারের অঙ্গ। সন্নিপাত-বিকারে রোগীর

যে অবস্থা হয়, সে অবস্থার যেমন অস্থুদ মৃগনাভি (কস্তুরী) আর কর্পূর, তেমন অস্থুদ আর নাই। ২৪২র পাতে এ কথা বলিছি। মৃগনাভি আর কর্পূর খাইয়া রোগীর সে অবস্থা শুধ্‌রে গেলে, মৃদু প্রলাপ ভাল হইয়া যায়। তার পর বলি।

রোগীর যে অবস্থায় মৃদু প্রলাপ হয়, উগ্র প্রলাপ —উর্দ্ধাণ তার ঠিক্ বিপরীত অবস্থায় হয়। মৃদু প্রলাপে রোগীর বলের অভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উগ্র প্রলাপে—উর্দ্ধাণে রোগীর বলের বাড়াবাড়িরই পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ু-রোগে —উন্মাদ রোগে ভারি রকম ক্ষেপিয়া রোগী যে রকম দৌরাত্ম্য করে—যে রকম উপদ্রব করে—যে রকম উৎপাত করে—বলের বাড়াবাড়ির যে রকম পরিচয় দেয়, উর্দ্ধাণেও রোগীর ঠিক্ সেই রকম ভাব গতিক দেখা যায়। এমন কি, কোন কোন জায়গায় এ রকমও ঘটিয়াছে যে, জ্বর বিকারে রোগীর উর্দ্ধাণ হইয়াছে, চিকিৎসক তা বুঝিতে না পারিয়া, উন্মত্ত, ক্ষেপা, পাগল বলিয়া তার চিকিৎসা করিয়াছেন! উর্দ্ধাণ কখন কখন জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই ঘটে।

তার পর এখন উর্দ্ধাণের চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——উচু থেকে মাথায় ঠাণ্ডা জল

ঢালা; দু পায়ের তলায়, দু পায়ের ডিমে, আর দু উরতে রাইয়ের খুব ঝাঁজাল পলস্তরা বসান; আর হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ খাওয়ান—ঊর্দ্ধাণের এই তিন রকম চিকিৎসা। ঊর্দ্ধাণের রোগীকে আয়ত্ত করিবার জন্যে দু তিন জন খুব সবল লোকের দরকার। রোগীর আপনার এমন কেউ না থাকিলেও, এ বিপদে পাড়া প্রতিবাসিরা আপনারাই আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগীকে বেশ আয়ত্ত করিয়া বিছানায় জুত বরাত করিরা শোওয়াইবে। তার পর, বিছানা বালিশ ভিজিয়া না যাইতে পারে, এমন ফিকির করিয়া ঠাণ্ডা জল তার মাথায় নিয়ত ঢালিতে থাকিবে। ঘটি করিয়াই হোক্, আর গাড়ু করিয়াই হোক্, হাত খানেক কি হাত দেড়েক উচু থেকে জল ঢালিবে। জল যত ঠাণ্ডা হবে, ততই ভাল। জল একবারে হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হবে না। গাড়ুর নল দিয়া জল যেমন ধারে পড়ে, জুত বরাত করিয়া ঢালিলে, ঘটি করিয়াও সেই রকম ধারে জল ঢালিতে পারা যায়। এক ঘটি কি এক গাড়ু জল ঢালিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। রোগীর উগ্র ভাব থাকিতে জল ঢালা কমাইয়া দেওয়া হবে না। তোমার ঘটির কি গাড়ুর জল ফুরাব ফুরাব হইলে, অমনি আর এক জন জল

যোগাইয়া দিবে। মাথায় জল ঢালিয়া দিলে, সে জল বিছানার দিকে গড়াইয়া আসিতে না পারে, এমন জায়গা দেখিয়া আর এমন জুত বরাত করিয়া রোগীর বিছানা করিয়া দিবে। বালিশ ভিজিয়া না যাইতে পারে, এই জন্যে কলাপাত দিয়া বালিশ ঢাকিয়া দিবে। শহরে বড়-মানুষেরা অইল্ ক্লথ্ দিয়া কি রবরের চাদর দিয়া রোগীর বিছানা বালিশ ঢাকিয়া দিতে পারেন। রোগীর মাথার তেলোয়—মাথার চাঁদিতে ঐ রকম করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালা চাই।

ও দিকে, রোগীর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঐ রকম করিয়া নিয়ত এক জন ঢালিতে থাক্। এ দিকে, রোগীর দু পায়ের তলায়, দু পায়ের ডিমে, আর দু উরতে রাইয়ের পলস্তরা বসাইয়া দেও। এখানে রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল করিয়া দেওয়া চাই। এখানে রাইয়ের পলস্তরা দু রকম করিয়া তেজাল করিতে পার। খানিকটে বাটা লঙ্কামরিচের (গাছ-মরিচের) সঙ্গে মিশাইয়া রাইয়ের পলস্তরা তয়ের করিতে পার। খানিকটে তার্পিণেরও সঙ্গে মিশাইয়া রাইয়ের পলস্তরা তয়ের করিতে পার। লঙ্কামরিচের (গাছ-মরিচের) সঙ্গে কি তার্পিণের সঙ্গে মিশাইয়া, রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল করিয়া,

লইয়া রোগীর দু পায়ের তলায়, দু পায়ের ডিমে, আর দু উরতে বসাইয়া দিলে তার মাথার মগজের রক্ত খুব শীঘ্র নামিয়া আসে। মগজে রক্ত উঠিয়া —মগজে রক্ত জমা হইয়াই ত রোগীর অমন দুর্দ্দশা ঘটায়। রাইয়ের পলস্তরা পায়ের ডিমের ভিতর দিকে, আর উরতের ভিতর দিকে বসাইতে হবে। শরীরের কোনও অঙ্গের ভিতর দিক্ আর বাহির দিক্ বলিলে কি বুঝায়? অঙ্গের যে দিক্ শরীরের দিকে থাকে, সেই দিক্‌কেই সে অঙ্গের ভিতর দিক্ বলে; আর তার বিপরীত দিক্‌কে বাহির দিক্ বলে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে। হাতের বাউর যে দিক্ পাঁজরের দিকে থাকে, সেই দিক্‌কেই বাউর ভিতর দিক্ বলে। যে দিক্‌কে ভিতর দিক্ বলে, তার ঠিক্ বিপরীত দিক্‌কে যে বাহির দিক্ বলে, তা কি আর বলিতে হবে? যে দিকে ইংরিজি টিকে পরে, বাউর সে দিক্‌কে বাহির দিক বলে। উরতের ভিতর দিক্ বলিলে কি বুঝায়? বাঁ উরতের যে দিক্ ডাইন্ উরতের দিকে থাকে, সেই দিক্‌কে বাঁ উরতের ভিতর দিক্ বলে। ডাইন্ উরতের যে দিক্ বাঁ উরতের দিকে থাকে, সেই দিক্‌কে ডাইন উর-তের ভিতর দিক্ বলে। পায়ের ডিমেরও বেলায়

ঠিক্ এই রকম ধরিয়া লইবে। যেখানে দেখিবে দুটী অঙ্গ কাছাকাছি আছে, সেই খানেই ঠিক্ এই রকম ধরিয়া লইবে। তার পর বলি। রাইয়ের পলস্তরা কত ক্ষণ রাখিতে হবে; পলস্তরা উঠাইয়া তার পরই বা কি করিতে হবে, ৭৭২র পাতে তা বলিছি। এখানে রোগীর যে অবস্থা, যে উগ্র ভাব, যে দৌরাত্ম্য, তাতে ব্যাণ্ডেজ্ দিয়া বেশ করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া না দিলে পলস্তরা গুলি ঠিক্ জায়গায় থাকিবে না। কাপড়ের কম চৌড় লম্বা ফালিকে ডাক্তরেরা ব্যাণ্ডেজ্ বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ উর্ব্বাণের খুব ভাল অসুদ। হাইড্রেট অব্ ক্লোরালের মাত্রা বিশ (২০) গ্রেন্। খুব সম্ভব, জুত বরাত করিয়া পূর এক মাত্রা খাওয়াইয়া দিতে পারিলে, রোগীর উগ্র ভাব ঢের কমিয়া যায়—রোগী ঢের ঠাণ্ডা হয়—রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। এক মাত্রায় তেমন কাজ না হয় ত, ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দেড়েক পরে আর এক মাত্রা দিতে পার। উর্ব্বাণের রোগীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্যে উপ্রো উপ্রি তিন মাত্রা হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ দিবার দরকার প্রায়ই হয় না। হাইড্রেট অব ক্লোরাল্ খাইয়া রোগী ঘুমাইলে তাকে

সহজেই জাগাইয়া আহার দেওয়া যায়। আহারের পর রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়ে। হাইড্রেট অব্ ক্লোরালের এটী চমৎকার গুণ। হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ খাইয়া ঘুমাইলে, ফুল্‌কোর নলিতে শ্লেষ্মা জমিলে রোগী কাশিয়া নলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারে। এটীও হইড্রেট অব্ ক্লোরালের খুব চমৎকার গুণ। তবেই দেখ, হাইড্রেট অব্ ক্লোরালের ঘুম আর সহজ বেলার ঘুম, প্রায় সমান। আফিঙের ঘুমে রোগী কাশিয়া ফুল্‌কোর নলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারে না। কাজেই, আফিঙের ঘুমে ব্রংকাইটিস্-রোগীর সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী—বিপদ্‌ই বেশী। আফিঙের ঘুম থেকে রোগীকে তেমন সহজে জাগাইয়া আহার দিতে পারা যায় না; আহারের পর রোগী আবার তেমন ঘুমাইয়াও পড়ে না। তাতেই বলি, এ জায়গায় হাইড্রেট অব্ ক্লোরালের কাছে আফিংকে হারি মানিতে হইয়াছে। এ সব কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব।

উর্ব্বাণের রোগীকে আয়ত্ত করিয়া বিছানায় জুত বরাত করিয়া শোওয়াইয়া তার মাথায় ঠাণ্ডা জল ও রকম করিয়া ঢালিতে পারা যায়। রাইয়ের ও রকম ঝাঁজাল পলস্তরাও তার দু পায়ের তলায়,

দু পায়ের ডিমে, আর দু উরতে বসাইয়া দিতে পারা যায়। কিন্তু উর্ব্বাণের রোগীকে অসুদ খাওয়ানই মস্কিল। এই জন্যে, অনেক জায়গায় মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া আর রাইরের ঐ রকম ঝাঁজাল পলস্তরা বসাইয়া উর্ব্বাণের রোগীকে ঠাণ্ডা করিতে হয়। রোগী ঠাণ্ডা হইলে—সহজে অসুদ খাওয়াইয়া দিবার মত রোগীর অবস্থা হইলে, তার ঘুম পাড়াইবার জন্যে হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ খাওয়াইয়া দিবে। যদি বল, রোগী যদি ঠাণ্ডাই হইল, তবে তাকে হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ খাওয়াইযা দিবার দরকার কি? দরকার এক আধটু নয়—খুবই দরকার। হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ খাইয়া রোগী ঘুমোয়,—ঘুম থেকে ঠিক্ যেন সহজ রোগী হইয়া উঠে। তবেই দেখ, রোগীর একবার ঘুম হওয়া ভারি দরকার। মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া আর ঐ সব জায়জায় রাইয়ের ঝাঁজাল পলস্তরা বসাইয়া রোগীকে যদিই কখনও তেমন ঠাণ্ডা না করিতে পার;—আর তাকে হাইড্রেট অব ক্লোরাল্ খাওয়াইয়া দেওয়া মস্কিল দেখ; তবে তার বাউর চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে রোগী ঠাণ্ডা হইয়া খানিক পরে ঘুমাইয়া পড়ে। উর্ব্বাণের

রোগীকে ঠাণ্ডা করিবার আর তার ঘুম পাড়াইবার এত গুলি উপায় তোমার জানা থাকিল। কতটুকু মর্ফিয়া কি রকম করিয়া চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিতে হয়, ৭৩৪—৭৩৫র পাতে তা বলিছি। অনেক জায়গায় মর্ফিয়া একবার পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেই কাজ হয়। কোন কোন জায়গায় দু বারও দিতে হয়; তিন বারও দিতে হয়।

কতটুকু হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ কি রকম করিয়া তয়ের করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলামঃ—

হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্	...	...	১ ড্রাম্
সিম্পল্ সিরপ্	...	...	১ ঔন্স
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	...	...	২ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৩টে দাগ কাটিয়া দেও।

হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ অষুদটী শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে, এ অষুদটী সাহেবদের ডিস্পেন্সরি থেকেই কেনা ভাল। আর কাচের সিপি-ওয়ালা শিশিতে এ অষুদটী খুব যত্ন করিয়া রাখা চাই। হাইড্রেট অব্ ক্লোরালের দাম বেশী নয়। আট গণ্ডা পয়সার হাইড্রেট অব্ ক্লোরালে ঊর্দ্ধাণের দু তিনটে রোগী ভাল করিতে পার।

যায়। হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল্ আরও ঢের রোগের খুব ভাল অষুদ। মেটিরিয়া মেডিকায় সে সব ভাল করিয়া বলিব।

উর্দ্ধবাণের রোগী ঠাণ্ডা হইলে, তার মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিবে। কেন না, মগজে রক্ত উঠিয়া—রক্ত জমা হইয়া যার এমন উগ্র ভাব এক-বার হইয়াছে, তার মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্যে বিধি মতে চেষ্টা করা চাই। রোগীর উগ্র ভাব থাকিতে তার মাথা ন্যাড়া করিয়া দেওয়া সম্ভবই নয়। এই জন্যে, ঐ সব উপায়ে সে ঠাণ্ডা হইলে, তার মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিতে বলিলাম। রোগীর মাথায় জল-পটি দিবার কথা ২৭—২৮র পাতে বলিছি।

ফোজ্দারি হঙ্গাম গেলে—উর্দ্ধবাণ থামিয়া গেলে আসল রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। উর্দ্ধবাণ আসল রোগ নয়—আসল রোগের উপসর্গ—এ কথাটা যেন মনে থাকে।

তার পর এখন বাক্-রোধের কথা বলি।

বাক্-রোধ——বাক্-রোধকে ডাক্তরেরা এফেশিয়া বলেন। খুব শক্ত রকম জ্বর জ্বাড়ির ধাক্কা সামলাইবার সময় রোগীর বাক্-রোধ হইতে পারে —হইয়াও থাকে। এ বাক্-রোধ বেশী দিন থাকে

না—আপনিই সারিয়া যায়। এ বাক্-রোধ দুই এক হপ্তাও থাকিতে পারে; দু পাঁচ দিনও থাকিতে পারে; এক আধ দিনও থাকিতে পারে; আবার চাই কি, ক ঘণ্টা বা ক মিনিটেরও বেশী না থাকিতে পারে। মগজে রক্ত জমিলে এ বাক্-রোধ হইতে পারে; মগজের রক্ত খুব কমিয়া গেলেও এ বাক্-রোধ হইতে পারে। এ বাক্ রোধ হঠাৎই হয়। এ বাক্-রোধে রোগীর মুখ চক দেখিলে তার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। তার মুখ চকের ভাবে বোধ হয়, সে কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারে; কেবল আপনার মনের ভাবই ব্যক্ত করিতে পারে না। আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে তার চক দিয়া জল পড়ে; অনেক জায়গায় এটী স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। রোগী ঠোঁট জিব সহজ বেলার মত নাড়িতে পারে। এ বাক্-রোধে রোগী লিখিয়া, কি ইঙ্গিত করিয়াও, আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। এ বাক্-রোধে রোগী জিনিশ পত্রের ব্যবহার ভুলিয়া যায় না। বালিশ দিলে বালিশ মাথায় দেয়; পাকা দিলে, পাকা লইয়া আপনিই সহজ বেলার মত বাতাস করে; খাবার কোনও জিনিশ দিলে আপনিই খায়। এ বাক্-রোধ

পূর্ও হইতে পারে; আবার পূর্ না হইতেও পারে। পূর্ বাক্-রোধে রোগী একবারে বোবা হইয়া যায়। বাক্-রোধ পূর্ না হইলে, রোগী দু একটা কথা স্পষ্ট করিয়া কৈতে পারে; কিন্তু সেই দু একটা কথাই তার পুঁজি। তুমি তাকে যা জিজ্ঞসা করিবে, সেই দু একটা কথা দিয়াই সে তার উত্তর দিবে। "কেমন আছ" বলিলেও, সেই দু একটা কথা বলিয়া তার উত্তর দিবে;—"আজ্ কি খাবে" বলিলেও, সেই দু একটা কথা বলিয়া তার উত্তর দিবে। সেই দু একটা কথা বৈ তার আর পুঁজি নাই, ত সে আর কি করিবে?

এ বাক-রোধ আপনিই সারিয়া যায়, কোনও অসুদ বিসুদ করিতে হয় না—করিবার দরকারও নাই। অসুদ বিসুদ করিলে বরং রোগী আরও খারাপ হয়।

বাক্-রোধের সঙ্গে ডাইন্ আধ-খানা অঙ্গের পক্ষাঘাত প্রায়ই ঘটে। খাটি নিভাঁজ বাক্-রোধ যেমন আপনিই সারিয়া যায়; অসুদ বিসুদ কিছুই করিতে হয় না; পক্ষাঘাতের বাক-রোধে অসুদ বিসুদে তেমনি কিছুই করিতে পারে না; হাজার অসুদ বিসুদ দেও, রোগের কিছুই হয় না। তবে গর্ম্মির ব্যামো থেকে যদি পক্ষাঘাত আর বাক্-রোধ

হয়, তবে আয়োডাইড অব্ পোটাসিয়ম্ খাওয়াইয়া রোগীকে ভাল করিতে পারা যায়।

তার পর এখন কানে পূঁষ হওয়ার কথা বলি।

১৬। কানে পূঁয হওয়া——কানে পূঁয হওয়াকে ডাক্তরেরা অটরীয়া বলেন। কানে পূঁয হওয়া আর কান দিয়া পূঁয পড়া, একই কথা। কানে পূঁয বেশী হইলেই গড়াইয়া পড়ে। এই রকম করিয়া পূঁয যখন গড়াইয়া পড়ে, তখনই কান দিয়া পূঁয পড়া বলিতে পার। ফলে, দুই-ই এক কথা। কানে পূঁয হওয়াকে কান-পাকাও বলে। কানের অনেক রকম ব্যামো থেকে কানে পূঁয হয়—কান পাকে। কানে পূঁয হইবার আগে—কান পাকিবার আগে প্রায়ই কান কামড়ায়; কানের ভিতর ব্যথা করে। কানে পূঁষ ছেলেদেরই বেশী হয়। দাঁত উঠিবার সময়ই ছেলেদের এ অস্বস্তি বেশী হয়। ধরিতে গেলে, কান-পাকা ছেলে বয়সেরই রোগ। তবে জোওয়ান বয়সে কান না পাকে, এমন নয়। হাম-জ্বর, পানি-বসন্ত, কি এলো-বসন্ত হইলে ছেলেদের প্রায়ই কান পাকিয়া থাকে। হাম কি বসন্তর গোড়ায় কান পাকে না; শেষে কান পাকে। যে সব ছেলের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু), হাম কি বসন্ত হইয়া তাদেরই কান-পাকা বেশী

ঘটে। গণ্ডমালা ধাতের (ধাতুর) কথা ৯১৫র পাতে মোটামুটি এক রকম বলিছি; এর পর আরও বিশেষ করিয়া বলিব।

কারণ——দূর কারণ আর নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা ২৯৯—৩০১র পাতে বলিছি। ছেলে বয়সেই কান-পাকা বেশী হয়; এই জন্যে, ছেলে বয়স কান-পাকার একটী দূর কারণ। যাদের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু), তাদেরই কান-পাকা বেশী হয়; এই জন্যে, গণ্ডমালার ধাত (ধাতু) কান-পাকার আর একটী দূর কারণ।

তার পর কান-পাকার নিকট কারণ বলি। হিম বাত ভোগ করা—বৃষ্টিতে ভেজা—ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা—যে কোন রকমে হোক্, কানের ভিতর বেশী ঠাণ্ডা লাগান, কান-পাকার নিকট কারণ। কানের ভিতর কিছু গেলেও কান পাকে। এই জন্যে, কানের ভিতর কিছু যাওয়া কান-পাকার আর একটী নিকট কারণ। হাম-জ্বর, পানি-বসন্ত, আর এলো বসন্ত—এ সব রোগও কান-পাকার নিকট কারণ।

কান-পাকা আপনিই ভাল হইয়া যাইতে পারে; আবার পুরাণ পড়িয়াও যাইতে পারে। পুরাণ পড়িয়া গেলে কান-পাকা শীঘ্র সারে না—সারিতে

চায়ও না। কান-পাকা অনেক দিন থাকিলে কানের ভিতরকার পর্দ্দাও খারাপ হইয়া যাইতে পারে; কানের ভিতরকার ছোট ছোট হাড়ও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কানের ভিতরকার পর্দ্দা কি ছোট হাড় নষ্ট হইয়া গেলে, কান কালা হইয়া যায়। এই জন্যে, কান-পাকাকে সোজা রোগ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কান পাকিলে, কান দিয়া পূয পড়া যাতে শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায়, তার চেষ্টা বিধিমতে করিবে। কান-পাকা কখনও পুরাণ পড়িতে দিবে না। কান-পাকা পুরাণ পড়িলেই মস্কিল; পুরাণ পড়িতে দিলে এ অস্বস্তির হাত এড়ানই ভার।

চিকিৎসা——কান-পাকার চিকিৎসা সোজা। অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া, সেই সাবান-গোলা জলের পিচ্‌কিরি করিয়া কানের ভিতর বেশ পরিষ্কার করিয়া দিবে। তার পর, গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিন্ ফোটা ফোটা করিয়া কানের ভিতর ঢালিয়া দিবে; তার পর কাপাসের তুলো দিয়া কান বন্ধ করিয়া দিবে। গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিন্ এ রকম করিয়া অনেক বার দিতে হয় না। অনেক জায়গায় ছু একবার দিলেই কান-পাকা ভাল হইয়া যায়। ফল কথা, গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিনের মত কান-পাকার

ভাল অসুদ আর নাই। কান-পাকা নির্দ্দোষ সারিয়া না গেলে, রোজ পিচ্‌কিরি করিয়া ধোওয়া আর গ্লিসেরীন্‌ অব্‌ ট্যানিন্‌ কানের ভিতর দেওয়া বন্ধ করিবে না।

শক্ত রকম রোগ ঘোগ ভোগ করিয়া ছেলেরা খুব দুর্ব্বল আর অসুস্থ হইয়া পড়িলে, তাদের কান প্রায়ই পাকে—তাদের কানে প্রায়ই পূয হয়। কানের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে ছেলেদের কান-পাকে—এ কথা এর আগেই বলিছি। কান-পাকার চিকিৎসার বেলায় এ সব কথা যেন মনে থাকে।

কান পাকা পুরাণ পড়িয়া গেলে, কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ আর সিরপ্‌ ফেরি আয়োডাইড্‌—এ দুটী অসুদে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কোনও অসুদে নয়। এক বছরের ছেলেকে ৫ ফোটা কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ আর ১ ফোটা সিরপ্‌ ফেরি আয়োডাইড্‌, রোজ দু বার করিয়া দিতে পার। এ থেকেই হিসাব করিয়া, ছেলের বয়স বুঝিয়া, অসুদ দুটীর মাত্রা ঠিক্‌ করিয়া লইবে। বাজারে দু রকম কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ বিক্রি হয়। ডি জোন্স কড্‌লিবর্‌ অইল্‌, আর মুওলর্স কড্‌লিবর্‌ অইল্‌। ডি জোন্স কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ বোতলে করিয়া বিক্রি

হয়। আর মুওলর্স কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ শিশিতে করিয়া বিক্রি হয়। ডি জোন্স (বোতলের) কড্‌-লিবর্‌ অইল্‌ই ভাল।

জ্বর থেকে উঠে যে সব ছেলের কানে পূঁয হয় —কান পাকে, কুইনাইন্‌ আর কার্ব্বণেট অব্‌ আয়র্ণ তাদের কান-পাকার ভারি অসুদ। ডাক্তরেরা প্রেস্কৃপ্‌শনে কার্ব্বণেট অব্‌ আয়র্ণ লেখেন না; ফেরি কার্ব্ব লেখেন। কুইনাইন্‌ আর কার্ব্বণেট অব্‌ আয়র্ণের পুরিয়া এই রকম করিয়া তয়ের করিয়া দিবেঃ—

কুইনাইন্‌	৩ গ্রেন্‌
ফেরিকার্ব্ব (কার্ব্বণেট্‌ অব্‌ আয়র্ণ) ..	৬ গ্রেন্‌
কলম্বো পাউডর	৬ গ্রেন্‌

একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর।

রোজ ৩ বেলা ৩টে খাইতে দিবে। অসুদ ফুরাইয়া গেলে আবার তয়ের করিয়া দিবে। ছেলে বেশ সবল না হইলে, আর কান-পাকা বেশ সারিয়া না গেলে এ অসুদ বন্ধ করিবে না। এ অসুদ খাওয়া-নর সঙ্গে সঙ্গে, রোজ পিচ্‌কিরি করিয়া কান পরি-ষ্কার করিয়া দিবে, আর গ্লিসেরীন্‌ অব্‌ ট্যানিন্‌ কানের ভিতর ঐ রকম করিয়া ফোটায় ফোটায় ঢালিয়া দিবে।

এখানে যে মাত্রায় অসুদ লিখিয়া দিলাম, সে

মাত্রা এক বছরের ছেলের পক্ষে। এ থেকেই হিসাব করিয়য়া, ছেলের বয়স বুঝিয়া, অস্বুদের মাত্রা ঠিক্ করিয়া লইবে।

গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিন্ যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

দু ড্রাম্ ট্যানিক্ য়্যাসিড আর এক ঔন্স গ্লিসেরীন্ খলে একত্র ঘুঁটিয়া বেশ করিয়া মিশাও। তার পর চীনের বাসনে খলের অস্বুদ ঢালিয়া দেও। তার পর, বাসনের সস্বুদ যত ক্ষণ না বেশ গলিয়া যায়, তত ক্ষণ ওতে আগুনের অল্প অল্প তাত লাগাও।

গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিন্ ভাল ভাল ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া যায়। এর দাম বেশী নয়। এক টাকার গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিনে দশটা কান-পাকা রোগী ভাল হয়। গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিন্ বলিয়া ডিস্পেন্সরিতে লিখিয়া পাঠাইলে, কম্পাউণ্ডরেরা তখনই তা তয়ের করিয়া দেয়।

ট্যানিক্ য়্যাসিড্‌কে ট্যানিন্‌ও বলে। এই জন্যে, গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিন্‌ও বলিতে পার; গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিক্ য়্যাসিড্‌ও বলিতে পার। তবে গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিক্ য়্যাসিডের চেয়ে গ্লিসেরীন্ অব্ ট্যানিন্ বলা সোজা।

কড্‌লিবর্ অইলের সঙ্গে হাইপোফস্ফাইট অব্

লাইমের সিরপ্ খাওয়াইলেও ছেলেদের কান-পাকার খুব উপকার হয়। হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপের কথা ৩১১—৩১২র পাতে বলিছি।

কানে পূয হইবার আগে—কান পাকিবার আগে, কান কামড়ায়—কানের ভিতর ব্যথা করে। কান-কামড়ানকে—কানের ভিতর ব্যথা করাকে ডাক্তরেরা ওটাল্জিয়া বলেন; সোজা ইংরিজিতে ইয়ার্-এক্ বলে। কান-কামড়ানর যে যাতনা—যে যন্ত্রণা—যে কষ্ট, এ অস্বস্তি যিনি একবার ভোগ করিয়াছে, তিনিই তা জানেন। কান-কামড়ানর যন্ত্রণায় ছেলেরা ত একবারে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। কানে পূয হইলে—কান পাকিলে তবে কান-কামড়ান ক্ষান্ত হয়; কানের ভিতরকার যাতনা যায়। এমন যে যাতনা, এর কি কোন অসুদ নাই? আছে। ভাল অসুদই আছে। অসুদও খুব সোজা। টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্—আফিঙের আরক) আর অলিব অইল্ (সুইট্ অইল্) সমান ভাগে মিশাইয়া, কানের ভিতর তাই একটু ঢালিয়া দিয়া তুলো দিয়া কান বন্ধ করিয়া দিলে, কান-কামড়ান তখই নরম পড়ে। কান-কামড়ানর এমন অসুদ আর নাই। এই আরকে তুলো ভিজাইয়া কানের ভিতর সেই তুলো দিয়া দিলেও কান-কামড়ান সারে। কানের

ভিতর সহজেই দিতে পারা যায়, তুলোটা এমন জুত বরাত করিয়া লইয়া তবে আরকে ভিজাইবে। আরকে ভিজনো তুলোর খানিক্‌টে কানের ভিতরে যাওয়া চাই—আর কানের ভিতরে সেটা থাকাও চাই। তুলোর আগাটা সরু আর গোড়াটা মোটা হওয়া চাই। টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) আর অলিব্ অইল্ (স্যুইট্ অইল্) বেশ মেশে না; এই জন্যে, সে আরকে তুলো ভিজাইবার আগে; কি সে আরক কানের ভিতর দিবার আগে, আরকের শিশিটে বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। কান-কামড়ানর জন্যে যখন বেশী যাতনা হবে, তখনই এ আরক ঐ রকম করিয়া ব্যবহার কবিবে। অনেক জায়গায় এ আরক একবারের বেশী ব্যবহার করিতে হয় না। কোন কোন জাযগায় ২।৩।৪ বারও ব্যবহার করিতে হয়।

পেটের অসুখ হইলেও ছেলেদের কান-কামড়ায়—কান-কামড়ানর চিকিৎসার বেলায় এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়। কেন না, পেটের অসুখ ভাল করিতে না পারিলে, কানে শুদু অসুদ দিয়া তাদের কান-কামড়ান ভাল করিতে পারা যায় না।

১৭। কানে কম শুনা——বল ত. কানে কম শুনা স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গের মধ্যে ধর্ত্তব্যই না। কেন না, জ্বরে ভুগিয়া বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই, রোগী কানে কম শুনে। আবার আহার অসুদ পাইয়া রোগী সবল হইলে, কানে কম শুনা আপনিই সারিয়া যায়। ২৬৮র পাতের শেষ ছত্রে আর ২৬৯র পাতের প্রথম তিন ছত্রে লিখিছি, "মেয়েটী জ্বরে ভুগে এত কাহিল হই-ছিল যে, প্রায় এক রকম কালা হইয়া গিইছিল; খুব বড় করিয়া না বলিলে শুনিতে পাইত না"। আবার ২৭৫র পাতে ছোট অক্ষরের শেষ ছত্র থেকে সেই মেয়েটীর কথা লিখিছি—"১৯শে তারিখে ভোর পাঁচটায় গায়ের তাত ১০০.৪ আর নাড়ী ফি মিনিটে ১০৬। জিব ভিজে আর পরিষ্কার। আগের চেয়ে কানে বেশী শুনিতে লাগিল"। ২৬৮—২৭৫র পাত আর একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে জানিতে পারিবে, সে মেয়েটীর কানে কম শুনার জন্যে আলাদা করিয়া কোনও অসুদ বিসুদ দিতে হয় নাই। আসল রোগের যে অসুদ আর পথ্য, তাতেই রোগও সারিয়া গেল; সেই সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনাও ভাল হইয়া গেল। তবে কোন কোন জায়-গায় রোগী সত্য সত্যই কালা হইয়া যায়। ব্যামো

সারিয়া গেলেও কানে আর তেমন শুনিতে পায় না। এ রকম দুর্ঘটনা কুচিকিৎসার ফল বৈ আর কিছুই নয়। ব্যামো সারিয়া গেলেও রোগী যদি কানে কম শুনিতে থাকে, তবে ৮০র পাতের বল-কারক অসুদ (টনিক্) তাকে নিয়ম করিয়া খাইতে বলিবে। আর তার কানে রোজ এক ফোটা করিয়া গ্লিসেরীন্ দিবে। এ ছাড়া, সে কড্লিবর অইল নিয়ম করিয়া খাইলে, তার কানে কম শুনা আরও শীঘ্র ভাল হইয়া যায়।

১৮। **কর্ণমূল-ফোলা**——কর্ণমূল-ফোলা আদত রোগটা কি? কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহকে আমরা সোজাসুজি কর্ণমূল ফোলা বলিয়া থাকি। লালের গুল্লি যত আছে, কানের গোড়ার লালের গুল্লি সব চেয়ে বড়। কানের গোড়ার লালের গুল্লিকে ডাক্তরেরা প্যারটিড্ গ্ল্যাণ্ড্ বলেন। কর্ণমূল-ফোলাকে—কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহকে—ডাক্তরেরা প্যারটাইটিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে মম্প্স্ বলে। এ রোগ যখন হয়, তখন একবারে অনেক লোকের হয়। এ রকম যে সর্ব্বদাই ঘটে, তা নয়; তবে অনেক সময় এ রকম দেখা যায়। গাল, গলা, কর্ণমূল ফোলার যেন এক একটা সময় ধরা আছে,

এমনি বোধ হয়। কেন না, যখন গাল, গলা, কর্ণমূল ফুলিতে আরম্ভ হয়, তখন ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গাঁয়ে ও অস্বস্তি দেখা যায়। এ রোগ হঠাৎই হয়; এ রোগটী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটু শীত শীত বোধ হয়; স্পষ্ট কম্প কখনও হয় না; তার পরই গা গরম হয়; জ্বরের যে সব লক্ষণ, তা দেখা দেয়। জ্বর বেশী হয় না; জ্বর সামান্য রকমই হয়। অনেক জায়গায় ব্যথার তাড়শে—যাতনায় কেবল একটু জ্বর-ভাব হয় মাত্র। খানিক পরেই, এক দিকেরই হোক্, আর দু দিকেরই হোক্, কর্ণমূল ফোলে; তার পর সেই ফুলো চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কখন কখন কেবল এক দিকেরই কর্ণমূল ফোলে; কখন কখন দু দিকেরই কর্ণমূল একবারে ফোলে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, প্রথমে কেবল এক দিকেরই কর্ণমূল ফোলে; তার পর, সে দিকের ফুলো যেমন কমে, আর এক দিকের কর্ণমূল তেমনি ফুলিতে আরম্ভ হয়। ৮৯৯—৯০০র পাতে বলিছি, "কখন কখন (আণ্টাক্রার) দুটী গুল্লিরই প্রদাহ একবারে হয়। কিন্তু সচরাচর তা হয় না। প্রথমে কেবল একটী গুল্লিরই প্রদাহ হয়; তার পর সেটীর ফুলো যেমন কমে, আর একটীর ফুলো তেমনি আরম্ভ হয়"। কর্ণমূল ফোলা রোগেও

অনেক জায়গায় ঠিক্ এই রকম ঘটে। এক দিকের কর্ণমূল-ফোলা যে একটু কমে, সেই অমনি আর এক দিকের কর্ণমূল ফুলিতে আরম্ভ হয়। ফুলোটা প্রথমে একটু চেপ্টা ভাবের থাকে; তার পর বেশ উচু হইয়া উঠে। কানের ঠিক্ সুমুখেই ফুলোটা খুব বেশী মালুম হয়। ফুলোর উপর আঙুল দিয়া টিপিলে টোপ খায় না। বাদামের (ফলের) গা টিপিলে যেমন শক্ত মালুম হয়, এ ফুলোর উপর আঙুল দিয়া টিপিলেও প্রায় তেমনি শক্ত মালুম হয়। ফুলোর উপরকার গায়ের রং সহজও থাকিতে পারে; আবার রাঙাও হইতে পারে। আঙুল দিয়া চাপিলে ফুলোর উপরকার রাঙাটা চলিয়া যায়; আবার আঙুল তুলিয়া লইলে যে রাঙা, সেই রাঙাই হয়। ফুলোটা দু তিন দিনও থাকিতে পারে; পাঁচ ছ দিনও থাকিতে পারে। ফল কথা, কর্ণমূল-ফোলা গড়ে আট দশ দিনের বেশী থাকে না। ফুলো যখন কমিতে আরম্ভ হয়, তখন ক্রমে কমে না। ফুলোটা সম ভাবেই থাকিয়া, তার পর অমনি দেখিতে দেখিতে একবারেই কমিয়া যায়। কর্ণ-মূল ফোলার সঙ্গে গাল গলাও ফুলিতে পারে—ফুলিয়াও থাকে। কর্ণমূল ফোলার ব্যথার কথা আর কি বলিব? যিনি এ রোগ একবার ভোগ

করিয়াছেন, কেবল তিনিই সে ব্যথা জানেন। ব্যথা ত যেমন তেমন নয়;—ফুলোর ভিতর, গুল্লির ভিতর যেন নিয়ত করাত করিতে থাকে। হা করিবার চেষ্টা করিলে আর রক্ষা নাই; প্রাণ একবারে বেরিয়ে যায়। এ রোগে হা করিবারও জো নাই, চিবাই-বারও জো নাই। হা করিবার চেষ্টা করিলে যে কষ্ট হয়; চিবাইবার চেষ্টা করিলে তার হাজার গুণ কষ্ট হয়। কাজেই, এ রোগে কথা কহিবারও জো নাই; কিছু থাইবারও জো নাই। না থাইলে নয়; তাই চুমুক দিয়া থাইবার জিনিষ রোগী কোন গতিকে অনেক কষ্ট করিয়া থায়। এ রোগে চোয়া-য়াল নাড়িবার জো কি? কর্ণমূল প্রায়ই পাকে না। কর্ণমূল-ফোলার ব্যথা শূলো গেলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত গুল্লিডাগর আর শক্ত হইয়া থাকিতে পারে। কর্ণমূল ফোলার যাতনা আগে যায়; তার পর ব্যথা যায়। এ রোগটী ছোঁয়াচে। ধরিতে গেলে, কর্ণমূল ফোলা কম বয়সেরই রোগ। পাঁচ সাত বছর বয়সে আর পোনর ষোল বছর বয়সে এ রোগ বেশী হয়। তবে এ রোগ বেশী বয়সে না হয়, এমন নয়। স্ত্রী-লোকদের চেয়ে পুরুষদেরই এ রোগ বেশী হয়। ফাল্গুন, চৈত্র, ভাদ্র, আর আশ্বিন, এই চারিটে মাসই কর্ণমূল-ফোলার সময়। আর কোনও সময়

এ রোগ হয় না, তা নয়। তবে অন্য সময় এ রোগটা খুবই কম হয়। অনেকে বলেন, এ রোগ একবার হইলে আর হয় না। আমি তা বলি না। আমি নিজের শরীরে তার পরিচয় বেশই পাইয়াছি। দেড় বছরের মধ্যে কিছু না হবে ত, দশবার আমি এ অস্বস্তি ভোগ করিয়াছি।

জায়গা বদলান এ রোগের একটী স্বভাব। স্বভাবকে আমরা প্রকৃতিও বলি। এ রোগের এ প্রকৃতিটী অতি আশ্চর্য্য। এ রোগের এ প্রকৃতির কথাটা মনে করিয়া রাখা ভাল। জায়গা বদলান আরও কোন কোন রোগের স্বভাব আছে। জায়গা বদলান স্বভাব বাত রোগের আছে। বাত রোগের কথা বলিবার সময় সে কথা বিশেষ করিয়া বলিব। কোন রোগ শরীরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গেলে—রোগের সে রকম করিয়া জায়গা বদলানকে ডাক্তরেরা মেটাস্‌টেসিস্‌ বলেন। জোওয়ান রোগিদেরই কর্ণমূল-ফোলা রোগের এ প্রকৃতি (জায়গা বদলান প্রকৃতি) বেশী দেখা যায়। কর্ণমূলের ফুলো যেখানে খুব শীঘ্র কমিয়া যায়, সেই খানেই এ রোগের এ প্রকৃতির পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। কর্ণমূল-ফোলা—কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহ—আপনার জায়গা বদলাইয়া

কোথায় যায় ? পুরুষদের অণ্ডে যায়। অণ্ড কথাটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি না। সচরাচর আমরা বিচিই বলি। পুরুষদের এ রোগ আপনার জায়গা বদলাইয়া যেমন তাদের বিচিতে যায়; স্ত্রীলোকদের এ রোগ আপনার জায়গা বদলাইয়া তেমনি তাদের মাইতে কি তাদের ডিম্বকোষে যায়। ডিম্বকোষের কথা ৭০৭—৭০৮-র পাতে বলিছি। পুরুষদের কর্ণমূলের ব্যথা ফুলো যে কমিয়া যায়, সেই অমনি তাদের বিচি ফোলে, আর তাতে ব্যথা হয়, অর্থাৎ বিচির প্রদাহ হয়। প্রদাহ কি প্রদাহ কাকে বলে, এর আগে অনেক বার ত বলিছি। বিচির প্রদাহকে ভাল কথায় অণ্ড প্রদাহ বলে। অণ্ড প্রদাহকে ডাক্তরেরা অর্কাইটিস্ বলেন। বিচির ব্যথা ফুলোর সঙ্গে অণ্ডকোষও ফোলে—বিচির থলিতে জলও জমে। বিচির থলিতে জল-জমাকে কোষ-বৃদ্ধিও বলে—এক শিরেও বলে। এক-শিরেকে ডাক্তরেরা হাইড্রোসীল্ বলেন। কখন কখন কর্ণমূল-ফোলার সঙ্গে সঙ্গেই বিচিও ফোলে আর তাতে ব্যথা হয়। আবার কখন কখন একবার বা বিচি ফোলে—একবার বা কর্ণমূল ফোলে; পাল্টে পাল্টে বারে বারে এই রকম ঘটে। সচরাচর বিচির প্রদাহ আপনিই ভাল হইয়া যায়। কোন কোন জায়গায়

বিচির সেই প্রদাহ থেকে বিচি একবারে যেন শুকাইয়া যায়—ক্ষয় পাইয়া যায়। স্ত্রীলোকদের কর্ণমূল-ফোলা এই রকম করিয়া জায়গা বদলাইলে তাদের মাইয়ের কি ডিম্বকোষের বথা ফুলো হয়।

কর্ণমূলের প্রদাহ কখন কখন মাথার মগজেও যায়; কিন্তু এ ঘট না এত কম যে, এ ধর্ত্তব্যই না।

চিকিৎসা——কর্ণমূল-ফোলার দুটী অস্থদ আমি জানি। সে দুটী অস্থদ আমি কেবল জানি, তা নয়। সে দুটী অস্থদের প্রসাদে আমি বারে বারে বিষম যন্ত্রণার—বিষম যন্ত্রণা কেন, অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাইয়াছি। সে দুটী অস্থদ আর কি? হাইড্রার্জ্জ কম্ ক্রীটা আর বেলডনা। হাইড্রার্জ্জ কম্ ক্রীটাকে সোজা ইংরিজি গ্রে পাউডর বলে। গ্রে পাউডর খাইতে হয়; আর এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলাডনার প্রলেপ লাগাইতে হয়। এক গ্রেণের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রে পাউডর ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইলে, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে তেমন যে যাতনা, তাও যেন এক বারে আগুণে জল পড়ার মত কমিয়া যায়। অস্থদ একবার খাইলেই, যাতনার খুব বাড়াবাড়িটে যেন একটু কমে, এমনি বোধ হয়। দু বার খাওয়ার পর রোগীকে যাতনায় তেমন আর ছট্‌-ফট্‌ করিতে হয় না। তিনবার খাওয়ার পর, যাতনা নরম পড়া ক্লেশ

বুঝিতে পারা যায়। তার পর, যাতনাটা যত ক্ষণ একবারে না বেশ যায়, ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়ম করিয়া ১/২ গ্রেন্ করিয়া গ্রে পাউডর খাবে। তার পর, যাতনা গেলে ব্যথা যে ক দিন থাকিবে, রোজ চারি পাঁচ বার করিয়া গ্রে পাউডর খাবে। গ্রে পাউডরের একটী ব্যবস্থা (প্রেস্কৃপ্শন্) নীচে লিখিয়া দিলাম।

হাইড্রার্জ্জ কম্ ক্রীটা (গ্রে পাউর) ... ৪ গ্রেন্

এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর।

এক একটা পুরিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবে। গালে জল লইয়া পুরিয়া ঢালিয়া খাবে। এ রোগে হা করিবার জো নাই—এ কথা এর আগেই বলিছি! এই জন্যে, খুব জুত বরাত করিয়া গালে জল লইবে—আর তেমনি জুত বরাত করিয়া গালের ভিতর পুরিয়া ঢালিয়া দিবে। পুরিয়ার কাগজের মুখ্‌টো একটু ছুঁচ্‌লো মত করিয়া সুমুখের দাঁতের ভিতর চালাইয়া দিয়া অসুদ ঢালিয়া দিবে।

তার পর, খানিকটে একষ্ট্রাক্ট বেলাডনা পিতলের একটা বাটিতে করিয়া লও। তার পর, তাতে একটু জল দিয়া আঙুল দিয়া নাড়িয়া প্রলেপের মত কর। তার পর, সেই বেলাডনা আগুনে ফুটাইয়া লও। শেষে, ফুলোর জায়গায় খুব গরম গরম

সেই বেলাডনার প্রলেপ দেও। প্রলেপ শুকাইয়া গেলে নূতন করিয়া আবার গরম প্রলেপ দিবে। কর্ণমুল ফোলা একবারে নির্দ্দোষ হইয়া সারিয়া না গেলে বেলাডনার প্রলেপ বন্ধ করিবে না। বেলা-ডনার প্রলেপের আশ্চর্য্য গুণ—আশ্চর্য্য শক্তি। ব্যথা কমাইয়া দিতে এমন অসুদ আর নাই। বেলাডনার এ গুণটী ছেলেরা পর্য্যন্ত ভুলিতে চায় না। আমার ছোট ছেলের বয়স চারি বছরের বেশী নয়। কানের গোড়ায় ব্যথা হইলেই বলে "বাবা আমার কানের গোড়ায় ব্যথা হইয়াছে; আমি বেলাডনা পরিব"। বেলাডনার প্রলেপ দেওয়াকে সে "বেলা-ডনা পরা" বলে। তার একবার কর্ণমূল ফুলিয়া-ছিল; শুদু বেলাডনার গরম গরম প্রলেপেই বেশ সারিয়া গিইছিল। তাতেই সে বেলাডনা নামটাও শিখিয়া রাখিয়াছে; বেলাডনা লাগাইলে ব্যথা যায়, তাও জানিয়া রাখিয়াছে। বেলাডনার প্রলেপ শুকাইয়া গেলে, তার উপর নুনের পুঁটলির সেক করিলে কর্ণমুলের ব্যথা ফুলো আরও শীঘ্র কমিয়া যায়। নুনের পুঁটলির সেকে ভারি আরাম বোধ হয়। কর্ণমূল-ফোলার চিকিৎসা করিবার সময় এ রোগের জায়গা বদলান স্বভাবের কথাটা যেন মনে থাকে। কর্ণমূলের ব্যথা ফুলো শীঘ্র শীঘ্র কমাইয়া

দিবার জন্যে, তাতে জল-পটি কি ঠাণ্ডা কোন জিনিশ যেন লাগাইও না—যাতে বেশী বাহ্যে হয়, এমন জোলাপ টোলাপও যেন রোগীকে দিও না।

চিবাইবার কষ্ট কিছু থাকিতে, রোগী যেন চিবাইয়া খাইবার জিনিশ মোটে না খায়।

কর্ণমূল-ফোলা বেশ সারিয়া গেলেও কিছু দিন খুব সাবধানে থাকা চাই। বেশী হা করা; বেশী চিবনো; স্নান করা; আর হিম বাত ভোগ নিষেধ। যে দিকের কর্ণমূল ফোলে; কিছু দিন পর্য্যন্ত কাপড় চোপড় দিয়া ঢাকিয়া সে দিক্‌টে গরমে রাখিলে ভাল হয়।

কর্ণমূল-ফোলা ভাল হইয়া গেলে রোগীর শরীর যত দিন না বেশ সুস্থ আর সবল হয়, রোজ নিয়ম করিয়া তাকে একটু একটু কুইনাইন্ খাইতে দিবে। কুইনাইনের মাত্রা আর কি? ম্যালেরিয়ার দেশে রোগীকে কুইনাইন্ এক আধটু বেশী দিলে হানি নাই—তাতে উপকার বৈ অপকার হয় না।

বিচির, মাইয়ের কি ডিম্বকোষের ব্যথা ফুলো হইলে, বিচিতে, মাইতে কি ডিম্বকোষের জায়গায় বেলাডনার গরম গরম প্রলেপ দিবে।

তৃতীয় ভাগ সাঙ্গ।